প্রথম অধ্যায়।

প্রভুর লীলা বিচার।

আশীর্ব্বাদ।

শুদ্ধ বেলোয়ালি—চৌতাল।

কোটী যুগ চিরজীবী রহো আমার,—
প্রাণনাথ প্রাণেশ্বর,
জগন্নাথ সুত, গৌরাঙ্গ পতিতপাবন।
শচীর কুলতারণ, বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণধন,
দুঃখী জনে দয়া করহে, তারণ শরণ।
প্রেমের বন্যায় জগত ভাসালে, আপনি কান্দি কান্দাইলে,
মধুর মধুর লীলা করিলে;
বলরাম দাসের নাথ, জীবে কর আশীর্ব্বাদ,
দাও দাও দাও দীনহীন জীবে, অমূল্য চরণ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ অনেক সময় বিহ্বল অবস্থায় থাকিতেন, শেষ লীলায় তাঁহার আবেশ প্রায় ভাঙ্গিত না। হঠাৎ দেখিলে মনে হইত যেমন নদীতে কোন ভাসমান দ্রব্য জোয়ার ভাটায়, একবার এদিকে একবার অপর দিকে চালিত হয়, তিনি সেইরূপ চালিত হইতেন? তিনি কি সেইরূপ দৈবের অধীন ছিলেন? কিন্তু তাহা নয়। তাঁহার বিহ্বলতা বাহ্য। তাঁহার সমুদায় কার্য্য দেখিলে বোধ হইবে যে, তিনি কি কি করিবেন তাহা তাঁহার জগতে উদয় হইবার পূর্ব্বে নিরাকৃত হইয়াছিল।

কাহার দ্বারা? না একজন অসীম শক্তিসম্পন্ন বস্তু দ্বারা। এ খেলা তাঁহার জন্মিবার পূর্ব্বে পত্তন হয়, আর যিনি ইহা করিয়াছিলেন তাঁহার ভূত ভবিষ্যৎ সমুদায় গোচর ছিল।

আবার তাঁহার এ শক্তিও ছিল যে তিনি পূর্ব্বে আপনার মনোমত খেলা পাতাইয়া, কার্য্যে তাহা পরিণত করিতে পারিতেন। এই নিমিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ, অবতারের পদ প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার এই পদ প্রাপ্তিতে তাঁহার অমানুষিক অসীম শক্তির পরিচয় দিতেছে। এই "অবতার" তত্ত্বটী ও এই কথাটীর ইতিহাস বিচার করুন। যখন এই কথাটী সৃষ্ট হয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার কার্য্যও স্থির করা হয়। কথা হয় এই যে, শ্রীভগবান মনুষ্য সমাজে বিচরণ করিয়া থাকেন, আর তখন তাঁহাকে অবতার বলা যায়। ঐ সঙ্গে আরো কথা হয় যে, এইরূপে অমুক অমুক অবতার হইয়াছেন, আর একটী হইবেন তাঁহাকে বলে কল্কি অবতার। সুতরাং এই শব্দটী সৃষ্টির সঙ্গে উহার যে কার্য্য তাহাও স্থিরকৃত হইয়া গিয়াছিল, এই শব্দের ও তত্ত্বের সহিত মনুষ্যের আর সম্বন্ধ ছিল না।

কিন্তু নবদ্বীপে এই কথা ও তত্ত্ব আবার উত্থিত হইল। যখন নবদ্বীপের লোকেরা দেখিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ বড়টী একটী কার্য্য করিতেছেন, যে কার্য্যের ভ্রমশূন্য মানচিত্র পূর্ব্বে অঙ্কিত হইয়াছে, তখন তাঁহারা আবার অবতার কথাটা উঠাইলেন। যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, অসীম শক্তিসম্পন্ন একটা বস্তু পূর্ব্বে একটা খেলা পাতাইয়া এবং পরে তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া, তাঁহার সেই শক্তির পরিচয় দিতেছেন, তখন তাঁহারা বলিলেন যে, এই বস্তুটী আমাদের ন্যায় মনুষ্য নহেন, তাঁহার যে শক্তি উহা ভগবান ব্যতীত আর কাহারও সম্ভবে না। তাই লোকে মৃত অবতার-তত্ত্ব কথাটী সজীব করিলেন।

মনে করুন, কোন এক অসীম শক্তিসম্পন্ন বস্তু ইহাই সাব্যস্থ করিলেন যে, জীবকে অতি নিগূঢ় প্রেমধর্ম্ম অর্পণ করিবার নিমিত্ত আয়োজন করিতে হইবে। তিনি স্থির করিলেন যে, এই নিমিত্ত প্রথমতঃ একটী অবতারের আবশ্যক, তাঁহার অমুক স্থানে অমুক সময় জন্ম-গ্রহণ করা উচিত, এবং তাহার পরে তাঁহার এই সমুদয় কার্য্য করিতে হইবে। সেই অসীম শক্তিসম্পন্ন বস্তু পূর্ব্বে এই সমুদয় সাব্যস্থ করি-লেন, পরে সেই সমুদয় প্রস্তাবিত ঘটনা কার্য্যে পরিণত হইল।

উপরে যাহা বলিলাম, প্রভুর লীলা মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে তাহাই বোধ হইবে। শ্রীনবদ্বীপ বিদ্যা ও বুদ্ধিচর্চ্চায় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান স্থান। সেই অসীম শক্তিসম্পন্ন বস্তু স্থির করিলেন যে, এই নবদ্বীপেই এই অবতারের উদয়ের উপযুক্ত স্থান। শ্রীগৌরাঙ্গ অকুতোভয়ে সেখানে জন্মগ্রহণ করিলেন। শুনিতে পাই যীশুর সঙ্গীগণ ছিলেন জালিয়া প্রভৃতি নীচ লোক। সামান্য যে যে অবতার সকলেরি সঙ্গী ঐরূপ মূর্খ অজ্ঞ লোক ছিলেন। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ উদয় হইলেন কোথা, না পণ্ডিত সমাজে, যেখানে সে সময় অতিসূক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন লক্ষ লক্ষ পণ্ডিত বিরাজ করিতেছেন। তিনি জন্মিলেন কিরূপ সময়, না যখন সেই নবদ্বীপ উন্নতির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে, অর্থাৎ যখন মিথিলার ন্যায়শাস্ত্র নিজ জন্ম স্থানে দুঃখ পাইয়া এই নবদ্বীপ নগরে আশ্রয় লইয়াছেন; যখন বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও রঘুনাথ শিরোমণি ঐ নগর অলঙ্কৃত করিতেছেন; যখন স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন তাঁহার স্মৃতি, ও আগমবাগীস তাঁহার তন্ত্রসার লিখিতেছেন; এবং যখন কমলাক্ষ ভক্তিশাস্ত্র শিক্ষা দিতেছেন। সেই অসীম শক্তিসম্পন্ন বস্তু ভাবিলেন যে, সেই ভাবি অবতার জগতের প্রধান স্থানে প্রধান লোক সমাজে জন্মিলে কার্য্যের সুবিধা হইবে, আর প্রকৃত তাহাই হইল। যেহেতু সেই বস্তু বুঝিয়াছিলেন যে এই ভাবি

অবতার নবদ্বীপ জয় করিতে পারিলে ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান আপনা আপনি বশীভূত হইবে।

আমাদের দেশে বৎসরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর সময় ফাল্গুন মাস, অবতার সেই মাসে জন্মগ্রহণ করিলেন। আর ফাল্গুন মাসের সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর সময় পূর্ণিমা সন্ধ্যা; কাজেই যেমন পূর্ণিমার চন্দ্র উঠিলেন অমনি গৌরচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হইলেন। এই স্থান ও সময় অবতারের জন্মগ্রহণের উপযুক্ত।

প্রভুর লীলায় দেখিবেন যে তিনি বরাবর হরিনাম বড় ভাল বাসিতেন। এমন কি, তিনি যখন যেখানে উদয় হইতেন তখন তাহার চতুর্দ্দিকে হরিধ্বনি হইত, ইহার অনেক উদাহরণ পরে দেখাইব। বলিতে কি, বহিরঙ্গগণের নিমিত্ত হরিনামই তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল। প্রভু এরূপ সময় জন্মগ্রহণ করিলেন যখন চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রভুর মনের অভিপ্রায় যে তিনি হরিনামের সহিত জগতে উদয় হইবেন, তাই গ্রহণের সময় জন্মগ্রহণ করিয়া সেই ইচ্ছা পূরাইলেন। তিনি ইচ্ছা করিলেন যে গ্রহণের সময় জন্মিবেন, ও তাহাই করিলেন।

পরে দেখাইব যে, এই যে শ্রীগৌরাঙ্গ দেহ, ইহা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিবার প্রয়োজন ছিল। তাই প্রভু বার মাস উদরে রহিলেন, কেন বলিতেছি। সাধারণতঃ সন্তান দশ মাস গর্ভে থাকে, প্রভু আরও পূর্ণ দুই মাস থাকিলেন। যদি তিনি দশ মাসে জন্মগ্রহণ করিতেন, তবে এই দুই মাস শচীর দ্বারা প্রতিপালিত হইতেন। কিন্তু তিনি গর্ভের বাহিরে আসিয়া দেহটী শচীর হস্তে ন্যস্ত না করিয়া, গর্ভের অভ্যন্তরে থাকিলেন, সুতরাং স্বভাব কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। শচীর সেই দেহ পালন করিতে অনেক ভুল হইবার সম্ভাবনা ছিল, ও তাহাতে দেহটী আঘাত পাইতে পারিত, কিন্তু স্বভাবের ভুল হয় না। কাজেই

পূর্ণ দ্বাদশ মাস গর্ভে থাকিয়া প্রভু ভূমিষ্ঠ হইলেন। তখন সে দেহ দেখিয়া লোকে চমকিত হইল। ভূমিষ্ঠ শিশুকে যেন এক বৎসরের শিশু বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আবার ভূমিষ্ঠ হইলেন অতি অপূর্ব্ব লগ্নে। এরূপ শুভ লগ্নে কেবল শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন, আর কাহাকেও এরূপ সুসময়ে জন্মিতে দেখা যায় নাই। ইহাও যে দৈব হইয়াছে, তাহা উপরের ঘটনা দেখিলে বোধ হয় না, অর্থাৎ বোধ হয় যে তিনি ইচ্ছা করিয়াই সেই সময় জন্মগ্রহণ করেন।

শিশুবেলা নিমাইর চাঞ্চল্যের অবধি ছিল না। তাহা অপেক্ষা অনেক বড় মুরারী বড় জ্ঞানী ছিলেন, অর্থাৎ তিনি যোগবাশিষ্ট পড়িতেন, বড় একটা ভগবান মানিতেন না। এক দিবস তিনি বয়স্যের সহিত যোগবাশিষ্ট বিষয়ক কথা কহিতে কহিতে চলিয়াছেন; মনের ভাব বুঝাইবার নিমিত্ত হাত চালাইতেছেন, মাথা নাড়িতেছেন, অঙ্গভঙ্গী করিতেছেন। পঞ্চম বর্ষীয় নিমাই বয়স্যের সঙ্গে তাঁহারি পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহাকে ভেংচাইতে ভেংচাইতে চলিয়াছেন। মুরারি দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন, জগন্নাথের বেটাকে নিন্দা করিলেন। পরে যখন আহারে বসিয়াছেন, তখন নিমাই তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার থালে মুত্র ত্যাগ করিলেন, আর বলিলেন, "মুরারি, হাত নাড়া মুখ নাড়া ছাড়, জ্ঞান ছাড়, বক্তৃতা ছাড়, ছাড়িয়া ভগবানকে ভজনা কর। যে ব্যক্তি বলে যে সে নিজে ভগবান, তাহার থালে আমি প্রস্রাব করি।" অবশ্য কাহারো থালে প্রস্রাব করা অন্যায়, কিন্তু ভাবুন নিমাই কি বলিয়া উহা করিয়াছিলেন। যোগবাশিষ্ট নাস্তিকতা শিক্ষা দেয়। সে পুস্তকের মর্ম্ম এই যে, ভগবান বলিয়া আর কোন পৃথক্ বস্তু নাই, মানুষই ভগবান। মুরারী তাহারই চর্চ্চা করিতেছিলেন।

প্রেমভক্তি শিক্ষা দিবার নিমিত্ত গৌরাঙ্গ অবতার। সুতরাং

যোগবাশিষ্টের শিক্ষা আর তাঁহার শিক্ষা একেবারে বিপরীত। ভক্তি-ধর্ম্মে বলে ভগবান মনুষ্যের কর্ত্তা, আর মনুষ্য তাহার দাসানুদাস। তাই বালক নিমাই মুরারীকে ভাল করিয়া শিক্ষা দিলেন, এমন করিয়া যে তিনি তাহা চিরকাল মনে রাখিয়াছিলেন, আর আমরাও সে শিক্ষার ফল ভোগ করিতেছি।

আপনারা নিমাইর এই কাণ্ডকে অবশ্য কৃপা করিয়া পাগলামী বলিবেন না। ইহা একটী উদ্দেশ্যপূর্ণ লীলা। আবার আর এক লীলা শ্রবণ করুন। নিমাই গয়া হইতে আসিয়া যে সংকীর্ত্তন রচনা করেন, ঠিক সেইরূপ সংকীর্ত্তন পূর্ব্বে এক দিবস করিতেছিলেন, তখন তাঁহার বয়স মোটে পাঁচ ছয় বৎসর। বয়স্য বালকগণকে নিমাই বনমালা পরাইয়াছেন, মধ্য স্থানে আপনি নৃত্য করিতেছেন, আর বয়স্য বালকগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া ঐরূপ নৃত্য করিতেছে। যে বালক নাচিতেছে না তাহাকে নিমাই আলিঙ্গন করিতেছেন, আর সেই স্পর্শে শক্তি পাইয়া সে তখন নৃত্য করিতেছে। পথে কয়েকটী পণ্ডিত যাইতেছিলেন তাঁহারা কৌতুক দেখিতে দাঁড়াইলেন। একটু পরে আবেশিত হইয়া তাঁহারা চৈতন্য হারাইলেন, হারাইয়া বালকগণের সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন। চৈতন্যমঙ্গল বলেন—

চৌদিকে বালক বেড়ি হরি হরি বলে।
আনন্দে বিভোর প্রভু ভূমে পড়ি বুলে॥
বোল বোল বলি ডাকে মেঘ গম্ভীর স্বরে।
আইস আইস বলিয়া বালক করে কোলে॥
শ্রীঅঙ্গ পরশে বালক পাশরে আপনা।
আশ্চর্য্য ঘটনা এই বালক কান্দে না॥

হেনকালে সেই পথে চলিছে পণ্ডিত।
বিশ্বম্ভর খেলনা দেখিল আচম্বিত॥
আপনা পাসরি পণ্ডিত সাস্তাইল মেলে।
করতালি দিয়া নাচে হরি হরি ব'লে॥
এ বোল শুনিয়া শচী আইল ত্বরিত।
দেখে পুত্র নাচে যত পণ্ডিত সহিত॥
পুত্র পুত্র বলি শচী নিমাই কৈল কোলে।
সভারে দেখিয়া সে নিঠুর বাণী বলে॥
এমত ব্যাভার সব পণ্ডিত সভার।
পর পুত্র পাগল করি উন্মত্তে নাচায়॥

অর্থাৎ শচী গোল শুনিয়া ধাইয়া আইলেন, পুত্রকে কোলে করিলেন। তথন পণ্ডিতগণের আবেশ ভাঙ্গিল, ভাঙ্গিয়া তাঁহারা লজ্জায় মরিয়া গেলেন। তাঁহারা না রাজপথের সর্ব্বলোক সম্মুখে নৃত্য করিয়াছিলেন? মনে রাখুন নিমাই যখন এই লীলা করেন তখন তিনি মায়ের কোলের ছেলে। এটী নিমাইয়ের বাল্য-চপলতা, না লীলাখেলা? কি বলেন?

নিমাই পাঠারম্ভ করিলেই দেখা গেল যে, বিদ্যাবুদ্ধির আকর স্থান যে নবদ্বীপে, সেখানেও তিনি শীর্ষস্থানের উপযুক্ত পাত্র। সেখানে তখন সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান রঘুনাথ শিরোমণি। তাহা অপেক্ষা বুদ্ধিমান জগতে আর কেহ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। সেই রঘুনাথ নিমাইর বুদ্ধিতে প্রতিভাশূন্য। নিমাই ও রঘুনাথে অনেক দ্বন্দ্বের কথা জনশ্রুতিতে জানা যায়। আর সকল দ্বন্দ্বেই নিমাই জয়লাভ করিতেন। রঘুনাথের দীধিতির ন্যায় অমূল্য গ্রন্থ লিখিত হইত না, যদি নিমাই আপনার ন্যায়গ্রন্থ রঘুনাথের সান্ত্বনার নিমিত্ত ছিড়িয়া না

ফেলিতেন। তখন দেখা গিয়াছিল যে তিনি নিতান্ত উদ্দেশ্যশূন্য ছিলেন না। তিনি যে একটী দৈবের দাস ছিলেন না, তাহা দিগ্বিজয়ীকে জয় করিয়া নবদ্বীপের ও জগতের পণ্ডিতগণকে দেখাইয়াছিলেন। নিমাই যখন বালক, তখন তিনি নবদ্বীপের ন্যায় বিদ্বজ্জন সমাজে টোল স্থাপন করেন। আর সে টোলে কত সহস্র পড়ুয়া বিদ্যা শিক্ষা করিত। কত সহস্র বলিলাম ইহা অত্যুক্তি নয়, যথা চৈতন্য ভাগবতে—

> কত বা প্রভুর শিষ্য তার অন্ত নাই।
> কত বা মণ্ডলী হয়ে পড়ে নানা ঠাই॥

আবার পদ—

> সহস্র সহস্র যত প্রভুর শিষ্যগণ।
> অবাক হইল সবে শুনিয়া বর্ণন॥

আবার ভাগবতে দেখি যে প্রভু যখন বঙ্গদেশে গমন করেন, তখন সেখানেই তাঁহার সহস্র সহস্র শিষ্য হয়, ও তাহারা তাঁহার সঙ্গে নবদ্বীপে আগমন করে। সেই বালক কালে তিনি যে ব্যাকরণের টিপ্পনী করেন, তাহা নবদ্বীপের ন্যায় সমাজে চলিত হইয়াছিল।

নিমাই পূর্ব্বাঞ্চলে কেন গমন করিলেন? তখন তিনি কেবল যৌবনে পদার্পণ করিতেছেন। তিনি জননীকে বুঝাইলেন যে অর্থ উপার্জ্জন করিতে যাইতেছেন। কিন্তু অর্থ উপার্জ্জনে যে তাঁহার কখনও বাসনা ছিল, তাহা তাঁহার লীলা পড়িলে বোধ হয় না। তিনি কেন পূর্ব্ববঙ্গে গিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কার্য্য দ্বারা কিছু কিছু জানা যায়। তিনি অবতাররূপে প্রকাশ হইয়া পূর্ব্ববঙ্গে যাইবেন না তাহা তিনি জানিতেন; অথচ পূর্ব্ববঙ্গে ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করা প্রয়োজন। তাই করিতে পদ্মাবতী তীরে গেলেন। তিনি পূর্ব্ববঙ্গে কিরূপে ধর্ম্ম প্রচার করেন তাহা আমরা জানিতে পারি নাই, কেহ তাহার সেখানকার প্রচার প্রণালীর

কথা কোন লীলা গ্রন্থে বলেন নাই। যখন নদীয়া ত্যাগ করেন, তখন তিনি কেবল একজন বিখ্যাত শিশুপণ্ডিত মাত্র, তাঁহাতে যে ধর্ম্মের কিছু ভাব আছে তাহাও লোকে জানিত না, বরং লোকে তাঁহাকে এক প্রকার নাস্তিক ভাবিত। আবার যখন নবদ্বীপে ফিরিয়া আইলেন, তখনও সেইরূপ বড় পণ্ডিত, কেবল বিদ্যাচর্চ্চা করেন, তাঁহার হৃদয়ে কোন ধর্ম্মভাবের চিহ্নও দেখা যাইত না। কিন্তু তিনি পূর্ব্ববঙ্গে একটী ভক্তির তরঙ্গ উঠাইয়া আইলেন। চৈতন্যমঙ্গল এই মাত্র বলেন—

সেই পদ্মাবতী তটবাসী যত জন।
বিশ্বম্ভর দেখি শ্লাঘ্য করিল নয়ন॥
পদ্মাবতী তীরে তীরে ভ্রমে গৌরহরি।
সে দেশ ভকত কৈল শ্রীচরণ ধরি॥
চণ্ডাল পতিত কিবা দুর্জ্জন সজ্জন।
সভারে যাচিয়া প্রভু দিল হরিনাম॥

চৈতন্যভাগবত বলেন :—

এই মতে বিদ্যারসে বৈকুণ্ঠের পতি।
বিদ্যারসে বঙ্গদেশে করিলেন স্থিতি॥
সহস্র সহস্র শিষ্য হইল তখন।
হেন নাহি জানি কে পড়ায় কোন ধন॥
সেই ভাবে অদ্যাপিও বঙ্গদেশে।
শ্রীচৈতন্য সঙ্কীর্ত্তন করে স্ত্রী পুরুষে॥

এইরূপে নবদ্বীপবাসীকে জানিতে না দিয়া প্রভু লুকাইয়া বঙ্গদেশ উদ্ধার করিলেন। বঙ্গদেশে যাইবার সময় আর একটী কারণ রঘুনাথ ভট্টকে সৃষ্টি করা। কারণ গোস্বামী রঘুনাথ তাঁহার লীলা খেলার এক অঙ্গ। সে কিরূপ বলিতেছি। একদিন প্রাতে সে দেশের অতি প্রধান

লোক তপন মিশ্র প্রভুর চরণে পড়িলেন, ইহাতে প্রভু জিব কাটিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তপন বলিলেন আমাকে বঞ্চনা করিবেন না, আমি কল্য স্বপ্নে জানিয়াছি, আপনি স্বয়ং ভগবান। এখন আমাকে উদ্ধার করুন। প্রভু বলিলেন, তুমি সস্ত্রীক বারাণসী গমন কর, সেখানে তোমার সহিত আমার দেখা হইবে। এই কথা শুনিয়া তপন মিশ্র তদ্দণ্ডে সস্ত্রীক দেশ ত্যাগ করিয়া বারানসী গেলেন, আর একাদশ বৎসর পরে সেখানে তিনি প্রভুর দর্শন পাইলেন। অতএব এই লীলাখেলা যিনি পাতাইয়াছিলেন তিনি তাঁহার খেলায় লিখিয়াছিলেন যে তপন মিশ্রের বারানসী যাইতে হইবে, সেখানে অবতারের সহিত তাঁহার দেখা হইবে। আর সেই অসীম শক্তিসম্পন্ন বস্তু তাঁহার খেলা কার্য্যে পরিণত করিতে শক্ত হইলেন। অতএব প্রয়োজনীয় ঘটনা গুলি তাহার অধীন ছিল, কি ঘটনা হইবে তাহা তিনি অগ্রে সাব্যস্থ করিতেন, পরে সে গুলি ঘটাইতেন।

সেই বারাণসীতে রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, যাহাকে প্রভুর প্রয়োজন, তপনের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। তাই প্রভু তপন মিশ্রকে আজ্ঞা করেন তুমি সস্ত্রীক বারানসী গমন কর। এইরূপে প্রভুর লীলার প্রধান প্রধান সঙ্গী গুলির মধ্যে অনেককেই তিনি নিজে সংগ্রহ করেন।

নিমাই পণ্ডিত গয়াধামে যাইবেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি নদীয়ায় কিরূপ জীবনযাপন করিয়াছেন স্মরণ করুন। তাঁহার গঙ্গায় সন্তরণে ভব্য লোক অস্থির হইতেন। ঘাটে লোকে পূজা করিতে আসিয়াছে, তিনি পুরুষের ও মেয়ের কাপড় বদলাইলেন। বালিকারা ব্রত করিতেছে তিনি নৈবিদ্য কাড়িয়া খাইলেন। একটু বড় হইলে সে সব ছাড়িলেন কিন্তু তবু তাঁহার গাম্ভীর্য্যের লেশ ছিল না। শ্রীধরের সহিত কলাপাত লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেন, মুকুন্দকে "বাঙ্গাল" "বাঙ্গাল" বলিয়া অস্থি

করিয়া তুলিতেন। বঙ্গদেশে বাঙ্গালিয়া কথা শিখিয়া আসিয়া তাহার দিব্য অনুকরণ করিয়া বয়স্যগণকে হাসাইতেন। পড়ুয়া দেখিলেই ফাকি জিজ্ঞাসা করিতেন। তাঁহার ফাকির ভয়ে অধ্যাপক পর্য্যন্ত অস্থির হইতেন। তাঁহার পিতৃবন্ধু শ্রীবাস পণ্ডিত তাঁহাকে কৃষ্ণ ভজন করিতে উপদেশ দিলে, তিনি সেই গর্ব্বিত গুরুজনকে ঠাট্টা করিলেন। তবে যখন টোলে বসিতেন, তখন কাহার সাধ্য যে চপলতা করে। যখন পূর্ব্ববঙ্গে গমন করেন, তখনও কয়েক মাস একটু স্থির ছিলেন। কিন্তু নবদ্বীপে জন্মাবধি এই চতুর্ব্বিংশতি বয়স পর্য্যন্ত কেবল চাপল্য, কেবল উদ্ধতপনা, কেবল পড়ুয়ার দাম্ভিকতা করিয়াছেন। সেই পাত্র, চঞ্চল শিরোমণি, সেই উদ্ধত নবীন অধ্যাপক, এখন গয়ায় চলিলেন—

গয়াতীর্থ বাসে প্রভু প্রবিষ্ট হইয়া।
নমস্কারীলেন প্রভু শ্রীকর জুড়িয়া॥ (ভাগবত)

এই দুই কর জুড়িলেন আর এই কর চিরজীবন জোড়াই থাকিল; পরে চক্রবেড়ে গদাধরের পাদপদ্ম দর্শন করিলেন, ইহাতে হইল কি, না—

অশ্রুধারা বহে দুই শ্রীপদ্ম নয়নে।
রোমহর্ষ কম্প হইল চরণ দর্শনে॥
অবিচ্ছিন্ন গঙ্গা বহে প্রভুর নয়নে। (ভাগবত)

পারে ঃ— আত্ম প্রকাশের আসি হইল সময়।
দিনে দিনে বাড়ে প্রেমভক্তির বিজয়॥

পরে রোদন করিতে লাগিলেন ঃ—

কৃষ্ণরে বাপরে মোর জীবন শ্রীহরি।
কোন্ দিগে গেলে মোর প্রাণ করি চুরি॥
আর্ত্তনাদ করি প্রভু ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
কোথা গেলে কৃষ্ণনিধি ছাড়িয়া আমারে॥

গড়াগড়ি যায়েন কান্দেন উচ্চৈঃস্বরে।
ভাসিলেন নিজ ভক্তি বিরহ সাগরে॥ (ভাগবতে)

যে নিমাই নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া গয়ায় গমন করিলেন তিনি আর ফিরিলেন না, যিনি আইলেন তিনি আর এক বস্তু।

তিলার্দ্ধেক ঔদ্ধত্যের নাহিক প্রকাশ।
পরম বিরক্ত রূপ সকল সম্ভাষ॥
শেষে প্রভু হইলেন বড় অসম্বর।
কৃষ্ণ বলি কান্দিতে লাগিলা বহুতর॥
ভরিল পুষ্পের বন মহা প্রেমজলে।
মহাশ্বাস ছাড়ি প্রভু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে॥
পুলকে পূর্ণিত হইল সর্ব্ব কলেবর॥

(ভাগবত)

এইরূপে দিবানিশি ক্রন্দন চলিল, নয়ন জলে স্থান কর্দ্দমময় হইতে লাগিল, আবার ইহার সঙ্গে ঘন ঘন মূর্চ্ছা। প্রাতে স্নানে চলিলেন, অনেক কষ্টে ধৈর্য্য ধরিয়া চলিয়াছেন, ক্রন্দন আসিতেছে বহিরঙ্গ লোক দেখিয়া সম্বরণ করিতেছেন; যথা—

প্রাতঃকালে যবে প্রভু চলে গঙ্গাস্নানে।
বৈষ্ণব সবার সঙ্গে হয় দরশনে
শ্রীবাসাদি দেখিলে ঠাকুর নমস্কারে।
প্রীতি হয়ে ভক্তগণ আশীর্ব্বাদ করে॥

গয়া হইতে প্রত্যাগত নিমাই বৈষ্ণবগণকে বলিতেছেন :—

তোমা সবা সেবিলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই।
এত বলি কারু পায় ধরে সেই ঠাই॥

সেই সঙ্গে ভক্তের সেবা আরম্ভ করিলেন :—

নিঙ্গড়ায়েন বস্ত্র কারু করিয়া যতনে।
ধুতি বস্ত্র তুলি কারু দেন সে আপনে॥
কুশ গঙ্গা মৃত্তিকা কাহার দেন করে।
সাজি বহি কোন দিন চলে কারু ঘরে॥

পরে অধ্যাপক শিরোমণি পড়াইতে গেলেন, পারিলেন না। পড়ুয়ারা প্রশ্ন করে, ধাতুতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করে, তিনি বলেন "কৃষ্ণ বল," এইরূপে সাত দিন গেল, কাজেই পড়ান বন্ধ হইল।

যাঁহার মুখে দিবানিশি হাসি ছিল, এখন তাঁহার দিবানিশি ক্রন্দন। যিনি এত দাম্ভিক ছিলেন, তিনি এখন যাহার তাহার চরণ ধরিয়া, যাহাকে তাহাকে প্রণাম করিয়া, দাস্য ভক্তি ভিক্ষা করেন। যিনি দিবানিশি বিদ্যা চর্চ্চা করিতেন, এখন তিনি কেবল চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণময় দেখিতে লাগিলেন, যথা—

যে যে জন আইসেন প্রভু সম্ভাষিতে।
প্রভুর চরিত্র কেহ না পারে বুঝিতে॥
পূর্ব্ব বিদ্যা ঔদ্ধত্য না দেখে কোন জন।
পরম বিরক্ত প্রায় থাকে সর্ব্বক্ষণ॥

শচী পুত্রকে সুস্থ করিবার নিমিত্ত বধূকে পুত্রের সমীপে আনিয়ন করেন, যথা :—

লক্ষ্মীরে আনিয়া পুত্র সমীপে বসায়।
দৃষ্টিপাত করিবারে প্রভু নাহি চায়॥

পরে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। এই নিমাইর কীর্ত্তনে উত্তম ভাবঘটিত কি রাগরাগিণী যুক্ত পদ ছিল না, তবে কি ছিল, না মুখে কেবল হরি বলা আর মৃদঙ্গের সহিত নৃত্য। ইহাতে সকলে আনন্দে মাতোয়াল

হইতেন ও আনন্দে মূর্চ্ছা যাইতেন। ক্রমে কীর্ত্তনের তেজ বাড়ি চলিল, ক্রমে নূতন নূতন লোকে এই কীর্ত্তনে যোগ দিতে লাগিলেন। অগ্রে রজনীতে সামান্য কীর্ত্তন হইত, পরে দিবানিশি হইতে লাগিল। ইহাতে নদে টলমল করিতে লাগিল। বাসুঘোষের পদ যথা :—

চাঁদ নাচে সূর্য্য নাচে আর নাচে তারা।
পাতালে বাসুকী নাচে বলি গোরা গোরা॥

তথা ত্রিলোচনের পদ :—

অরুণ করল আঁখি, তারক ভ্রমরা পাখী,
ডুবু ডুবু করুণ মকরন্দে।
বদন পূর্ণিমাচান্দে, ছটায় পরাণ কান্দে,
তাহে নব প্রেমার আরম্ভে॥
আনন্দ নদীয়া পুরে, টলমল প্রেমার ভরে,
শচীর দুলাল গোরা নাচে।
জয় জয় মঙ্গল পড়ে, শুনিয়া চমক লাগে,
মদনমোহন নটরাজে॥
পুলকে ভরল গায়, স্বর্ম্ম বি[illegible] বি[illegible] তায়,
রোম চক্রে সোনার কদম্ব।
প্রেমার আরম্ভে তনু, যেন প্রভাতের ভানু
আধ বাণী কহে কম্বুকণ্ঠ॥
শ্রীপাদ পদ্ম গন্ধে, বেড়ি দশনখ চান্দে,
উপরে কনক বঙ্করাজ।
যখন ভাতিয়া চলে, বিজুরী ঝলমল করে,
চমকরে অমর সমাজ॥

সপ্তদ্বীপ মহি মাঝে, তাহে নবদ্বীপ সাজে,
তাহে নব প্রেমার প্রকাশ।
তাহে নব গৌরহরি, গুণ সঙ্কীর্ত্তন করি,
আনন্দিত এ ভূমি আকাশ॥
সিংহের শাবক যেন, গভীর গর্জ্জন হেন,
হুঙ্কার হিল্লোল প্রেমসিন্ধু।
হরি হরি বোল বলে, জগৎ পড়িল ভোলে,
দুকুল খাইল কুলবধু॥
অঙ্গের ছটায় যেন, দিনকর প্রদীপ হেন,
তাহে লীলা বিনোদ বিলাস।
কোটি কোটি কুসুম ধনু, জিনিয়া বিনোদ তনু,
তাহে করে প্রেমের প্রকাশ॥
লাখ লাখ পূর্ণিমাচান্দে, জিনিয়া বদন ছান্দে,
তাহে চারু চন্দন চন্দ্রিমা।
নয়ন অরুণ ছলে, ঝর্ ঝর্ অমিয় ঝরে,
জনম মুগধ পাইল প্রেমা॥
কি কব উপমা তার, করুনা বিগ্রহ সার,
হেন রূপ মোর গোরা রায়।
প্রেমায় নদীয়ার লোকে, তাহে দিবানিশি থাকে,
আনন্দে লোচনদাস গায়॥

শ্রীনিমাই বিজয়ার দিনে গয়াযাত্রা করেন, আর চারি মাস পরে পৌষ মাসে শ্রীনবদ্বীপে প্রত্যাগমন করেন। আসিয়া সঙ্কীর্ত্তনারম্ভ করিলেন। তিনি চারি সপ্তাহের মধ্যে নদের আকার পরিবর্ত্তিত হইল। সেই প্রকাণ্ড নগরে কিরূপ তরঙ্গ উঠিল তাহা উপরে লোচনের প্রলাপে

কতক প্রকাশ পাইবে। ভারতবর্ষীয়গণ কি হিন্দু, কি বৌদ্ধ, কি যোগী, কি দেবোপাসকগণ, সকলে শান্ত প্রকৃতির। কিন্তু নদে এখন একদল হিন্দুর সৃষ্টি হইল, যাহাদের হুঙ্কারে, গর্জ্জনে, নর্ত্তনে, মৃদঙ্গের বোলে ও কীর্ত্তনের রোলে, ভব্য নগরবাসীগণ একেবারে অস্থির হইয়া উঠিলেন, সমাজের বন্ধন ছিন্নভিন্ন হইল, কাজেই নিমাইর বড় বড় শত্রুর সৃষ্টি হইল।

ইহার মধ্যে একজন কমলাক্ষ। তাঁহার নাম পূর্ব্বে করিয়াছি। ইনি তখন গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের প্রধান। ইনি পরম পণ্ডিত, তাপস ব্রাহ্মণ, দিবানিশি ভজন লইয়া থাকেন। তাঁহার বিষয় সম্পত্তির ও সম্মানের অবধি ছিল না। শ্রীহট্টের রাজা, কৃষ্ণদাস নাম লইয়া, শান্তিপুরে থাকিয়া তাঁহার চরণসেবা করিতেছেন। এই কমলাক্ষ অদ্বৈত আচার্য্য নামে বিখ্যাত। ইনি যদিও বৈষ্ণব, তবু তাঁহার বৈষ্ণবতায় ও নিমাই যে বৈষ্ণবতা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে অনেক প্রভেদ। বলিতে কি, তাঁহার বৈষ্ণবতায় সহিত অন্যান্য শ্রেণীর হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীগণের মতের বড় একটী বিভিন্নতা ছিল না। তবে তাঁহাদের ঠাকুর শিব দুর্গা কি কালী, আর তাঁহার ঠাকুর বিষ্ণু অর্থাৎ গদাপদ্মাদি-ধারী চারি হস্তের নারায়ণ। কিন্তু নিমাইর ভজনীয় দ্বিভুজ মুরলীধর। নিমাই নবদ্বীপে এক প্রকাণ্ড বৈষ্ণব দল সৃষ্টি করিলেন। তাঁহারা ও অদ্বৈত আচার্য্যের দলস্থ সকলে, অদ্বৈতের শীর্ষস্থানীয় পদে নিমাইকে বসাইলেন। ক্রমে তাঁহারা নিমাইকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া পূজা করিতে লাগিলেন।

অদ্বৈতের এ সব ভাল লাগে না, তিনি বলেন ভজনে নাচন আর গায়ন কেন? আবার বলেন কলিকালে অবতার কি? শাস্ত্রে ইহার কোন আভাস নাই। একি সামান্য রহস্যের কথা যে, জগ-

ন্নাথের বেটা কিনা আজ আবার ঠাকুর হইয়া বসিল? যখন অদ্বৈত আচার্য্যের এরূপ ভাব, তখন কাজেই নিমাইর এক প্রধান কাজ হইল, এই অদ্বৈত আচার্য্যকে বশীভূত করা। ওদিকে অদ্বৈতের সংকল্প যে তিনি তাঁহার শীর্ষস্থানীয় পদ ত্যাগ করিয়া কখন জগন্নাথের বেটার অধীন হইবেন না। কিন্তু প্রভু পরিশেষে আচার্য্যকে বশীভূত করিলেন। *

নিমাইর আর এক শত্রু জগাই মাধাই। ইহারা শাক্ত ছিলেন, কিন্তু ধর্ম্মের কোন ধার ধারিতেন না। মদ্য পান করিতেন আর নদেবাসীর উপর বড় অত্যাচার করিতেন, কারণ ইহারা নগরে কোটাল

* শ্রীঅদ্বৈত তপস্যা করিয়া শ্রীভগবানকে আনিলেন। গৌর-নিতাই যেরূপ ঠাকুর তিনি সেইরূপ উপাসকদিগের প্রতিনিধি। এই লীলার পুষ্টির নিমিত্ত অদ্বৈতের ন্যায় একজন তেজস্কর ব্যক্তিকে প্রভুর প্রতিদ্বন্দ্বী করার প্রয়োজন হইয়াছিল। সেই নিমিত্ত যদিও তিনি এক প্রকার জানিতেন যে শ্রীভগবান মনুষ্য সমাজে আসিবেন, কিন্তু তাঁহার এই ভ্রম হয় যে সে তিনি কে? তিনি কি আসিয়াছেন, না আসিতেছেন? যদি আসিয়া থাকেন তবে তিনি যে জগন্নাথের বেটা তাহার প্রমাণ কি? আবার ইহাও বলিতেন যে ভগবান যে সত্য আসিবেন তাহার শাস্ত্র কৈ? সেই নিমিত্ত বৈষ্ণবদিগের প্রধান শ্রীঅদ্বৈত, প্রভুকে পদে পদে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, আর সকল পরীক্ষায়ই প্রভু উত্তীর্ণ হয়েন। কাজেই তখন শ্রীঅদ্বৈত মহাপ্রভুর শরণাগত হইলেন। যদি অদ্বৈত প্রথমেই তাঁহাকে চিনিতে পারিতেন, তবে এই কঠোর পরীক্ষা আর হইত না। তাই আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, "হে সন্দিগ্ধচিত্ত পাঠক, তুমি যদি প্রভুকে পরীক্ষা করিতে চাও তবে দেখিবে তুমি যেরূপ তাঁহাকে কঠোর পরীক্ষা করিতে, অদ্বৈত তাহা তোমার পূর্ব্বেই করিয়া গিয়াছেন।"

(২য়—৬ষ্ঠ খণ্ড)

ছিলেন, অস্ত্রধারী সৈন্য কি দস্যু সহায় ছিল, কাজেই নিরীহ বিদ্যাব্যবসায়ী নগরবাসীরা তাহাদের নামে কাঁপিয়া উঠিতেন। সে দুজনার কথা এইরূপ লেখা আছে,—

হরিনাম দুই ভাই সহিতে না পারে।

প্রভুর আজ্ঞাক্রমে নিতাই ও হরিদাস নগরে ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন। একদিন তাঁহারা জগাই মাধাইর নিকট গমন করেন, জগাই মাধাই "মার মার" করিয়া তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া আইসে। ইহাতে নগরের লোকের বড় আমোদ হয়। তাহারা বলিতে লাগিল, নিমাই পণ্ডিত বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছিলেন, বেশ হইয়াছে। এদিকে নিতাই, প্রভুর নিকট যাইয়া বলিলেন যে, তিনি আর প্রচার করিতে যাইবেন না। তিনি বলিলেন "প্রভু, সাধুকে সকলেই তরাইতে পারে, তুমি জগাই মাধাইকে আগে উদ্ধার কর তাহা হইলে তোমার প্রচারিত ধর্ম্ম লোকে শীঘ্র গ্রহণ করিবে।" প্রভু দেখিলেন তাঁহার এই দুইটি মাতাল বশীভূত করিতে হইবে, নতুবা তাঁহার কার্য্য হইবে না।

তৃতীয় শত্রু চাঁদকাজী, গৌড়ের ও নদের অধিকারীর অর্থাৎ রাজার প্রতিনিধি, রাজা হোসেন সাহার দৌহিত্র। কিন্তু বলিতে ঘৃণা হয়, নিমাইর বিপক্ষগণ হিন্দু হইয়া এই মুসলমান কাজীর নিকট নিমাই ও তাহার দলস্থগণের নামে নালিশ করিল। বলিল যে, ইহারা দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছে, যেহেতু ইহারা ভগবানকে মনে মনে না ডাকিয়া চেঁচাইয়া ডাকে ইত্যাদি। কাজীর বহুতর সৈন্য ছিল। তিনি হিন্দুতে হিন্দুতে এইরূপ বিবাদ দেখিয়া বড় আহ্লাদিত হইয়া কীর্ত্তন বন্ধ করিতে লাগিলেন। যেখানে কীর্ত্তন হয়, তিনি সেখানেই যাইয়া তাহাদিগকে প্রহার করিতে ও ভয় দেখাইতে লাগিলেন। বিস্তর খোল ভাঙ্গিলেন, কাহারও ঘর ভাঙ্গিলেন, কাজেই কীর্ত্তন একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। তখন এরূপ

হইল যে কাজীকে রোধ না করিতে পারিলে আর নিমাইর ধর্ম্মপ্রচার হয় না। সুতরাং নিমাইর এই জন্যে বলবান কাজীকে দমন করিতে হইয়াছিল। কিরূপে তিনি ইহা করিলেন তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রভু অসংখ্য লোক লইয়া তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

প্রভু প্রথমে গোপনে শ্রীবাসের প্রাচীরবেষ্টিত মন্দিরে কীর্ত্তন করিতেন। জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিতে প্রথমে বাহিরে প্রকাশ হইলেন। জগাই মাধাই এক প্রকার নদীয়ার রাজা, অথচ ঘোর অত্যাচারী, তাহাদিগকে চরণতলে আনয়ন করায় প্রভুর নিজ আধিপত্য সম্পূর্ণরূপে স্থাপিত হইল। যাহা বাকি ছিল তাহা নগরকীর্ত্তন করিয়া ও কাজীকে উদ্ধার করিয়া সমাপ্ত করিলেন। এইরূপে নদীয়ার লীলা সাঙ্গ হইলে, প্রভুর নদীয়ার বাহিরে দৃষ্টি পড়িল, আর তাই সন্ন্যাস লইলেন।

নদীয়ায় গোপনে আর একটী বলবত কার্য্য করিলেন। নদীয়ানগরে যতদিন শ্রীগৌরাঙ্গ ছিলেন, সেখানে তাঁহার মুহুর্মুহু শ্রীভগবান ভাব হইত। শ্রীকৃষ্ণ যেমন বৃন্দাবনে ছিলেন, তিনি সেইরূপ নদীয়ায় প্রেমের বস্তু ভগবান থাকিতে ইচ্ছা করিলেন। যখন তিনি সন্ন্যাস লইলেন, তখন তিনি ভক্তির বস্তু, প্রভু, কি মহাপ্রভু হইলেন। নদীয়ায় তিনি "প্রাণনাথ" বলিয়া পূজিত হইতেছিলেন। যখন সন্ন্যাস লইয়া বাহিরে আইলেন, তখন হইলেন "গুরু" "পতিতপাবন" "অগতির গতি" ইত্যাদি ইত্যাদি।

শ্রীবৃন্দাবনের কথা স্মরণ করুন। শ্রীকৃষ্ণ সেখানে নন্দ, যশোদা, বলরাম, রাখালগণ ও গোপীগণের প্রিয় বস্তু ছিলেন। যখন তিনি মথুরায় গেলেন, তখন আর প্রাণনাথ থাকিলেন না, তখন হইলেন ভক্তের শিরোমণি যে উদ্ধব বা কুব্জা, তাহাদের প্রভু বা কর্ত্তা।

শ্রীপ্রভু নবদ্বীপকে নব-বৃন্দাবন করিলেন, আপনি তথায় কৃষ্ণ হইলেন, শচী ও জগন্নাথ, যশোদা ও নন্দ হইলেন, নিতাই প্রভৃতি সখা হইলেন, এবং বিষ্ণুপ্রিয়া ও নদীয়ানাগরীগণ হইলেন তাঁহার প্রেয়সী। ব্রজের ভজনই সর্ব্বোত্তম ভজন, অর্থাৎ ভগবানকে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও কান্তভাবে ভজনা করা। এই প্রেমভজনা কৃষ্ণলীলার সাহায্যে অতি সহজ করা যায়। অতএব প্রভু গোপনে গোপনে জীবের ভজন সুলভ নিমিত্ত নদীয়ায় এক পৃথক নিগূঢ় লীলার সৃষ্টি করিলেন। এই ভজনের নাগর তিনি স্বয়ং, আর বিষ্ণুপ্রিয়া ও নদীয়ানাগরীগণ রাধা ও গোপী। নদীয়ার ভক্তগণ এই ভজনে একবারে মজিয়া গেলেন, গিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণকে ভুলিলেন। এই ভক্তগণের মধ্যে কয়েকটী পদকর্ত্তার নাম করিতেছি, যথা—গোবিন্দ, মাধব, বাসুঘোষ, নরহরি, ত্রিলোচন, নয়নানন্দ, বলরাম, শেখর ইত্যাদি। আর একজন পূর্ব্বে এই ভজনের বিরোধী ছিলেন, পরে অনুগত হয়েন, তিনি স্বয়ং বৃন্দাবনদাস। সে কথা পরে বলিব। এখন এই পদকর্ত্তাদিগের কয়েকটী পদ নিম্নে দিতেছি। পদগুলি সম্পূর্ণরূপে দিলে অনেক স্থান লইবে সেই জন্য স্থানে স্থানে বাদ দিয়া প্রকাশিত হইতেছে। যাহাদের এরূপ পদ দেখিতে লোভ হয়, তাঁহারা পদ সংগ্রহ গ্রন্থে ইহা অনেক দেখিতে পাইবেন। লোভের কথা বলিলাম তাহার কারণ এই যে, যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে চিত্ত দিয়াছেন, তাঁহারা এই সমুদয় পদ পড়িয়া পুলকিত হইবেন সন্দেহ নাই। যথা পদ ঃ—

ধানশী।

সো জেনে মনু সো নেনে মনু।
কিখনে গৌরাঙ্গ দেখিয়া আইনু॥
সাত পাঁচ সখী যাইতে ঘাটে।
শচীর দুলাল দেখি আইনু বাটে॥

চাঁদ ঝলমলি বদন ছাঁদে।
দেখিয়া যুবতী ঝুরিয়া কাঁদে॥
চাচর কেশে ফুলের ঝুটা।
যুবতী উমতি কুলের খোটা॥
তাহে তনু সুখ বসন পরে।
গোবিন্দদাস তেই সে ঝুরে॥

উপরের পদটী পূর্ব্বরাগের। রাধাকৃষ্ণ লীলায় পূর্ব্বরাগের বিস্তর পদ আছে, কিন্তু তাহার মধ্যে একটীও উপরের পদ অপেক্ষা ভাল পাইবেন না। আবার দেখুন যে, এইরূপ পদ দুই একজন প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা নয়। নদীয়ায় তখন উপস্থিত, কি তাহার পরের, যত প্রধান পদকর্ত্তা, সকলেই রাধাকৃষ্ণ ভজন ছাড়িয়া গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া বা গৌর-নদেনাগরী ভজন আরম্ভ করিলেন। নিম্নের পদটী বলরামদাসের,—নব্য বলরামদাস নহেন, আসল বলরামদাস, পদ যথাঃ—

ধানশ্রী।

গৌর বরণ, মণি আভরণ, নাটুয়া মোহন বেশ।
দেখিতে দেখিতে ভুবন ভুলল, ঢলিল সকল দেশ॥
মনু মনু সই দেখিয়া গোরাঠাম।
বধিতে যুবতী গঢ়ল কো বিধি, কামের উপরে কাম॥ ধ্রু॥
ওরূপ দেখিয়া নদীয়া-নাগরী পতি উপেখিয়া কাঁদে।
ভালে বলরাম, আপনা নিছিল, গোরা-পদ-নখছাঁদে॥

ধানশ্রী।

আর একদিন, গৌরাঙ্গসুন্দর, নাহিতে দেখিলুঁ ঘাটে।
কোটী চাঁদ জিনি, বদন সুন্দর, দেখিয়া পরাণ ফাটে॥

অঙ্গ চল চল, কনক কষিল, অমল কমল আঁখি।
নয়ানের শর, ভাঙ ধনুবর, বিধয়ে কামধানুকী॥
কুটিল কুন্তল, তাহে বিন্দু জল, মেঘে মুকুতার দাম।
জলবিন্দু তল, হেমমোতি জনু, হেরিয়া মূরছে কাম॥
মোছে সব অঙ্গ, নিঙ্গাড়ি কুন্তল, অরুন বসন পরে।
বাসুঘোষ কয়, হেন মনে লয়, রহিতে নারিবে ঘরে॥

এইরূপ পদকর্ত্তাদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান এই কয়েকজন ছিলেন যথা—নরহরি, বাসু, মাধব, গোবিন্দ ঘোষ ও লোচন। লোচনের ধামালি প্রসিদ্ধ ও উপাদেয়।

সো বহুবল্লভ গোরা, জগতের মনচোরা,
তবে কেন আমার করিতে চাই একা।
হেন ধন অন্যে দিতে, পারে বল কার চিতে,
ভাগাভাগি নাহি যায় দেখা॥
সজনি লো মনের মরম কই তোরে।
না হেরি গৌরাঙ্গ মুখ, বিদরিয়া যায় বুক,
কে চুরি করিল মনচোরে॥ ধ্রু॥
লও কুল লও মান, লও শীল লও প্রাণ,
লও মোর জীবন যৌবন।
দেও মোরে গোরানিধি, যাহে চাহি নিরবধি,
সেই মোর সরবস ধন॥
নতু সুরধুনী নীরে, পশিয়া তেজিব প্রাণ,
পরাণের পরাণ মোর গোরা।
বাসুদেব ঘোষ কয়, সে ধন দিবার নয়,
দণ্ডে দণ্ডে তিলে হই হারা॥

উপরের পদে বাসু বলিতেছেন, তোমরা আমার সমুদয় লও, কিন্তু আমার সর্ব্বস্ব ধন, পরাণের পরাণ, গৌরাঙ্গকে দাও।

বিভাস।

করিব মুই কি করিব কি ?
গোপত গৌরাঙ্গের প্রেমে ঠেকিয়াছি॥ ধ্রু॥
দীঘল দীঘল চাঁচর কেশ রসাল দুটী আঁখি।
রূপে গুণে প্রেমে তনু নানা জনু দেখি॥
আচম্বিতে আসিয়া ধরিল মোর বুক।
সপনে দেখিনু আমি গোরাচাঁদের মুখ॥
বাপের কুলের মুই ঝিয়ারী।
শ্বশুর কুলের মুঞি কুলের বৌহারি॥
পতিব্রতা মুঞি সে আছিনু পতির কোলে।
সকল ভাসিয়া গেল গোরাপ্রেমের জলে॥
কহে নরনানন্দ বুঝিলাম ইহা।
কোন পরকারে এখন নিবারিব হিয়া॥

সুহই।

সই, দেখিয়া গৌরাঙ্গচাঁদে।
হইনু পাগলি, আকুলি ব্যাকুলি, পড়িনু পীরিতি ফাঁদে॥
সই, গৌর যদি হৈত পাখী।
করিয়া যতন, করিতু পালন, হিয়া পিঞ্জিরায় রাখি॥
সই, গৌর যদি হৈত ফুল।
পরিতাম তবে, খোপার উপরে, দুলিত কাণেতে দুল॥
সই, গৌর যদি হৈত মোতি।
হার যে করিতু, গলায় পরিতু, শোভা যে হইত অতি॥

সই, গৌর যদি হৈত কাল।
অঞ্জন করিয়া, রঞ্জিতাম আঁখি, শোভা যে হইত ভাল॥
সই, গৌর যদি হৈত মধু।
জ্ঞানদাস কহে, আস্বাদ করিয়া, মজিত কুলের বধু॥

কিন্তু হে গৌরগত-প্রাণ জ্ঞানদাস! গৌর পাখী কি ফুল না হইয়া যাহা আছেন তাই ভাল না?

কামোদ।

সখি গৌরাঙ্গ গড়িল কে?
সুরধুনী তীরে, নদীয়ানগরে, উয়ল রসের দে।
পিরীতি পরশ, অঙ্গের ঠাম, ললিত লাবণ্যকলা।
নদীয়ানাগরী, করিতে পাগলী, না জানি কোথা না ছিলা॥
সোণার বাঁধল, মণির পদক, উর ঝলমল করে।
ও চাঁদমুখের, মাধুরী হেরিতে, তরুণী হিয়া না ধরে॥
যৌবন তরঙ্গ, রূপের বাণ, পড়িয়া অঙ্গ যে ভাসে।
শেখরের পঁহু, বৈভব কো কুহুঁ, ভুবন ভরল যশে॥

উপরে কেবল দুই একটী পূর্ব্বরাগের পদ উদ্ধৃত করিলাম, কিন্তু মহাজনগণ গৌরাঙ্গকে নাগর করিয়া মাথুর প্রভৃতি সকল রসের পদ করিয়াছিলেন। নিম্নে উদাহরণ স্বরূপ গোটা কয়েক মাথুরের পদ দেওয়া গেল যথা—

করুণ।

গেল গৌর না গেল বলিয়া।
হাম অভাগিনী নারী অকূলে ভাসাইয়া॥ ধ্রু॥
হায় রে দারুণ বিধি নিদয় নিঠুর।
জন্মিতে না দিলি তরু ভাঙ্গিলি অঙ্কুর॥

হায়রে দারুণ বিধি কি বাদ সাধিলি।
প্রাণের গৌরাঙ্গ আমার কারে নিয়া দিলি॥
আর কে সহিবে আমার যৌবনের ভার।
বিরহ-অনলে পুড়ি হব ছারখার॥
বাসু ঘোষ কহে আর কারে দুঃখ কব।
গোরাচাঁদ বিনা প্রাণ আর না রাখিব॥

ভূপালী।

হেদে রে পরাণ নিলাজিয়া। এখন না গেলি তনু তেজিয়া॥
গৌরাঙ্গ ছাড়িয়া গেছে মোর। আর কি গৌরব আছে তোর॥
আর কি গৌরাঙ্গচাঁদে পাবে। মিছা প্রেম-আশা-আশে রবে॥
সন্ন্যাসী হইয়া পঁহু গেল। এ জনমের সুখ ফুরাইল॥
কাঁদি বিষ্ণুপ্রিয়া কহে বাণী। বাসু কহে না রহে পরাণি॥

পাহিড়া।

অবলা সে বিষ্ণুপ্রিয়া, তুয়া গুণ সোঙরিয়া,
মূরছি পড়ল ক্ষিতিতলে।
চৌদিকে সখীগণ, ঘিরি করে রোদন,
তুল ধরি নাসার উপরে॥
তুয়া বিরহানলে, অন্তর জর জর,
দেহ ছাড়া হইল পরাণি।
নদীয়ানিবাসী যত, তারা ভেল মূরছিত,
না দেখিয়া তুয়া মুখখানি॥
শচী বৃদ্ধা আধমরা, দেহ তার প্রাণ ছাড়া,
তার প্রতি নাহি তোর দয়া।

নদীয়ার সঙ্গীগণ, কেমনে ধরিবে প্রাণ,
কেমনে ছাড়িলা তার মায়া ॥
যত সহচর তোর, সবই বিরহে ভোর,
শ্বাস বহে দরশন আশে।
এ দেহে রসিকবর, চল হে নদীয়াপুর,
কহে দীন এ মাধব ঘোষে ॥

শ্রীরাগ।

গৌরাঙ্গ ঝাট করি চলহ নদীয়া।
প্রাণহীন হইল অবলা বিষ্ণুপ্রিয়া ॥
তোমার পূরব যত চরিত পীরিত।
সোঙরি সোঙরি এবে ভেল মূরছিত ॥
হেন নদীয়াপুর সে সব সঙ্গিয়া।
ধূলায় পড়িয়া কান্দে তোমা না দেখিয়া ॥
কহয়ে মাধব ঘোষ শুন গৌরহরি।
তিলেক বিলম্বে, আমি আগে যাই মরি ॥

এইরূপ মান খণ্ডিতা প্রভৃতি অনেক রসের পদ আছে। নীচের পদটীতে প্রভুকে ধৃষ্ট নাগর সাজান হইয়াছে।

অলসে অরুণ আঁখি, কহ গৌরাঙ্গ একি দেখি,
রজনী বঞ্চিলে কোন স্থানে।
নদীয়া নাগর সনে, রসিক হইয়াছ বটে,
আর কি পার ছাড়িবারে।
সুরধুনী তীরে গিয়া, মার্জ্জন করহে হিয়া,
তবে সে আসিতে দিব ঘরে ॥

এ পদটী বৃন্দাবন দাসের। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া প্রভুকে বলিতেছেন কিগো

ঠাকুর, তোমার চক্ষু ঢুলু ঢুলু ও অরুণ বর্ণের কেন? বুঝেছি; নদীয়া নাগরীর সহিত মজিয়াছ, কিন্তু আমাকে ছুইও না।" ইত্যাদি। এই বৃন্দাবনদাস তাঁহার গ্রন্থে পূর্ব্বে লিখিয়াছেন যে এ অবতারে "শ্রীগৌরাঙ্গ নাগর" বলিয়া আর কেহ ভজনা করিবে না। কিন্তু পরে আপনি স্রোতে পড়িয়া গেলেন, যাইয়া তাহাই করিতে লাগিলেন। তাহার প্রমাণ উপরের পদ।

যখন শ্রীগৌরাঙ্গ নদীয়া নগরে ভগবানরূপে মুহুর্মুহু প্রকাশ পাইতে লাগিলেন, তখন নদেবাসী ভক্তগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণকে একেবারে না ভুলিলেও, তাঁহাদিগকে আর ভজনের নিমিত্ত প্রয়োজন বোধ হইল না। শ্রীবাস বলিলেন, আমাদের গৌররূপই ভাল। শ্রীধর প্রার্থনা করিলেন যে, প্রভু তুমি গৌররূপে আমার হৃদয়ে থাক। শিবানন্দ সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র, শ্যামরায় বিগ্রহ স্থাপন করায়, তিনি পুত্রকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এত কষ্ট করিয়া আমরা কালকে গৌর করিলাম, তুই আবার গৌরকে কাল করিলি?

ইহার মধ্যে একটা বড় রহস্য আছে। যখন পণ্ডিত মহাশয়গণ আপত্তি তুলিলেন যে কলিকালে অবতার নাই, তখন ভক্তগণ শাস্ত্র দ্বারা প্রমাণ করিলেন যে, আছে, ও তাঁহার বর্ণ সোণার ন্যায়। অতএব কলির কৃষ্ণ হইতেছেন গৌর। তাহা যদি হইল, তখন ভক্তগণ বলিতে লাগিলেন যে দ্বাপরের কৃষ্ণ কাল ছিলেন, আর সে যুগের লোকেরা কৃষ্ণকে ভজন করিয়া আসিয়াছেন। আমরা কলির লোক, আমাদের দ্বাপরের ঠাকুরকে ভজনা না করিয়া কলির যে সোণার বর্ণের ঠাকুর গৌর, তাঁহাকে ভজনা করাই উচিত ও প্রসিদ্ধ।

অনেকে এ কথাও তুলিলেন যে, যেমন কৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া মথুরায় যাইয়া সেখানে নারায়ণ মাত্র হইলেন, সেইরূপ গৌরাঙ্গ সন্

লইয়া যেই কৃষ্ণচৈতন্য হইলেন, সেই তিনি নারায়ণ অর্থাৎ গুরু হইলেন, আমাদের কান্ত আর রহিলেন না, আমাদের কান্ত নদের নিমাই।

শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে গোপীগণের সহিত লীলা করিয়া বহিরঙ্গ লোকের চক্ষে অসুর দমন করিতে মথুরায় গমন করিলেন। সেইরূপ যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে কান্তভাবে ভজনা করেন, অর্থাৎ নদেবাসীগণ, তাঁহারা বলেন যে শ্রীগৌরাঙ্গ নদীয়ানগরে নদীয়ানাগরীর সহিত বিলাস করিয়া বহিরঙ্গ লোকের চক্ষে সন্ন্যাসী হইয়া নদের বাহিরে পাষণ্ড দলন করিতে গমন করিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃত পক্ষে বৃন্দাবন ত্যাগ করেন না। তিনি বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া এক পদও গমন করেন নাই, বৃন্দাবনে গোপন ভাবে রহিলেন। সেইরূপ গৌরাঙ্গ নদীয়া ত্যাগ করিলেন না, গোপন ভাবে সেখানে রহিলেন, যথা বৃন্দাবন দাসের পদ :—

"অদ্যাপী সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"

এ ভাগ্যবান কাহারা? ইহারা নদীয়ানাগরী। এ নদীয়ানাগরী কি ভদ্রলোকের স্ত্রী ও কন্যা গৌরাঙ্গের সহিত কুলটা হইয়াছিলেন? না, তাহা নয়। নদীয়ানাগরী যাহারা গৌরাঙ্গকে নাগর ভাবে অর্থাৎ কান্তভাবে ভজনা করেন। এই নদীয়ানাগরীগণের নাম শুনিবেন? একজন নরহরি, একজন বাসু ঘোষ, একজন ত্রিলোচন ইত্যাদি ইত্যাদি।

কান্তভাবে ভজনা কি? কান্ত মানে স্বামী। স্বামীর নিকট তাহার স্ত্রী কি প্রার্থনা করেন? ভালবাসা। শ্রীভগবানকে যদি ভালবাসিতে চাও তবে তাঁহাকে কান্ত বলিয়া কি প্রাণনাথ বলিয়া বোধ করিও। কিন্তু যদি তোমার অন্য প্রার্থনা থাকে, যথা ভবনদী পার

হওয়া, কি পাপ মার্জ্জনা, তবে তাঁহাকে প্রভু বলিয়া ভজনা করিতে হইবে। অতএব এইরূপ যে নাগরীগণ তাঁহাদের গৌরাঙ্গের নিকট কেবল এই প্রার্থনা যে তাঁহার সহিত তাঁহাদের প্রীতি হয়। অতএব তাঁহাদের যোগ্য প্রার্থনা এই, হে নাথ, হে প্রাণ, আমি তোমার বিরহে যন্ত্রণা পাইতেছি, আমার হৃদয়ে এসো, তোমার চন্দ্রবদন হেরি ৷৵

অতএব গৌরাঙ্গ অবতার যদি নদীয়ায় সমাপ্ত হইত তবুও যে জন্য প্রভু আসিয়াছিলেন তাহা রাখিয়া যাইতে পারিতেন। জীবকে এই কয়েকটী বিষয় জানাইবার নিমিত্ত তাঁহার অবতার। (১) শ্রীভগবান কিরূপ বস্তু; (২) তাঁহাকে কিরূপে পাওয়া যায়; (৩) প্রেম কি ও কিরূপে উহা আহরণ করা যায়। শ্রীনবদ্বীপে এ সমুদয় প্রচুররূপে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। সুতরাং তিনি নদীয়ায় লীলা সমাপ্ত করিলে, জগতে প্রেম ধর্ম্ম থাকিয়া যাইত।

যখন শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গেলেন, তখন একদিন তিনি রাধার বিরহে অস্থির হইয়া সেখানে থাকিতে না পারিয়া প্রিয়াকে দর্শন দিতে বৃন্দাবনে আইলেন। আসিবার সময় রাজবেশে আসিলেন। তাহা দেখিয়া শ্রীমতী ঘোমটা টানিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, ইনি অতি ঐশ্বর্য্যশালী রাজা, ইঁহাকে আমি ভজন করি নাই। আমি যাঁহাকে ভজনা করিয়াছি তিনি আমারি মত, মাধুর্য্যময় ঐশ্বর্য্য বিবর্জ্জিত। গৌরাঙ্গ ঈশ্বরপুরীর নিকট মন্ত্র লইলেন। প্রভু সন্ন্যাস লইলে পুরী গোসাঞির আর তাঁহাকে দেখিলেন না। বলিলেন, আমার সেই প্রিয়তম বস্তু গৌরাঙ্গ তিনি নাগর। তাঁহার সন্ন্যাসী-রূপ আমি দেখিব না। ঐরূপ পুরুষোত্তম আচার্য্য প্রভুর অতি মর্ম্মী ভক্ত। প্রভু সন্ন্যাস লইলে তিনি রাগ করিয়া কাশীতে গমন করিয়া সন্ন্যাস লইলেন, নাম পাইলেন স্বরূপ,—সেই স্বরূপ যিনি গম্ভীরার সাক্ষী। তিনিও

প্রভুর সন্ন্যাস মূর্ত্তি দেখিতে চান নাই বলিয়া প্রভুকে ত্যাগ করেন কিন্তু পরে আর থাকিতে পারিলেন না, আসিয়া চরণে পড়িলেন রাধাকৃষ্ণবাদীরা তখন আর এক কথা উঠাইলেন। তাহারা বলিতে লাগিলেন যে পরকীয়া ভজন সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ, কিন্তু তাহা গৌর-লীলায় নাই। গৌরবাদীরা উত্তর দিলেন, অবশ্য আছে, যেহেতু প্রভু সন্ন্যাস লইলে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী তখন পরকীয়া হইলেন।

এইরূপ গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া ভজন ক্রমে চলিতে লাগিল। নরোত্তম ঠাকুর গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া বিগ্রহ স্থাপন করিলেন। বক্রেশ্বর নিম্নানন্দ সম্প্রদায় সৃষ্টি করিলেন, কিন্তু ক্রমে শ্রীবৃন্দাবনের গোস্বামীগণের প্রতাপে সে ভজন উঠিয়া গেল। ভজন ত গেল, স্বয়ং গৌরাঙ্গ পর্য্যন্ত যাইবার উপক্রম হইয়াছিলেন।

কিন্তু আবার সেই ভজন প্রচলিত হইতেছে, সে বড় আশ্চর্য্য কথা। মনে ভাবুন এ সন্দেহের যুগ। এ সন্দেহ ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে এদেশে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া ভজন, কি রাধাকৃষ্ণ ভজন ত পাছের কথা, ভজন পর্য্যন্ত উঠিয়া গিয়াছিল। অনেকে নাস্তিক হইয়া রহিলেন, যাহার অতদূর পতন হয় নাই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে একটা কল্পনার দ্রব্য বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন। তাহারা বলিতে লাগিলেন কৃষ্ণ বলিয়া যে কেহ ছিলেন তাহার প্রমাণ কি? সুতরাং রাধাকৃষ্ণ লীলারও কোন প্রমাণ নাই। এমন সময় শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা, যাহা গুপ্ত ছিল, জগতে প্রকাশ হইল। যিনি গৌর-লীলা পাঠ করেন তিনিই প্রভুর পক্ষপাতী হয়েন। পরে অনেকে তাঁহার লীলা পড়িয়া তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিলেন।

তাঁহারা বলিতে লাগিলেন যে শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্বের যদিও কোন প্রমাণ নাই, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাখেলার প্রচুর প্রমাণ আছে।

তাহাতে জানা যায় যে তিনি স্বয়ং ভগবান। আর তিনি যখন বলিতেছেন শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভজন কর, তখন সেই যথেষ্ট প্রমাণ যে সে ভজন শ্রীভগবানের অনুমোদনীয়। তাহারা তাই রাধাকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গ উভয় ভজন করিতে লাগিলেন।

কিন্তু আর একদল বলিতে লাগিলেন যে আর রাধাকৃষ্ণ ভজনের প্রয়োজন কি? তাঁহারা নরহরি ও বাসুর পথ ধরিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার ভজন ত আমাদের সম্মুখে। রাধা-কৃষ্ণ অনেক দিনের কথা, কিন্তু গৌর-লীলা যে আমরা এক প্রকার চক্ষে দেখিতেছি। অতএব গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া ভজন যেরূপ আমাদের জীবন্ত সামগ্রী হইবে, রাধাকৃষ্ণ ভজন কখনও সেইরূপ হইবে না।

তাই এখন গৌরবাদীর দলের বড় প্রতাপ, ইহারাই এখন প্রকৃত পক্ষে প্রভুর ধর্ম্মের প্রতিনিধি বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীভাগবতভূষণ, জিয়ড় নৃসিংহ ও সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজী গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া ভজন পুনর্জীবিত করেন। এই তিনজনে প্রথমে গৌর-নিতাইকে দাস্য ভাবে ভজনা আরম্ভ করিলেন। পরে জিয়ড় নৃসিংহ ও সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজী শ্রীগৌরাঙ্গকে কান্ত ভাবে ভজন করিতে লাগিলেন। ভাগবতভূষণ ইহাতে যোগ দিতে পারিলেন না। তিনি তখন শ্রীনিত্যানন্দের পথ অবলম্বন করিয়া প্রচার করিতেছিলেন,—দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, দলবল লইয়া 'ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ" গাহিয়া বেড়াইতেছিলেন। তিনি তাঁহার দুই প্রিয় বন্ধুকে বলিলেন যে তাঁহারা নির্জ্জনে ভজনা করেন, তাঁহারা মনের সাধ মিটাইয়া প্রভুকে আস্বাদ করিতে পারেন। কিন্তু তিনি প্রচারক, বহিরঙ্গ লোক লইয়া তাঁহার ইষ্টগোষ্ঠী, তাঁহার অত নিগূঢ় ভজনা প্রচার করিলে বিষম অনিষ্ট হইবে। ভাগবতভূষণের এই কথা

আমরা সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করি। পরে, তাঁহার দেহ রাখিবার কিছুদিন পূর্ব্বে, তিনি পার্ষদগণকে বলিলেন "আর কেন, যে কয়েক দিন বা যে কয়েক মুহূর্ত্ত বাঁচিব, এখন গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া ভজন করিব" ও তাহাই করিতে লাগিলেন।

এই তিন মহাত্মার বিবরণ আমরা তাঁহাদের পার্ষদ শ্রীল লক্ষণচন্দ্র রায়ের নিকট শ্রবণ করি। শ্রীভাগবতভূষণের শ্রীগৌরাঙ্গে এতদূর বিশ্বাস হইয়াছিল যে, তিনি বলিতেন যে গৌরমন্ত্র না লইলে কোন ভক্তের মন সিদ্ধ হইবে না, তাহাই বলিয়া, যিনি কৃষ্ণমন্ত্র লইয়াছেন তাঁহাকে তিনি আবার গৌরমন্ত্র দিতেন। *

---

* ভাগবতভূষণের এক রহস্যজনক কীর্ত্তি আমরা শ্রীলক্ষণ রায় মহাশয়ের মুখে শ্রবণ করি। তাঁহারা প্রচার কার্য্যের নিমিত্ত ভ্রমণ করিতে করিতে এক সময় পদ্মার ধারে এক সাক্ত জমিদারের বাড়ী, তাহাকে বৈষ্ণব জানিয়া, অতিথী হইলেন। জমিদারের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, তাহার ভয়ে সকলে কম্পিত হইতেন। বাবুটী ভাগবতভূষণকে প্রণাম করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। ভাগবতভূষণ বসিয়া দেখিলেন একখানা খাড়া রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া জমিদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বৈষ্ণবের বাড়ী খাড়া কেন? তাহাতে জমিদার একটু হাস্য করিয়া বলিলেন, 'ঠাকুর, আমাদের গোড়ামী নাই, আমরা বৈষ্ণব বটে, কিন্তু দুর্গোৎসবও করি, বলিদানও করি! আপনি কি জানেন না, যে দুর্গা, সেই কৃষ্ণ?'

ভাগবতভূষণ অমনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিতেছেন "বেটা পাষণ্ড অস্পৃশ্য পামর! আবার দেখি রসিকতাও আছে। বের হ আমার এখান হইতে, বের হ বের হ।" অতি ক্রোধের সহিত ইহা বলিতে বলিতে

ভাগবতভূষণের মনে পড়িল যে সে বাড়ী ঐ জমিদারের, আর সে যত অপরাধীই হউক, তাহার নিজ বাড়ী হইতে তাহাকে তাড়াইয়া দিবার অধিকার তাঁহার নাই। তখন ঠাকুর উঠিয়া দলবল লইয়া গ্রামের অন্য স্থানে চলিয়া গেলেন।

জমিদার অন্য লোককে ধমকাইয়া থাকেন, নিজে কখন ধমকানী খান নাই, বিশেষতঃ নিজের বাড়ীতে, আরও বিশেষতঃ একজন অতিথি দ্বারা, সুতরাং তিনি একেবারে মরমে মরিয়া গেলেন। একটু পরে গ্রামের মধ্যে ভাগবতভূষণ যেখানে ছিলেন সেখানে যাইয়া জমিদার তাহার চরণে পড়িয়া ক্ষমা মাগিলেন। আর অতি দীনতার সহিত তাহাকে গৃহে আনিবার নিমিত্ত অনুনয় করিতে লাগিলেন। ভাগবত-ভূষণ বলিলেন, "তাই হবে, তবে তোমার এক কার্য্য করিতে হইবে। কল্য প্রাতে একশত ঢাক আনাইবা, আর তুমি সেই খাড়া খানি মস্তকে করিয়া সেই ঢাকের বাদ্যের সহিত নৃত্য করিতে করিতে পদ্মায় যাইবা, যাইয়া মধ্য নদীতে উহা নিক্ষেপ করিবা। ইহা যদি কর তবে আমি তোমার বাড়ী পুনরায় যাইব।' জমিদার তাহাই স্বীকার করিলেন, আর সেই অবধি বাবুটী পরম ভক্ত হইলেন।

প্রথম প্রচারক নিত্যানন্দ। তাঁহার প্রচার পদ্ধতি অতি সুন্দর। তিনি গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে প্রচার করিতে লাগিলেন যে 'ভাই তোমাদের জন্য শ্রীকৃষ্ণ নবদ্বীপে শচীর উদরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অতএব "ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ ইত্যাদি।" ইহার রহস্য পরে বলিব।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রভুর লীলা উদ্দেশ্য।

শচী ও মুরারি গুপ্ত।

সন্ন্যাস করিয়া নিমাই, শান্তিপুরে রহে যাই,
মিলিতে জননী ভক্তগণে।
নদেবাসীগণে ধায়, আগে করি শচী মায়,
শান্তিপুরে মিলে গৌরসনে॥
নিশিতে করে কীর্ত্তন, সঙ্গে নাচে ভক্তগণ,
পিড়ায় বসি শচী হেরে দুঃখে।
শচীর দেখিয়া দুঃখ, মুরারীর ফাটে বুক,
কীর্ত্তন ছাড়ি শচী কাছে থাকে॥
শচী বলে শুন গুপ্ত, যাই কর গিয়া নৃত্য,
এ সুখ ছাড়িবে কেন তুমি।
গৃহ ছাড়ি যায় নিমাই, তুমি নৃত্য কর যাই,
তার মাতা কান্দি বসি আমি॥
যুবা পুত্র দণ্ডধারী, কালি যাবে দেশ ছাড়ি,
মোর পুত্রে তোমরা বাস ভাল।
কালি দেশ ছাড়ি যাবে, বৃক্ষতলে পড়ে রবে,
এলো তোদের নাচিবারে কাল॥

নিমাই তোদের প্রাণের প্রাণ, বলে থাকে ভক্তগণ,
চোখে দেখি যত ভালবাসা।
নিমাই যায় গৃহ ছাড়ি, তারা নাচে ধিং ধিং করি,
আমি ভাবি বিষ্ণুপ্রিয়া দশা॥
দেখ না চাহি মুরারী, নাচে কত ভঙ্গি করি,
কেহবা দিতেছে হুহুঙ্কার।
আনন্দের ত সীমা নাই, সন্ন্যাসী হয়েছে নিমাই,
তোদের ভালবাসায় নমস্কার॥
জিজ্ঞাস ওদের কাছে, কি সুখেতে ওরা নাচে,
একে আমি মরি নিজ দুঃখে।
দুই বাহু তুলে নাচে, পায়েতে নূপুর বাজে,
নৃত্য যেন শেল হানে বুকে॥
ইহা বলি শচী মাতা, উচ্চৈস্বরে কহে কথা,
বলে "তোরা কীর্ত্তনে দে ভঙ্গ।
সকলে মিলে জুটিয়া, মোর খ্যাপা ছেলে নিয়া,
তোদের লাগিয়াছে বড় রঙ্গ॥"
ক্রোধে শচী যেতে চায়, মুরারী ধরিল তাঁয়,
তবে শচী নাম ধরে ডাকে।
"শুন নিতাই অদ্বৈত, শ্রীবাস আর যত ভক্ত,
রাখ কীর্ত্তন মাগি এই ভিক্ষে॥
পুনঃ পুনঃ খায় আছাড়, ভাঙ্গিল বাছার হাড়,
কেমনে হাটিয়া যাবে পথে।
বাছারে ছাড়িয়া দাও, তোমরা নাচ আর গাও,
রাত্রি গেল দাও ঘুমাইতে॥"

বলরাম বলে মাতা, তোমার স্বতন্ত্র কথা,
নিমাই তোমার চিরদিনের ছেলে।
ভক্তগণ বাসে ভাল, ঐশ্বর্য্য তাহে মিশাল,
তোমার প্রেম কাহার কি মিলে॥

প্রভুর যখন জগতের সমস্ত কার্য্য সমাপ্ত হইল, তখন তিনি গম্ভীরায় প্রবেশ করিলেন। জ্ঞানাভিমানী মূঢ় পণ্ডিতগণ প্রভুকে কিরূ দেখিত, না অবশ্য একজন ভক্ত দিবানিশি প্রেমে উন্মাদ, কিন্তু তাঁহার যে কোন বিবেচনা কি বিচার শক্তি আছে, ইহা তাঁহারা বিশ্বাস করিত না। কিন্তু প্রভু যদিও প্রেমে মাতোয়ারা, যদিও তিনি ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাইতেছেন, যদিও তাঁহার বাক্য প্রলাপ পূর্ণ, তবু তাঁহার অন্তরে সম্পূর্ণ চেতনা থাকিত। তাহার কত প্রমাণ দেখ

প্রভু কাজি দমন করিবেন বলিয়া নগরকীর্ত্তনে বাহির হইলেন। নগরে প্রবেশ করিয়া সকলে আনন্দে সে কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। প্রভু আনন্দে বিহ্বল, কিন্তু তবু কাজীর বাড়ীর দিকে যাইতেছেন, এবং যেই কাজির বাটীর নিকট আইলেন অমনি সেই পথ ধরিলেন। তখন দেখা গেল যে তিনি কি জন্য আসিয়াছেন, তাঁহার কি করিতে হইবে, তাহা সমস্তই তাঁহার হৃদয়ে গাঁথা রহিয়াছে। তাহা এক মুহূর্ত্তেও ভুলেন নাই।

প্রভু কেন মনুষ্য সমাজে আইলেন মহান্তগণ তাহার নিগূঢ় কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ভগবানের নিগূঢ় কারণ অনুসন্ধানে আমাদের প্রয়োজন নাই। অবতার হইয়া প্রভু জীবের নিমিত্ত কি করিলেন তাহাই আমাদের আলোচ্য। তাঁহার অবতারের এক কারণ, শ্রীভগবান কি প্রকৃতির জীবকে তাহার পরিচয় করিয়া দেওয়া। দ্বিতীয় কারণ, জীবকে শিক্ষা দেওয়া কিরূপে ভজন সাধন করিতে হয়। তৃতীয়

কারণ, প্রেমধর্ম্ম যাহা পূর্ব্বে জগতে ছিল না, তাহা প্রচার করা। জীবকে যে সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা অর্থাৎ রাধার প্রেম কি, তাহা দেখান তাঁহার শেষ কার্য্য, আর সেই নিমিত্ত তিনি গম্ভীরায় প্রবেশ করিয়া আপনি আচরিয়া উহা জীবকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, দিয়া অন্তর্ধান হইলেন। যখন সন্ন্যাস করিতে গৃহের বাহির হইলেন, তখন এইরূপ দেখাইলেন যেন কেবল বৃন্দাবন গমন করিবেন বলিয়াই ঐ আশ্রম গ্রহণ করেন। যথা চৈতন্যমঙ্গলে :—

নারিব নারিব হেথা রহিবারে আমি।
দেখিবারে যাব আমি বৃন্দাবন ভূমি॥

ভক্তগণকে বলিলেন :—

"যখন সন্ন্যাস লইলাম ছন্ন হইল মন।
কি কাজ সন্ন্যাসে মোর প্রেম প্রয়োজন॥"

তখন স্পষ্টাক্ষরে দেখাইলেন যে তিনি সন্ন্যাস লইয়া অনুতপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু বৃন্দাবন দর্শন একটী উপলক্ষ মাত্র, তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার ভিতরে একটী মহৎ কারণ ছিল। সেটী এই যে, কঠিন জীবের হৃদয় কোমল করা। তিনি কাঙ্গাল না হইলে, জীবে আর হরিনাম লইবে না। এই জন্য কাঙ্গাল হইলেন। কিন্তু এ কথা একবারও মুখে আনেন নাই, মনের কথা মনেই রাখিয়াছিলেন। কিন্তু পরে ভক্তগণ জানিতে পারিলেন, যথা বৃন্দাবন দাসের পদ :—

শুষ্ক হিয়া জীবের দেখিয়া গৌরহরি।
আচণ্ডালে দিলা নাম বিতরি বিতরি॥
অফুরন্ত নাম প্রেম ক্রমে বাড়ি যায়।
কলসে কলসে ছেঁচে তবু না ফুরায়॥
নামে প্রেমে তরি গেল যত জীব ছিল।
পড়ুয়া নাস্তিক আদি পড়িয়া রহিল॥

শাস্ত্র মদে মত্ত হৈয়া নাম না লইল।
অবতার সার তারা স্বীকার না কৈল
দেখিয়া দয়াল প্রভু করেন ক্রন্দন।
তাদের তরাইতে তার হইল মনন॥
সেই হেতু গোরাচাঁদ লইলা সন্ন্যাস।
মরমে মরিয়া রোয়ে বৃন্দাবন দাস॥

প্রভু কৃষ্ণ বিরহে জর জর, বৃন্দাবন দেখিতে যাইবেন ইহা বলিয়া তিনি গৃহ ত্যাগ করিলেন, করিয়া সন্ন্যাস লইলেন। ইহাতে তাঁহার দুটী কার্য্য সুসিদ্ধ হইল। যখন বৃন্দাবন যাইবেন বলিয়া ছুটিলেন তখন দেখাইলেন কৃষ্ণের নিমিত্ত কিরূপ ব্যাকুল হইতে হয়, কি বৃন্দাবনে কিরূপ ব্যাকুল হইয়া যাইতে হয়। আবার সন্ন্যাস লইলেন ধর্ম্ম প্রচারের সুবিধা হবে বলিয়া। হৃদয়ের অভ্যন্তরে ইচ্ছা ছিল যে জীবকে কাঁদাইয়া তাহাদের হৃদয় তরল করিবেন, আর তখন তাহারা হরিনাম লইতে আপত্তি করিবে না। পূর্ব্বে একথা কেহ জানিতে পায় নাই, কিন্তু যাই প্রভু সন্ন্যাস লইলেন, অমনি চতুর্দিকে ক্রন্দনের রব উঠিল আর কঠিন লোকের হৃদয় তরল হইল। তখন সন্ন্যাসের উদ্দেশ্য সকলে বুঝিল। যথা বৃন্দাবন দাসের আর এক পদ ঃ—

নিন্দুক পাষণ্ডগণ প্রেমে না মজিল।
অযাচিত হরিনাম গ্রহণ না কৈল॥

না ডুবিল শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমের বাদলে।
তাদের জীবন যায় দেখিয়া বিফলে॥

তাদের উদ্ধার হেতু প্রভুর সন্ন্যাস।
ছাড়িল যুবতী ভার্য্যা সুখের গৃহবাস॥

বৃদ্ধ জননীর বুকে শোক শেল দিয়া।
পরিলা কৌপিন ডোর শিখা মুড়াইয়া॥
সর্ব্বজীবে সম দয়া দয়াল ঠাকুর।
বঞ্চিত দাস বৃন্দাবন বৈষ্ণব কুকুর॥

হায়! হায়! কি দয়া, এরূপ দয়া অননুভবনীয়। ইহার আর এক পদ শুনুন :—

কান্দয়ে নিন্দুক সব করে হায় হায়;
আবার নদীয়া এলে ধরিব তার পায়।
না জানি মহিমা গুণ বলিয়াছি কত।
লাগাইল পাইলে এবার হব অনুগত॥
দেশে দেশে কত জীব তরাইল শুনি
চরণে ধরিলে দয়া করিবে আপনি॥
না বুঝিয়া কহিয়াছি কত কুবচন;
এইবার পাইলে তার লইব শরণ॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গে যত পারিষদগণ।
তারা সব শুনিয়াছি পতিতপাবন॥
নিন্দুক পাষণ্ড যত দেখিল প্রকাশ।
কান্দিয়া আকুল ভেল বৃন্দাবন দাস॥

আবার :— নিন্দুক পাষণ্ডি আর পণ্ডিত দুর্জ্জন।
মদে মত্ত অধ্যাপক পড়ুয়ারগণ॥
প্রভুর সন্ন্যাস শুনি কান্দিয়া বিকলে।
হায় হায় আমরা কি করিনু সকলে॥
লইল হরির নাম জীব শত শত।
কেবল মোদের হিয়া পাষাণের মত॥

যদি মোরা নাম প্রেম করিতাম গ্রহণ।
না করিত গৌরহরি শিখার মুণ্ডন॥
হায় কেন হেন বুদ্ধি হইল মো সবার।
পতিত পাবনে কেন কৈল অস্বীকার॥
এইবার যদি গোরা নবদ্বীপে আসে।
চরণে ধরিব কহে বৃন্দাবন দাসে॥

প্রকৃতই যখন সন্ন্যাস লইয়া, প্রভু রাঢ় দেশে চারিদিন ভ্রমণ করিয়া, নিতাই কর্ত্তৃক শান্তিপুর আনিত হইলেন, তখন নদীয়া মনুষ্য শূন্য হইল। মুরারীর পদ যথা—

চলিল নদের লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে।
আগে শচী যায় সবে চলিল পশ্চাতে।
হা গৌরাঙ্গ হা গৌরাঙ্গ সবাকার মুখে।
নয়নে গলয়ে ধারা হিয়া ফাটে দুঃখে॥
গৌরাঙ্গ বিহনে ছিল, জিয়ন্তে মরিয়া।
নিতাই বচনে যেন উঠিল বাঁচিয়া॥
হেরিতে গৌরাঙ্গ মুখ মনে অভিলাষ।
শান্তিপুরে ধায় সব হয়ে উর্দ্ধশ্বাস॥
হইল পুরুষ শূন্য নদীয়া নগরী।
সবাকার পাছে চলে দুঃখিয়া মুরারি॥

অতএব পদকর্ত্তা মুরারি এই সঙ্গে ছিলেন। সন্ন্যাস লইয়া অবধি প্রভু ঘোর অচেতন ছিলেন। পাঁচদিনের দিন শান্তিপুর আইলে তখন তাঁহার সহজ জ্ঞান হইল, তখন যেন জানিতে পারিলেন যে তিনি মনের বেগে সন্ন্যাসী হইয়াছেন, হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছেন। জননীর মুখ দেখিয়া প্রভুর হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল, জননী কেন, সকলই যেন মরিয়া

পায়াছেন। তিনি বৃদ্ধ মাতা যুবতী ভার্য্যা ও সংসারের সমুদায় সুখ ত্যাগ করিয়া দুঃখের বোঝা ঘাড়ে করিয়া ঘরের বাহির হইয়াছেন। তাঁহাকে ভক্তগণ শান্ত্বনা করিবেন তাহাই উচিত, কিন্তু তাহা হইল না। তিনিই ভক্তগণকে শান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কাহাকে আলিঙ্গনে, কাহাকে চুম্বনে, কাহাকে মধুর বাক্যে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা সংকল্প করিলেন প্রভুকে ছাড়িবেন না। তাহারা না সকলে একদিকে? তাহার মা না তাহাদের সহায়? যখন প্রভু শান্তিপুর ত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিলেন তখন সমস্ত লোক তাঁহার পথ আগুলিয়া দাঁড়াইয়া, চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। যেমন গোপীগণ মথুরায় যাইবার সময় তাঁহাকে আগুলিয়া কান্দিয়া ছিলেন। কিন্তু প্রভুকে তাঁহার সংকল্প হইতে বিরত করে ইহা মনুষ্যের সাধ্য নয়। প্রভু অবিচলিত চিত্তে চলিলেন।

অদ্বৈত যখন বড় অধীর হইলেন, তখন প্রভু একটু ফাপরে পড়িলেন। কারণ তিনি পুরী ভারতী ও অদ্বৈত এই তিনজনকে পিতার ন্যায় সম্মান করিতেন। শ্রীঅদ্বৈত যখন বড় অধীর হইলেন তখন প্রভু গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিলেন। যথা :—

অদ্বৈত বিলাপে প্রভু হইলা বিকল।
শ্রাবণের ধারা সম চক্ষে ঝরে জল॥
কহেন "অদ্বৈতাচার্য্য এত কেন ভ্রম।
তুমি স্থির করিয়াছ মোর লীলাক্রম॥
নীলাচলে নাহি গেলে পণ্ড হবে লীলা।
বিফল হইবে সব তুমি যা চাহিলা॥
কিরূপেতে হরিনাম হইবে প্রচার।
কিরূপে ভুবনের লোক পাইবে নিস্তার॥

প্রাকৃত লোকের ন্যায় শোক কেন কর ।
সঙ্গে সদা আছি আমি এ বিশ্বাস কর ॥
প্রভু বাক্যে অদ্বৈত পাইলা পরিতোষ ।
জয় গৌরাঙ্গের জয় কহে বাসুঘোষ ॥

বাসু ঘোষ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাহা তাঁহার অন্যান্য পদে জানা যায়। অতএব প্রভু অদ্বৈতকে কি বলিয়া নিরস্ত করিলেন বুঝা যায়। বলিলেন, "তুমি বিষয়ী লোকের মত শোক করিতেছ কেন? জীব কি উদ্ধার হইবে না? তুমি কি এই অবতারটী বিফল করিবে? নীলাচলে না গেলে আমার সব কার্য্য নষ্ট হইবে। তুমিত নিজেই এ খেলা পাতাইয়াছ, আবার তুমিই বাধা দিতেছ! আমাকে ছেড়ে দাও আমি যাই।" পূর্ব্বে বলিয়াছি প্রভু কখন সহজ অবস্থায় স্বীকার করিতেন না যে তিনি অবতার। আবার ইহাও বলিয়াছি যে যখন নিজজনের সঙ্গে থাকিতেন, তখন কখন কখন স্পষ্ট করিয়া আপনার প্রকৃত পরিচয় দিতেন, যেমন উপরে ভক্তগণ সম্মুখে শ্রীঅদ্বৈতকে বলিলেন, নীলাচলে না গেলে তিনি যে জন্য আসিয়াছেন তাহা সফল হইবে না, আর অদ্বৈত তখন সব স্মরণ করিয়া শান্ত হইলেন। বহিরঙ্গ লোকের নিকট প্রভু বলিয়াছিলেন,

কি কাজ সন্ন্যাসে মোর প্রেম প্রয়োজন ।
যখন সন্ন্যাস লইনু ছন্ন হলো মন ॥

আবার নিজজনের নিকট বলিতেছেন যে সন্ন্যাস করার সময় তাহার মতি ছন্ন হয় নাই, তাঁহার সন্ন্যাসের উদ্দেশ্য আর কিছু নয় কেবল জীব উদ্ধার।

প্রভু শান্তিপুর হইতে বৃন্দাবনে না যাইয়া নীলাচলে গমন করিলেন, কেন? বৃন্দাবনে তাঁহার প্রাণ ছুটিয়াছে বলিয়াছেন, সন্ন্যাস করিয়া "কোথা বৃন্দাবন" "কোথা বৃন্দাবন" বলিয়া চারি দিবস কেবল ছুটাছুটী করিলেন। যমুনায় স্নান করিতেছেন ভাবিয়া সুরধুনীতে ঝম্প দিলেন।

আর সেখান হইতে শ্রীঅদ্বৈত তাঁহাকে আপন আলয়ে লইয়া গেলেন। যখন শান্তিপুর ত্যাগ করিলেন, তখন নীলাচলে চলিলেন, আর মুখে বৃন্দাবনের কথাটী নাই, ইহার মানে কি? কথা এই, প্রভু ভক্ত ভাবে বৃন্দাবন ছুটিলেন। কিন্তু ভক্তকে শিক্ষা দেওয়া ব্যতীত প্রভুর আর একটী প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সেটী জীব উদ্ধার করা, তাহা বৃন্দাবনে গমন করিলে হইত না। তাহার বাসের একমাত্র উপযুক্ত স্থান নীলাচল, তাই নীলাচলে চলিলেন ও বৃন্দাবন ভুলিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনে তখন গমন করিলে কোন কোন কার্য্য সফল হইত না, তাহার কারণ বলিতেছি। প্রথমতঃ বৃন্দাবন তখন মনুষ্য শূন্য, দ্বিতীয় আগ্রা অর্থাৎ মুসলমান সম্রাটের বাড়ীর নিকট। সেখানে নিশ্চিন্ত হইয়া জীবোদ্ধার কি তাহাদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা সম্ভাবনা হইত না। তখন ভারতের একটী প্রধান তীর্থস্থান অর্থাৎ নীলাচল, হিন্দুগণের অধীনে ছিল। তাহাই তিনি নীলাচলে চলিলেন। বিশেষতঃ তাহার লীলার সহায় সার্ব্বভৌম ও রামানন্দ রায় এই দুইজনকে প্রয়োজন। সার্ব্বভৌম পণ্ডিতগণের প্রধান। তাহার "দর্পচূর্ণ" করিতে হবে, না করিলে পড়ুয়া পণ্ডিতগণের শ্রদ্ধার পাত্র হবেন না, রামানন্দকে কেন প্রয়োজন, তাহা আপনারা অবগত আছেন।

প্রভু বৃন্দাবন যাইবেন বলিয়া নীলাচল ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালা ঘুরিয়া একবারে গৌড়ে উপস্থিত। সেখান হইতে রূপ সনাতনকে শক্তি সঞ্চার করিয়া নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অতএব বৃন্দাবন যাওয়া একটী উপলক্ষ মাত্র। প্রকৃত উদ্দেশ্য রূপসনাতনকে কার্য্যে প্রবর্ত্ত করা। এইরূপে যদিচ প্রভু সর্ব্বদা বিহ্বল থাকিতেন তবু উদ্দেশ্য সব ঠিক ছিল।

প্রভু কোন পথে নীলাচল গমন করেন তাহা লইয়া গণ্ডগোল ছিল, কারণ লীলা গ্রন্থে যে পথের কথা উল্লেখিত আছে, তাহা এখন পাওয়া

যায় না। ইহার হেতু এই যে, ভাগিরথী পুর্ব্বে যে পথে সাগরে মিশ্রিত হয়েন সে পথ তিনি পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথ অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু বাবু সারদাচরণ মিত্র সেই পথ আবিষ্কার করিয়া গৌর-ভক্তগণের কৃতজ্ঞতার ভাজন হইয়াছেন।* যাহারা এই পথের গতি উত্তমরূপে অবগতি হইতে বাসনা করেন তাহারা সারদাবাবুর গ্রন্থ পাঠ করিবেন। কথা কি, প্রভু যখন রামচন্দ্র খাঁয়ের সাহায্যে নীলাচলে গমন করেন, তখন আর কেহ হইলে সে পথে যাইতে পারিতেন না। যেহেতু সে পথ এক প্রকার সমুদ্র দিয়া। আবার উহা সৈন্য কর্ত্তৃক রক্ষিত ও দস্যু কর্ত্তৃক উৎপীড়িত। রামচন্দ্রের প্রতিজ্ঞা প্রভুকে পাঠাইবেন। তিনিই অধিকারী, তাহার ক্ষমতার সীমা ছিল না। তাই প্রভুকে পাঠাইতে পারিয়াছিলেন। প্রভুর যে এই লীলা খেলা পূর্ব্বে পাতান হয়েছিল তাহার এই এক প্রমাণ, তাহার নীলাচলে গমন। তখন যুদ্ধের নিমিত্ত পথ বন্ধ বলিয়া কাহারো যাইবার সাধ্য ছিল না। কিন্তু প্রভুর ইচ্ছায় স্বয়ং অধিকারী আসিয়া উপস্থিত, যিনি কেবল প্রভুকে পাঠাইতে পারিতেন।

প্রভু মন্দিরের নিকট যাইয়া ভক্তগণকে বলিলেন, হয় তোমরা আগে যাও না হয় আমি যাই। অগ্রে ভক্তগণের মনে মহা ভয় ছিল যে যুদ্ধের নিমিত্ত প্রভু আদৌ নীলাচলে যাইতে পারিবেন না, আবার মন্দিরের নিকট যাইয়া ভাবিতে লাগিলেন শ্রীজগন্নাথের দর্শন কি প্রকারে হইবে,

---

* গোবিন্দের কড়চা যে মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার প্রথম কয়েক পত্র প্রক্ষিপ্ত, কল্পনা দেবীর সৃষ্ট। তাই তাহাতে লেখা আছে যে প্রভু মেদিনীপুর পথে গমন করেন। তাহা যদি হয় তবে আমাদের যতগুলি লীলা গ্রন্থ আছে সমুদয় ফেলিয়া দিতে হয়। গোবিন্দের কড়চা প্রথম কয়েক পত্র যে কল্পিত তাহার রহস্য শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে

যেহেতু তাঁহার দর্শন তখন যাত্রিদিগের পক্ষে বড় কঠিন ছিল। এই পদ দেখুন—

কলহ করিয়া ছলা, আগে প্রভু চলি গেলা,
ভেটিবারে নীলাচল রায়।

কথা কি, ভক্তগণ কথায় কথায় ভুলিতেন যে প্রভু কি বস্তু, তাই তাহারা সর্ব্বদা তাঁহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে ব্যস্ত থাকিতেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ভগবানের সঙ্গ অধিকক্ষণ করা যায় না। শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান, এ কথা সর্ব্বদা মনে থাকিলে ভক্তগণ তাঁহার সঙ্গে থাকিতে পারিতেন না। কিন্তু প্রভু কিরূপে শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিবেন, ও পড়ুয়াগণের স্কন্ধে চড়িয়া, (স্মরণ থাকে প্রভুর এই নিয়ম ছিল যে যখন কোন নূতন স্থানে উদয় হইবেন তখন হরিনামের সহিত হইতেন) হরিনামের সহিত সার্ব্বভৌমের বাড়ী যাইলেন, উহা সমুদায় পূর্ব্বে স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। তাই কলহ ছলা করিয়া অগ্রে গমন করিলেন, ভক্তগণ সঙ্গে গেলে তাহা হইত না।

সার্ব্বভৌমকে কৃপা করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে কয়েক সপ্তাহ নীলাচলে থাকিতে হইল। যে মাত্র সার্ব্বভৌম তাঁহার ভক্ত হইলেন অমনি দক্ষিণে যাইবার ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার সঙ্গিগণ নিত্যানন্দ প্রভৃতিকে বলিলেন "তোমরা দেশে যাও, আমি গোবিন্দকে সঙ্গে করিয়া দক্ষিণে যাইব।" নিত্যানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন যে দক্ষিণে যাওয়ার উদ্দেশ্য কি। প্রভু বলিলেন দাদা বিশ্বরূপকে অন্বেষণ করা। নিত্যানন্দ স্বয়ং প্রভুর সহিত যাইতে চাহিলেন, কিন্তু প্রভু তাঁহাকে লইলেন না। তিনি বলিলেন, শ্রীপাদ আপনি গৌড়দেশে গমন করিয়া জীবকে হরিনাম বিতরণ করুন, আর আমি দক্ষিণ দেশ ঘুরিয়া আসি। প্রভু বিশ্বরূপের তল্লাসে দক্ষিণে চলিলেন, কিন্তু তিনি জানিতেন যে তাহার বহু পূর্ব্বে বিশ্বরূপ অদর্শন হইয়াছেন। প্রকৃত উদ্দেশ্য দক্ষিণ দেশ উদ্ধার করিবেন, বিশ্বরূপের

অনুসন্ধান একথা উপলক্ষ মাত্র। যদি বিশ্বরূপের অনুসন্ধানই উদ্দেশ্য হইত, তবে নিতাইকে সঙ্গে লইতেন।

প্রভু দক্ষিণে নূতন এক মূর্ত্তি ধরিলেন। তিনি জীবের হৃদয় দ্রব করিবেন বলিয়া সন্ন্যাস লইলেন। এত দিন নিজ জনের মধ্যে ছিলেন, কেমন নিজ জন যে তাহারা তাঁহার নিমিত্ত শতবার প্রাণ দিতে পারিতেন। তাহাদের মধ্যে প্রভু কোন কঠোর করিলে তাহারা প্রাণে মরিতেন। এখন একেবারে অপরিচিত লোকের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। তাহারা প্রভুর নামও শুনে নাই, সুতরাং তিনি দুঃখ লইলে নিবারণ করে কি সহানুভূতি করে এমন লোক আর তাঁহার সহিত রহিল না। প্রভু নিশ্চিন্ত হইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে পারিবেন বলিয়া শ্রীনিতাই ও অপর কাহাকে সঙ্গে আনিলেন না। লইলেন গোবিন্দকে যে তাঁহার সম্মুখে মাথা তুলিয়া কথা কহিতে পারে না।

এইরূপ সঙ্গ ও সম্বলহীন হইয়া আলালনাথ ত্যাগ করিলেন। অমনি দুই অজানুলম্বিত বাহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া কৃষ্ণকে ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই শ্লোক আপনি পবিত্র হইতে আবার বলিব। সেটী এই :—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে॥
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষমাং।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহিমাং॥

প্রভু আপনি আচরিয়া ভক্তকে ভক্তিধর্ম্ম শিক্ষা দিতে আসিয়াছেন। তাই দেখাইলেন যে যখন বিপদ সম্ভব তখন শ্রীভগবানের আশ্রয় কিরূপে লইতে হয়। তিনি ডাকিতেছেন, কৃষ্ণ রক্ষমাং কি কৃষ্ণ পাহিমাং, সে এরূপ ঐকান্তিক ভাবে যে, যে শুনিতেছে তাহারি

মনে ইতেছে যে কৃষ্ণ যেন তাঁহার সম্মুখে। আরো সে বুঝিতেছে যে এরূপ প্রাণভরা ডাক উপেক্ষা করিতে কৃষ্ণ কখনও পারিবেন না। বস্তুত প্রভু আপনাকে বিপদসাগরে লইয়া চলিলেন। চিরদিন তিনি অন্য দ্বারা রক্ষিত, যেহতু তিনি প্রেম ও ভক্তিতে বিহ্বল। দিবানিশি শত লোক তাঁহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আসিয়াছে। অদ্য তিনি বিদেশে একা। সে দেশ জানেন না, সেখানকার কাহাকে জানেন না, সে দেশের ভাষা জানেন না। সঙ্গে কপর্দ্দকও নাই। উত্তর পশ্চিম দেশে হিন্দিভাষা অনেকটা সংস্কৃত ও বাঙ্গালার মত, কিন্তু দক্ষিণ দেশের ভাষা আর একরূপ। গোবিন্দ বলেন "কাইমাই কথা"।

তিনি কোথা যাইতেছেন তাহা কেহ জানে না, এমন কি যেন তিনি আপনিই জানেন না। তবে কোথা যাইতেছেন? যেখানে কৃষ্ণ তাঁহাকে লইয়া যাইতেছেন। রাত্রি হইল, একটী বৃক্ষতলে বৃক্ষ হেলান দিয়া বসিয়া গেলেন। প্রভাত হইল আর চলিলেন, কি খাইবেন, আর কোথা আহার পাইবেন, তাহার কোন চিন্তা নাই। এদিকে প্রভু ভাবে মুহুর্মুহু ডাকিতেছেন, "কৃষ্ণ পাহিমাং।" কৃষ্ণ করেন কি, কাজেই আহার যোগাইতে হইতেছে, না যোগাইলে আর কে যোগাইবে? না যোগাইলে গীতায় কৃষ্ণ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তার বিফল হয়। সম্মুখে ব্যাঘ্র পড়িল, প্রভু লক্ষও করিলেন না, কেন? তিনি না ভক্ত? ভক্তভাবে কৃষ্ণ রক্ষমাং বলিয়া আপনার রক্ষার দায় কৃষ্ণের ঘাড়ে চাপাইয়াছেন!

প্রভু পাছে মূর্চ্ছিত হইয়া আছাড় খায়েন ইহার নিমিত্ত নিতাই, অদ্বৈত, নরহরি, সরূপ প্রভৃতি শত শত ভক্ত সর্ব্বদা দুই বাহু পসারিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতেন। এখন তিনি শত সহস্র আছাড় খাইলে

রক্ষা করে এমন মানুষ নাই। প্রভু কূর্ম্মক্ষেত্রে বাসুদেবকে কুষ্ঠরোগ হইতে উদ্ধার করিয়া ও ভক্তি দিয়া গোদাবরী তীরে রাম রায়ের ওখানে গমন করিলেন, সেখানে অদ্ভুত সাধ্যসাধন নির্ণয় রূপ বিচার উঠাইলেন। এ সমুদায় গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে পাইবেন। পরে সেখান হইতে যখন বিদায় হয়েন রামরায় একেবারে অস্থির হইলেন। প্রভু তাহাকে বলিলেন, তুমি অপেক্ষা কর আমি শীঘ্র ফিরিয়া আসিয়া তোমাকে সঙ্গে করিয়া নীলাচলে যাইব। রামরায় গোপনে গোবিন্দের নিকট কিছু বহির্ব্বাস দিলেন। তিনি অতিশয় ধনী, বিস্তর অর্থ দিতে পারিতেন, আর নি[illegible]য় দিতেন, যদি সাহস করিতেন। কিন্তু প্রভু বরাবর সম্বল লইবার বিরোধী। তিনি বলেন কৃষ্ণ পালন করেন, সম্বল কেন লইব? তাই বিনা সম্বলে প্রভু গোবিন্দকে লইয়া দক্ষিণ দেশে চলিলেন।

দক্ষিণে শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য সমাপ্ত করিতে হইবে বলিয়া প্রভু সে দেশে অসীম শক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। একজনকে আলিঙ্গন করিলেন, করিয়া তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি এরূপ শক্তি পাইলেন যে তিনি শক্তি সঞ্চার করিতে লাগিলেন। আবার তিনি যাহাদের শক্তি সঞ্চার করিলেন তাহারাও শক্তিসঞ্চার করিবার শক্তি পাইলেন। এইরূপে প্রভু একজনকে আলিঙ্গন করিয়া দেশকে দেশ ভক্তিতে মজাইতে লাগিলেন। এ কথা বিস্তার করিয়া পূর্ব্বে বলিয়াছি।

প্রভুর দক্ষিণ দেশের লীলা এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে অতি সংক্ষেপে বর্ণিত আছে, এখন উহা বিস্তার করিয়া বর্ণনা করিতেছি। কাজেই ইহাতে মধ্যে মধ্যে এক কথা দুইবার বলিতে হইতেছে, বোধহয় পাঠক সে নিমিত্ত আমাকে ক্ষমা করিবেন। কতক এখানে আর কতক সেখানে পাঠকের এইরূপ আখ্যায়িকা খানিক পড়িতেরসভঙ্গ হইবার সম্ভবনা। তাই ধারাবাহিক লীলা লিখিতেছি, কাজেই নানাস্থানে পুনরুক্তি দোষ হইতেছে।

তৃতীয় অধ্যায়।

দক্ষিণে গমন।

কি করিব কোথা যাবো কি কর্ত্তব্য মোর।
না জানিয়া বসে ছিনু চাই মুখ তোর॥
এক বছর গেল পহুঁ আর বছর এলো।
আশাপথ চেয়ে চেয়ে আঁখি আন্ধা হলো॥
নব অনুরাগ-কালে পানু কিছু সুখ।
সে সব স্মরিয়া এবে বিদরয়ে বুক॥
চূরনী নদীর ধারে কৃষ্ণচূড়া তলে।
বান্ধা ঘাটে বসে ছিনু একলা বিকালে॥
এই ত ফাগুনে তোমা সনে পরিচয়।
ভুলিলাম দেহ গেহ তোমার চিন্তায়॥
কি দেখিনু কি শুনিনু নাহি মনে হয়।
সেই হতে প্রাণ কাড়ি নিলে প্রেমময়॥
পানু নব জন্ম, দেখি সব সুখময়।
রসেতে পূরল চির নীরস হৃদয়॥
একা ছিনু ভব মাঝে না ছিল দোসর।
রসে ডগমগ তনু আনন্দে বিভোর॥
হিয়া আশাশূন্য ছিল, ভুবন আন্ধার।
[illegible] ॥

তোমা কথা শুনি শুনি ভাবিয়া ভাবিয়া।
সুখের তরঙ্গে চলি ভাসিয়া ভাসিয়া ॥
এবে কোথা গেলে, কেন গেলে প্রাণনাথ।
আমারে না নিয়া গেলে করি তোমা সাথ ॥
এখানে থাকিয়া আমি কি কাজ করিব।
হেন শক্তি নাই লীলা আবার লিখিব ॥
বলরামের মনে বিন্ধি আছে এই শেল।
তুমি কি পরম বস্তু জীবে না জানিল ॥

প্রভু দক্ষিণে এরূপ অনেক কঠিন জীব সমূহ পাইলেন যাহাদের উদ্ধার করিতে নূতন নূতন উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। প্রভু পথে যাইতে ত্রিমন্দ নগরে উপস্থিত হইলেন, দেখেন সেখানে শুধু যে অনেক বৌদ্ধ বাস করে তাহা নয়, সেখানকার রাজাও বৌদ্ধ। আমাদের হিন্দুশাস্ত্র মতে বৌদ্ধগণের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করিতে নাই, তাহাদের সহিত কথা কহিতে নাই, মুখ দেখিতে নাই ইত্যাদি। কিন্তু প্রভুর সে মত নয় তাহা আপনারা বুঝিতে পারেন। তাঁহার মত এই যে, যে যত অধিক পতিত, সে তত অধিক কৃপাপাত্র। প্রভু চিরদিন তাহাই শিখাইয়া আসিয়াছেন, কর্ত্তব্যেও করিয়া আসিয়াছেন। বৌদ্ধগণ তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে আইল, ও তাঁহাকে তাহাতে অনিচ্ছুক না দেখিয়া মহা আনন্দের সহিত বিচার আরম্ভ করিল। একটী পদস্থ হিন্দুকে তাহাদের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাহারা অতিশয় আনন্দিত হইল। শেষে রাজা স্বয়ং সেই বিচারে যোগ দিলেন। বৌদ্ধগণের কর্ত্তা রামগিরি। প্রভু সেই নাস্তিকগণের নিকট ভগবানের কথা বলিতে আরম্ভ করিবা মাত্র আপনি পুলকিত হইলেন, ও তাহা দেখিয়া রামগিরির অঙ্গ আনন্দে পুলকাবৃত হইল। অমনি প্রভু বলিলেন, "হে

ভক্তবর! তোমার সহিত কি তর্ক করিব? তুমি পরম কৃপাপাত্র, কারণ দেখিতেছি হরিকথায় তুমি মুগ্ধ হও।" প্রভু বলিলেন:—

হরি বলি পুলকিত হয় যেই জন।
মাথার ঠাকুর সে এইত কথন॥

ইহা শুনিয়া রামগিরি অতিশয় বিচলিত হইলেন।

শুনিয়া প্রভুর কথা রামগিরি রায়।
অমনি আছাড় খাইয়া পড়িল ধরায়॥

প্রভুর চরণ ধরিয়া রামগিরি বলিলেন:—

সর্ব্বজীবে থাক তুমি দেখিছ সকল।
কৃপা করি রাঙ্গা পায় দেহ মোরে স্থল॥

মনে করুন ইঁহারা মহাপণ্ডিত লোক। পাণ্ডিত্যের আশ্রয় লইলে হাদিগকে বিচারে নিরস্ত করা সহজ হইত না, কেবল কচকচি বাধিয়া যাইত। কিন্তু প্রভু সে পথে গমন না করিয়া, ভগবানের মাধুর্য্যরূপ যে মধু তাহার একবিন্দু তাঁহার বদনে দিলেন, আর অমনি রামগিরি ধরা পড়িলেন। যিনি যত বড় নাস্তিক হউন, সকলের হৃদয়েই ভক্তির বীজ আছে। কোনক্রমে উহা একবার জাগরিত করিতে পারিলে তাহাদের নাস্তিকতা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। রামগিরি প্রভুর শ্রীপদে আপনাকে সমর্পণ করিলেন।

পণ্ডিতের শিরোমণি যত বৌদ্ধগণ।
রামগিরি পথে সব করিল গমন॥

গোবিন্দের কড়চায় যে ত্রিমন্দনগরের কথা লেখা আছে, শ্রীচরিতামৃত তাহাকে ত্রিমট বলিতেছেন। বৌদ্ধগণের সহিত প্রভুর বিচার তিনি এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন:—

বৌদ্ধাচার্য্য মহাপণ্ডিত নিজ নবমেতে।
প্রভু আগে উদ্‌গ্রাহ করি লাগিল কান্দিতে॥
যদ্যপি অসম্ভাষ্য বৌদ্ধ অযুক্ত দেখিতে।
তথাপি মিলিল প্রভু তাদের উদ্ধারিতে॥

বৌদ্ধগণের উদ্ধার শুনিয়া ঢুণ্ডিরাম তীর্থ বিচার করিতে যাইলেন। সেই স্থানের নিকট ঢুণ্ডিরামের আশ্রম আছে। এই আশ্রমের যিনি গুরু তিনি ঢুণ্ডিরাম খ্যাতি পাইয়া থাকেন। ঢুণ্ডিরাম এবং অন্যান্য পণ্ডিতগণ সম্বন্ধে চরিতামৃত বলেন :—

তার্কিক মীমাংসক মায়াবাদিগণ।
সাংখ্য পাতঞ্জল স্মৃতি পুরাণ অগণন॥
হারি হারি প্রভু মতে করেন প্রবেশ।
এই মত বৈষ্ণব করিল দক্ষিণ দেশ॥

গোবিন্দ ঢুণ্ডিরাম সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

"অহংকার সদা মত্ত পণ্ডিতাভিমানি।"

সর্ব্ব-শাস্ত্রে পণ্ডিত, কাহাকে ভয় নাই, জীবনের সুখ বিচার করা ও প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজয় করা। এই ইহাদের চরিত্র। প্রভুকে অতি উত্তম একটী শিকার পাইয়াছেন ভাবিয়া "যুদ্ধং দেহি" বলিয়া সম্মুখে বসিলেন, কিন্তু প্রভুর বদনপানে চাহিয়া এরূপ বিচলিত হইলেন যে মুখে বিচার আর আইল না। প্রভুর মুখ আন্ধার, নয়ন করুণায় পূর্ণ, ঢুণ্ডিরাম কান্দিয়া ফেলিলেন, পদে লুটাইয়া পড়িলেন। তখন :—

প্রভু কহে শুন শুন ঢুণ্ডিরাম স্বামী।
তোমার সহিত তর্কে হারিলাম আমি॥
জয়পত্র আমি লিখে দিব সঙ্গোপনে।
হারিল চৈতন্য এবে তোমার সদনে॥

সরস্বতা সম তুমি পণ্ডিত গোসাঞি।
কার সাধ্য তর্কে শাস্ত্রে জেনে তব ঠাঞি॥
ন্যায় সাংখ্য পাতঞ্জল বেদান্ত দর্শন।
সর্ব্ব শাস্ত্রে অধিকারী তুমি গো সুজন॥
মূরখ সন্ন্যাসী মুই কিছু নাই জানি।
বার বার হারি মানিলাম আমি॥
আগেকার ঢুণ্ডি চেয়ে তুমি সুপণ্ডিত,।
তোমার পাণ্ডিত্য আছে ভুবন বিদিত॥

প্রভু করযোড়ে বলিলেন, আমি মূর্খ সন্ন্যাসী আমি তোমায় পারিব না। আপনি আপনার আশ্রমে গমন করুন আমি আপনাকে জয়-পত্র লিখিয়া দিতেছি, কিন্তু—

যাইতে না চাহে ঢুণ্ডি চারিদিকে চায়।

ঢুণ্ডিরাম গেলেন না, কান্দিতে লাগিলেন, পরে প্রভুর চরণে আশ্রয় লইলেন। ঢুণ্ডিরামের ঢুণ্ডিরামত্ব গেল, তাঁহার আশ্রম গেল ও তাহার নাম হইল "হরিদাস"। ঢুণ্ডিরামের উদ্ধারের পূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গ যে যে তীর্থ দর্শন করেন তাহা চরিতামৃত এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

প্রভু গৌতমী গঙ্গায় স্নান করিয়া মল্লিকার্জ্জুন তীর্থ দেখিলেন ও মহেশকে প্রণাম করিলেন; সমুদ্রতীর ত্যাগ করিয়া কিছু দূর পশ্চিমে অহোবলের নৃসিংহ ঠাকুরকে দর্শন করিলেন, সেখান হইতে সিদ্ধিবট গেলেন। সেখানে পরম ভক্ত এক বিপ্র দিবানিশি রামনাম জপিতেন, তাহার ঘরে প্রভু ভিক্ষা করিলেন, করিয়া পরে সকলে দর্শনে গমন করিলেন। সেখান হইতে সিদ্ধিবটে ফিরিয়া সেই ব্রাহ্মণ বাড়ী আবার আগমন করিলেন, দেখেন যে সেই ব্রাহ্মণ রামনাম ছাড়িয়া কেবল কৃষ্ণনাম জপিতেছেন। প্রভু ইহাতে হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করি-

লেন; ব্যাপার কি? রামনাম ত্যাগ করিয়া এখন কৃষ্ণনাম ধরিয়াছ তাহাতে ঃ—

বিপ্র কহে এই তোমার দর্শন প্রভাবে।

প্রভুর দক্ষিণে যে সমুদায় অদ্ভুত কাণ্ড করেন তাহা বর্ণনা করিবার অগ্রে, তিনি কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া দক্ষিণ দেশ উদ্ধার করেন তাহার কিছু আভাস দিতে হইতেছে। প্রভু রাধার ঋণ শোধ দিতে, অর্থাৎ জীবকে ভক্তিপথে লইতে আসিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার শুধু নদিয়া কি শ্রীক্ষেত্র, কি বৃন্দাবন লইয়া থাকিলে চলিবে না। তাঁহার সমস্ত ভারতবর্ষ উদ্ধার করিতে হইবে। তাই দক্ষিণাভিমুখে দৌড়িলেন, সময় অল্প, অতএব শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য সমাধা করিতে হইবে। সুতরাং মাঝে মাঝে তাঁহার ঐশ্বরিক শক্তি অবলম্বন করিতে হইতেছিল। যথা একজনকে শক্তি সঞ্চার করিয়া তাহারই দ্বারা বহু জনকে উদ্ধার করা।

ঐশ্বরিক শক্তি ছাড়া অনেক স্থানে প্রভু অন্য উপায় অবলম্বন করিতেন। যথা তর্কে পরাজয় করিয়া। তবে তাঁহার তর্কে এই গুণ ছিল যে, তাঁহার প্রতিপক্ষ পরাজিত হইয়া অপমানিত বোধ না করিয়া কৃতজ্ঞ হইয়া অনুগত হইত। কাহাকে আপনার দৈন্যে, কাহাকে আপনার ঔদার্য্যে, কাহাকে আপনার মধুর চরিত্রে বশীভূত করিতেন, কাহাকে বা দুই একটী স্নেহবাক্য বলিয়া উদ্ধার করিতেন।

কিন্তু তাঁহার সকল অপেক্ষা আর একটী অতি বলবান যন্ত্র ছিল, যাহা দ্বারা তিনি জীবকে মোহিত করিতেন, অর্থাৎ তাঁহার "জীবে দয়া" ও "ভগবানে প্রেম" দেখাইয়া।

তাঁহার ঔদার্য্যের কথা কি বলিব। তিনি এক গালে চপটাঘাত খাইয়া অন্য গাল ফিরাইয়া দিতেন না। সে তাঁহার পক্ষে সামান্য কথা। এমত ব্যবহার করিলে তিনি সেই ব্যক্তিকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গন করিতেন।

তিনি পরের দুঃখ দেখিলে কান্দিয়া উঠিতেন। তাঁহার আপনার জয়-পরাজয় বোধ ছিল না। সর্ব্বদাই আপনাকে ক্ষুদ্র করিয়া অন্যকে মান দিতেন। যে যত অপরাধী, তাহাকে তিনি তত কৃপা করিতেন; এই যে সমুদায় বলিলাম ইহা যে অত্যুক্তি নয় তাহা তাঁহার কার্য্য দেখিলে আপনারা স্বীকার করিবেন।

প্রভু দক্ষিণে যে কাণ্ড আরম্ভ করিলেন তাহা স্মরণ করিলে পাষাণ গলিয়া যায়। প্রভু মনুষ্যের দেহ ধারণ করিয়াছেন, সুতরাং সে দেহ স্বভাবের নিয়মের অধীন। উপবাসে ও অনিদ্রায় দেহ ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হয়, অধিক পথশ্রমেও কষ্ট হয়। প্রভুর এ সমুদায় হইতেছে, তাহাতে হইয়াছে কিনা সেই প্রকাণ্ড দেহ অস্থিচর্ম্মবিশিষ্ট হইয়াছে, যেন চলিতে পারেন না, চলিতে অতি কষ্ট হয়। মুখে শ্মশ্রু হইয়াছে, মস্তকে জটা হইয়াছে। সোনার অঙ্গ সর্ব্বদা ধূলায় ধূসরিত। প্রভু সিদ্ধি বটেশ্বর গিয়াছেন, যাইয়া সেখানকার শিবকে প্রণাম করিলেন। সে রাত্রি আর আহার জুটিল না। গোবিন্দ প্রাতে ভিক্ষা করিতে বাহির হইলেন, যাহা পাইলেন লইয়া আসিলেন, পরে প্রভু স্বয়ং রন্ধন করিলেন, সেবা করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। যেন কাহাকে অপেক্ষা করিতেছেন।

পাঠককে বলিয়া রাখি প্রভুর এরূপ অবস্থায় সচরাচর পড়িতে হইত না। কারণ যখন যেখানে যাইতেন সেখানে অমনি লোকের কলরব ও হরিধ্বনি হইত, এবং প্রভুর ভিক্ষার সামগ্রী ও রাশি রাশি বস্ত্র প্রভৃতি দানের সামগ্রী আসিয়া উপস্থিত হইত। কিন্তু এখানে একটী লীলা করিবেন মনে আছে তাই চুপে চুপে আইলেন, সামান্য অবস্থায় রহিলেন। ঠিক যেন একটী সামান্য সন্ন্যাসী।

সেখানে তীর্থরাম আইলেন। তিনি সওদাগর, অভক্ত, নব ধনবান। সেই সামান্য নবীন সন্ন্যাসীকে দেখিয়া তাঁহার একটু আমোদ করিবার

ইচ্ছা হইল। একে যৌবনমদে মত্ত, তাহে ধনমদে মত্ত, আবার চরি অতি মন্দ, সুতরাং মন্দ কার্য্যেই আনন্দ। তাঁহার ইচ্ছা হইল যে নবাগ নবীন সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নষ্ট করিবেন। আর সেই অভিপ্রায়ে দুইটী বে আনিয়া উপস্থিত করিলেন, একজনের নাম সত্যবাই, আর একজনে নাম লক্ষ্মীবাই।

সত্যবাই লক্ষ্মীবাই নামে বেশ্যাদ্বয়।
প্রভুর নিকটে আসি কত কথা কয়॥

তীর্থরাম বেশ্যাদিগের কি কি করিতে হইবে, তাহা তাহাদিগে শিখাইয়া আনিয়াছেন। আর সেখানে যাহারা ছিলেন তাহাদিগকে বলিতেছেন যে, মজা দেখ, সন্ন্যাসীর যত ভারিভুরি সব এখানে বাহি হইবে। এখন বেশ্যাগণের কাণ্ড শুনুন ঃ—

কত রঙ্গ করে লক্ষ্মী সত্যবাই হাসে।
সত্যবাই হাসি মুখে বসে প্রভু পাশে॥

প্রভু চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, কিছুই বলিতেছেন না। তাহাে সত্য একটু বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিল। যেন অন্য মনস্ক হইয়া সে অঙ্গের আবরণ ফেলিয়া দিল। ঐরূপ নির্লজ্জ ব্যবহার করিলে প্রভু তখন তাহার দিকে চাহিলেন। সে চাহনীতে সত্যবাই বিচলিত হইল, দেখিল যে প্রভুর চক্ষু দিয়া কারুণ্যরস ও দয়া চোয়াইয়া পড়িতেছে। সেরূপ দৃষ্টি তাহারা আর কখন দেখে নাই, সে অতি পবিত্র। দেখিয়া বুঝিল যে ইঁহার বিকার নাই, যেন ইঁনি মনুষ্য নহেন—দেবতা। প্রভু তাহার দিকে চাহিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন "কি মা, তুমি কি চাও?" প্রভুর সেই দৃষ্টির পর যখন তিনি সত্যবাইকে "মা" বলিয়া ডাকিলেন, তখন বেশ্যার হৃদয় হইতে রঙ্গরস দূরে পলাইল। সে কাঁপিতে

লাগিল। লক্ষ্মীও বড় ভয় পাইল, তাহা তাহার মুখ দেখিয়া বুঝা গেল। তাহারা উভয়ে প্রভুর মুখ দেখিয়া বেশ বুঝিয়াছে যে ঃ—

কিছুই বিকার নাই প্রভুর মনেতে।

আর কি কি দেখিল তাহা তাহারা জানে। তখন সত্যবাই, যে লক্ষ্মী অপেক্ষা অধিক অপরাধী, সে কি করিল শ্রবণ করুন ঃ—

সত্যবাই একেবারে চরণে পড়িল।

তখন প্রভু যেন তটস্থ হইয়া, "আমি তোমার পুত্র, তুমি আমার মা, অতএব আমার চরণে পড়িয়া,

"কেন অপরাধী কর আমারে জননী!"

প্রভু আর বলিতে পারিলেন না, উপরের কথাগুলি বলিয়াই "পড়িলা ধরণী"

খসিল জটার ভার ধুলায় ধূসর।
অনুরাগে থর থর কাঁপে কলেবর॥
সব এলো থেলো হলো প্রভুর আমার।
কোথা লক্ষ্মী কোথা সত্য নাহি দেখে আর॥
নাচিতে লাগিল প্রভু বলি হরি হরি।
রোমাঞ্চিত কলেবর অশ্রু দরদরি॥
হরিনামে মত্ত হয়ে নাচে গোরা রায়।
অঙ্গ হতে অদ্‌ভুত গন্ধ বাহিরায়॥

তীর্থরাম সব দেখিতেছেন। প্রথমে সত্যকে যখন প্রভু মা বলিয়া সম্বোধন করিলেন, তখন প্রভুর মুখ দেখিয়া মদমত্ত যুবকের প্রাণ ভয়ে উড়িয়া গিয়াছে। সন্ন্যাসীকে লোকে সচরাচর ভয় করে, সেকালে আরো করিত। তীর্থরামের তখন বেশ বোধ হইয়াছে যে সন্ন্যাসীত ভণ্ড নয়, বরং বড় ক্ষমতাশালী, তাই ভয় পাইয়া সহজ যে উপায়, তাহা অবলম্বন করিলেন,

অর্থাৎ কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভুর চরণতলে পড়িয়া আশ্রয় লইলেন। প্রভু কি করিলেন? প্রভু একেবারে অচেতন। তীর্থ যে চরণে পড়িলেন তাহা তাহার গোচর হইল না, তাই ধনবান যুবক প্রভুর চরণে দলিত হইতে লাগিলেন। যদিও প্রভু তীর্থরামকে লক্ষ্য করিলেন না, কিন্তু সত্যের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি রহিয়াছে। সেই অচেতন অবস্থায় প্রভু সত্যকে উঠাইলেন।

সত্যেরে বাহুতে ছাঁদি বলে হরি হরি।

তাহাকে বাহুতে ছাঁদিয়া বলিতেছেন "কৃষ্ণ বল, মুকুন্দ মুরারিকে ডাকো।"

হরিনাম মন্ত্র প্রভু নাই বাহ্যজ্ঞান।
ঘাড়ি ভাঙ্গি পড়িতেছেন আকুল পরাণ॥
গিয়াছে কৌপিন খসি কোথা বহির্ব্বাস।
উলঙ্গ হইয়া নাচে ঘন ঘন শ্বাস॥
মুখে লালা অঙ্গে ধুলা নাইক বসন।
কণ্টকিত কলেবর মুদিত নয়ন॥
আছাড়িয়া পড়ে, নাই মানে কাঁটা খোঁচা।
ছিঁড়ে গেল কণ্ঠ হতে মালিকার গোচা॥
পিচকারি সম অশ্রু বহিতে লাগিল।

তখন ষড়যন্ত্রকারী তিনজনে, অর্থাৎ তীর্থ ও বেশ্যাদ্বয় [illegible] হইয়াছে। তীর্থরামের অবস্থা দেখিয়া তখন অতি কঠিন যে তাহারও [illegible] হইবার কথা। যাহারা সেখানে ছিলেন তাহারা তীর্থরামের কার্য্যকে ঘৃণা করিয়া তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ ছিলেন, সেইজন্যে যখন অচেতন প্রভুর পদাঘাতে তাহার দেহ চূর্ণ হইতে লাগিল, তখন তাহারা ভাবিতে লাগিল বেশ হইয়াছে। কিন্তু সে ভাব আর তাহাদের রহিল না। তীর্থরামের

কাতরোক্তি শুনিয়া ও তাহার ভাব দেখিয়া তাহার প্রতি তাহাদের দয়া হইল। তাহার বিশেষ কারণ এই যে, তীর্থরাম অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া আপনাকে আপনি ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

এদিকে প্রভুর ভাব শুন। প্রভু একটু পরে চৈতন্য পাইলেন, চৈতন্য পাইবা মাত্র তীর্থরামকে অতি প্রেমে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন! পূর্ব্বে বলিয়াছি প্রভু এক গালে মার খাইলে আর এক গাল ফিরাইয়া দেওয়া অপেক্ষা অধিক করিতেন, তাহার নিদর্শন উপরে দেখুন। তীর্থরামকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলে, তিনি ভয় পাইয়া বলিলেন, "প্রভু করেন কি, আমি অপবিত্র অস্পৃশ্য, আমাকে স্পর্শ করিলেন!" প্রভু উত্তরে বলিলেন :—

"পবিত্র হইনু আমি পরশি তোমারে।"

তীর্থরামের ঐশ্বর্য্যে সর্ব্বনাশ ঘটিতেছিল। কারণ স্বভাবতঃ তিনি ভক্তিমান ব্যক্তি, অন্তর্যামী প্রভু তাই তাহাকে কৃপা করিবেন বলিয়া মনে মনে সাব্যস্ত করিয়া রাখেন। কৃপা করিবেন বলিয়া এত ভঙ্গী উঠাইলেন। পরে প্রভু তীর্থরামকে কিছু উপদেশ দিলেন। তীর্থরামের একেবারে বিষয়ে বিরক্তি হইল। সেখানে উপস্থিত ব্যক্তিগণ বলিতে লাগিলেন, তীর্থরাম এতদিনে আটকা পড়িলেন।

তীর্থরাম তখনি বিষয় ছাড়িলেন। তিনি উদাসীনের পথ অবলম্বন করিতেছেন এই কথা শুনিয়া তাহার অতি সুন্দরী ভার্য্যা কমলকুমারী ছুটিয়া আইলেন, আসিয়া পতির চরণে পড়িয়া বলিতেছেন, "বাড়ী চল, আমাকে ত্যাগ করিও না।"

কমলে বলিলা তীর্থ কর ধরি করে।
বিষয় সম্পত্তি সব দিলাম তোমারে॥

নরক হইতে ত্রাণ পাইয়াছি আমি।
বিষয় বৈভব সব ভোগ কর তুমি॥

তীর্থরাম আর মুগ্ধ হইলেন না। তীর্থ সেই হইতে পথের ভিখারী হইলেন। তাহার পরে আহারীয় দ্রব্যের সহিত ঃ—

কত লোকে কত বস্ত্র আনি জুটাইল।
কিন্তু এক খণ্ড প্রভু হাতে না ছুইল॥

সেখান হইতে প্রভু নন্দীশ্বর চলিলেন। যাইতে মধ্যে বিশাল জঙ্গল, সে বন দশ ক্রোশ ব্যাপিয়া। বনে প্রবেশ করিয়াই গোবিন্দের বড় ভয় হইল। অন্তর্যামী প্রভু তাহা জানিলেন, তখন ঈষৎ হাসিয়া অগ্রে অগ্রে চলিলেন, গোবিন্দ পশ্চাৎ পশ্চাৎ সুড়ি পথ দিয়া চলিলেন। জঙ্গল পার হইয়া সম্মুখে মুন্না নগর পাইলেন, নগরে প্রবেশ না করিয়া উহার নিকটে একটী বৃক্ষতলে যেন বিশ্রামের নিমিত্ত বসিলেন। তাঁহারা দুজনে চুপ করিয়া বসিয়া যেন বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। দুটী নগরবাসী আইলেন, তাহারা প্রভুকে দেখিয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। তখন সন্ধ্যা হইতেছে। কিরূপে কে জানে ইহার মধ্যে নগরে ধ্বনি হইয়াছে যে এক সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, তাঁহার অঙ্গের তেজ আগুনের ন্যায়। শেষে নগরবাসী পালে পালে আসিতে লাগিল, যে আইল সেই ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতে লাগিল, আর প্রভুকে ছাড়িয়া গেল না।

প্রভু কিন্তু একেবারে নীরব। এত লোক যে একত্র হইয়া সম্মুখে দাড়াইয়া আছে, তাহা তিনি একেবারে লক্ষ্য করিলেন না। সকলে তখন বিনয় করিয়া বলিতে লাগিল, স্বামী নগরে চলুন। কিন্তু ঃ—

প্রেমে মত্ত মোর প্রভু শুনে নাহি কথা।

এই যে সে স্থান লোকারণ্য হইল, প্রভু কি কোন চর পাঠাইয়া

তাহাদিগকে ডাকাইয়া ছিলেন ? ডাকাইলেই বা তাহারা আসিবে কেন ? লোক আইল কেন, না প্রভুর অনিবার্য্য আকর্ষণে। ক্রমে যখন কলরব অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল, তখন প্রভু আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না :—

অমনি উঠিয়া প্রভু নাচিতে লাগিল।

তখন সেই সমুদায় লোক সেই সঙ্গে করতালি দিয়া যোগ দিল। সেই বৃক্ষতলা যেন শ্রীবাসের আঙ্গিনা হইল। এইরূপে সমস্ত রজনী গেল। এই সমস্ত লোকে সমস্ত নিশি আনন্দে প্রভুর সঙ্গে নৃত্য করিয়া কাটাইল। প্রভাত দেখিয়া প্রভু গোবিন্দকে ইঙ্গিত করিয়া চলিলেন, আর গোবিন্দ মাথায় দুখানি খড়ম বান্ধিলেন, আর দুটা খড়ি স্কন্ধে ঝুলাইলেন, করোয়া হস্তে লইলেন এবং প্রভুর সঙ্গে যাইতে লাগিলেন। সেই সকল লোক তখন প্রভুকে থাকিতে মহা জিদ করিতে লাগিল, কিন্তু :—

প্রভু মোর কোন উপরোধ না শুনিল।

সেই সময় একজন ভিখারী রমণী প্রভুর নিকট কান্দিয়া ভিক্ষা মাগিল। ভক্তি ভিক্ষা নয়, অন্ন বস্ত্রের ভিক্ষা, যাহা প্রভুর দিবার শক্তি নাই। দরিদ্র রমণীর অবস্থা মন্দ। পরিধান জীর্ণবাস, আর অনাহারে দেহ শীর্ণ, কিন্তু দারিদ্র্যের নিমিত্ত এরূপ জ্ঞানশূন্য স্বার্থপর নীচ হইয়াছে যে, যদিও দেখিতেছে যে প্রভু একজন কাঙ্গাল সন্ন্যাসী, তাঁহার দিবার কিছু নাই, তবু হাত পাতিতে ছাড়িল না। আমরা হইলে তাহাকে দূর দূর করিতাম, কিন্তু প্রভু আমার তাহা করিলেন না। তাঁহার দয়া হইল, কিন্তু আপনার ত কপর্দ্দক মাত্র নাই, দিবেন কি। তাই প্রভু ঈষৎ হাসিয়া মন্থারবাসিগণের নিকট ভিক্ষা মাগিলেন, ইহাতে :—

মুন্থাবাসী নরনারী আনন্দে ভাসিয়া।
রাশি রাশি অন্ন বস্ত্র দিলেক আনিয়া॥

সবে বলে পথের সম্বল তরে চায়।
সে কারণে রাশি রাশি আনিয়া যোগায়॥
সকলে ব্যাকুল বস্ত্র প্রভু হস্তে দিতে।
গণ্ডগোল দেখি প্রভু লাগিল হাসিতে॥

সকলে প্রভুকে তাহার দ্রব্য লইতে আগ্রহ করিতেছে, কেহ কেহ বলিতেছে, "আমার এই বস্ত্রের অনেক মূল্য ইহা আগে গ্রহণ কর।" প্রভু বলিলেন, "আমি তোমাদের ভিক্ষা গ্রহণ করিলাম, কিন্তু আমি সন্ন্যাসী আমার ত কাপড় পরিতে নাই, আর একমুষ্টি অন্ন পাইলে আমার যথেষ্ট। তোমরা যাহা দিলে এত অন্ন আমি লইয়া যাইব কিরূপে? এক কাজ কর, আমি ভিক্ষা লইলাম, আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি ভগবান্ তোমাদের ভাল করিবেন, তোমরা এই সমুদায় অন্ন বস্ত্র এই দুঃখিনীকে দাও।" তাহারা তাহাই করিল, আর আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল। তখন প্রভু দ্রুত চলিলেন, বহুতর লোক সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে ফিরাইবার নিমিত্ত চলিল, কিন্তু প্রভু কাহার কথা শুনিলেন না। পর দিন দুই প্রহরে বেঙ্কটনগরে পৌছিলেন।

পূর্ব্ব দিন উপবাসে গিয়াছে, রজনীতে আহার নিদ্রা কিছুই হয় নাই, পর দিবস দুই প্রহর পর্য্যন্ত হাটিলেন, কাজেই প্রভুর প্রকাণ্ড দেহ এইরূপে কঠোর জীবনযাপনে দুর্ব্বল হইতেছে। বেঙ্কট নগরে প্রভু তিন দিবস থাকিলেন। সেই নগরে অতি বড় একজন বেদান্ত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি "যুদ্ধং দেহি" বলিয়া প্রভুকে আক্রমণ করিলেন। প্রভু বলিলেন, আমি হারিলাম, তুমি খুব বড় পণ্ডিত। কিন্তু পণ্ডিত ছাড়েন না। তখন প্রভু তাহার সহিত ব্যঙ্গ করিতে লাগিলেন, তাহার তত্ত্বগুলি যে সারহীন ইহা সেই ব্যঙ্গতে বুঝা যাইতে লাগিল। প্রভু রহস্য করিতেছেন, আবার হাস্যও করিতেছেন। যদিও প্রভু ব্যঙ্গ

ছলে কথা বলিতে লাগিলেন, কিন্তু পণ্ডিত তাহাতেই নিরুত্তর হইতে লাগিলেন। শেষে এই পণ্ডিত,—ইনি সন্ন্যাসী, নাম রামানন্দ স্বামী,—প্রভুকে আত্মসমর্পণ করিয়া দীক্ষিত হইলেন। তিনি ও তাঁহার সকল শিষ্য হরিনাম লইলেন, কাজেই—

মাতিল নগর পল্লি বালক বালিকা।
কত লোক আসে যায় কে করে তালিকা॥

শ্রীচরিতামৃত সংক্ষেপে বলিতেছেন :—

মহাপ্রভু চলি আইল ত্রিপদী ত্রিমল্লে।
চতুর্ভূজ বিষ্ণু দেখি বেংকটায়ে চলে॥
ত্রিপদী আসিয়া কৈল শ্রীরাম দর্শন।
রঘুনাথ আগে কৈল প্রণাম স্তবন॥
স্বপ্রভাবে লোক সবে করিয়া বিনয়।
পানা নৃসিংহে আইল প্রভু দয়াময়॥

পানা নৃসিংহে আসিবার পূর্ব্বে প্রভু কতকগুলি অতি মধুর লীলা করেন তাহা এখন বলিব। বৌদ্ধগণের উদ্ধার সম্বন্ধে একটী কাহিনী আছে, সেটা আমরা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। কাহিনী এই যে বৌদ্ধগণ বিচারে পরাস্ত হইলে, তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া প্রভুকে পতিত করিবার ও কষ্ট দিবার নিমিত্ত একটী ষড়যন্ত্র করিল। তাহারা এক খানি অপবিত্র অন্নপূর্ণ থালি আনিয়া প্রভুকে বলিল, ইহা বিষ্ণুর প্রসাদ গ্রহণ করুন। প্রসাদ লইতে প্রভু হাত পাতিলেন, কিন্তু সেই সময় একটী পক্ষী আসিয়া ঠোটে করিয়া ঐ থালি লইয়া উড়িল, পরে উহা এরূপ ভাবে ত্যাগ করিল যে, উহা তেরছ হইয়া বৌদ্ধগণের যে আচার্য্য তাহার মাথায় পড়িল, তাহাতে তাহার মাথা কাটিয়া গেল ও আচার্য্য মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। তখন বৌদ্ধগণ প্রভুর শরণ লইল।

প্রভু বলিলেন তোমরা কীর্ত্তন কর, তবে উনি বাঁচিবেন। এইরূপে সকলে বৈষ্ণব হইল।

আমরা এ কাহিনী বিশ্বাস করি না। গোবিন্দ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনিও এ লীলা উল্লেখ করেন নাই, বিশেষতঃ প্রভুর লীলায় এরূপ অলৌকিক ঘটনা পাইবেন না। শুনিলেই বুঝা যায় এরূপ দৈব-বলের সহায়তা গ্রহণ করা প্রভুর লীলার অনুমোদিত নয়। বিশেষতঃ এ অবতারে দণ্ড নাই, দৈব বল প্রয়োগ নাই, ভয় প্রদর্শন নাই। গোবিন্দের কড়চায় দেখিতে পাই যে বৌদ্ধগণ প্রভুর সহিত বিচার প্রার্থনা করে, প্রভু কোন কথা না বলিয়া কেবল "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া তাহাকে ডাকিতে লাগিলেন, পরে ভাবে উন্মত্ত হইলেন। বৌদ্ধগণ সেই তরঙ্গে পড়িয়া গেল এবং প্রভুর চরণে আশ্রয় লইল। তাহাদের সেই মুহূর্ত্তের বৈষ্ণবতা দেখিয়া প্রভু পুলকিত হইলেন ও তাহাদিগকে আশ্রয় দিলেন। "পক্ষী চঞ্চুচ্যুং ভাণ্ডে মস্তক ভঙ্গ হওয়ায় বৌদ্ধগণ বশীভূত হইলেন," ইহা অপেক্ষা প্রভু তাহাদিগের হৃদয় বিগলিত করিয়া ভক্তিদান করিলেন, এরূপ প্রথা প্রভুর যে অনুমোদনীয় তাহা সকলে স্বীকার করিবেন। প্রভু তিন দিবস বেংকট নগরে ছিলেন থাকিয়া নগরবাসিগণকে হরি নামে উন্মত্ত করিলেন।

সেই সময় শুনিলেন যে নিকটে বগুলার বন আছে, সেখানে দস্যু পন্থ ভীল বাস করে। সে পথিক পাইলে তাহাকে সর্ব্বশান্ত এবং কখন কখন বধ করে। প্রভু শুনিবা মাত্র সেখানে চলিলেন। তখন নগরের প্রধান লোক সকল প্রভুকে নিষেধ করিতে লাগিলেন। তাহারা বলিলেন যে সে পাপাচারী ভীল অজ্ঞান, আপনার মহিমা কিছু বুঝিবে না, আপনার অনিষ্ট করিলে পারে। আপনার সেখানে যাওয়া বিবেচনাসিদ্ধ নয়। প্রভু তাহাদের নিষেধ শুনিলেন না, সেই বন পানে

চলিলেন। গোবিন্দ করেন কি, ভয়ে ভয়ে, তাহার যে সম্পত্তি বহির্বাস কৌপীন করোয়া ও খড়ম, ইহা লইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। প্রভু সেখানে তিন রাত্রি বাস করিলেন। ভীলপতির সঙ্গে মিষ্টালাপ আরম্ভ করিলেন। বলিতেছেন, তুমিই প্রকৃত সাধু। সাধুগণ বনে থাকেন তুমিও বনে থাক। সাধুগণের সংসারে পুত্র কন্যা নাই তোমারও তাহা নাই, অতএব তুমিই সাধু, তোমার দর্শনে পাপক্ষয় হয়।

ভীল প্রভুর কথা শুনিল, প্রভুর কথার ভঙ্গি বুঝিল ও ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিল। প্রভু তখন কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। পন্থ ভীলের ভক্তি উথলিয়া উঠিল, সেও সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য আরম্ভ করিল, শেষে সমুদায় দস্যুগণ সেই নৃত্যে যোগ দিল।

সেই দিন হইতে পন্থ পরিল কৌপীন।
হইল সাধুর শ্রেষ্ঠ জ্ঞানেতে প্রবীণ॥

* * * *

লইতে হরির নাম অশ্রু পড়ে আসি॥
হরি নামে মত্ত হয়ে যত দস্যুগণ।
সেই বন করিলেক আনন্দ কানন॥

দস্যু দমনের এই এক নূতন পদ্ধতি। ফল কথা প্রভু চিরদিন এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াই জীবকে সুপথে লইয়া গিয়াছেন। "পক্ষী থালি লইয়া বৌদ্ধাচার্য্যের মাথা ভাঙ্গিয়া দিল।" এরূপ ভাবে দুষ্ট দমন তাঁহার অনুমোদিত নয়। যখন মাধাই নিত্যানন্দকে প্রহার করে, তখন পাছে প্রভু ক্রোধ করিয়া মাধাইকে শারীরিক দণ্ড করেন, সেই ভয়ে নিতাই বলিয়াছিলেন, "প্রভু, যে অপরাধ করে তাহাকে যদি দণ্ড দিবা তবে কৃপা কাহারে করিবে? প্রভু, আমি তোমায় স্মরণ করাইয়া দিই যে এ অবতারে তোমার দণ্ড করিবার অধিকার নাই তুমি না বারবার বলিয়াছ যে এ অবতারে দণ্ড দিবা না কেবল কৃপা করিবা।"

গোবিন্দ দাস, (যাহাকে নিঠুর অর্থ পিপাসী লোকে কামার, হাতা বেড়ী গড়ে বলিয়া পরিচয় দিয়াছে), তাহার কড়চায় কোথায়ও বড় একটু বিস্তার বর্ণনা নাই, কেবল প্রধান ঘটনাগুলি বলিয়া গিয়াছেন মাত্র। কিন্তু প্রভু কি ভাবে দক্ষিণে ভ্রমণ করেন তাহার সেই বর্ণনাটী, যাহা তাহার চাক্ষুষ দেখা ও অতি উপাদেয় বলিয়া, এখানে উদ্ধৃত করিলাম। যথা—

পন্থভীলে এইরূপে পবিত্র করিয়া।
চলে মোর ধর্ম্মবীর আনন্দে ভাসিয়া॥
অনাহারে শীর্ণ দেহ চলিতে না পারে।
তবু প্রভু হরি নাম দেন ঘরে ঘরে॥
সে দেশের লোক সব করে কাইমাই।
তথাপি বিলান নাম চৈতন্য গোঁসাই॥
কোন অভিলাস নাই আমার প্রভুর।
যখন যেখানে যান সামগ্রী প্রচুর॥
যেই জন প্রভুরে দেখয়ে একবার।
ছাড়িয়া যাবার শক্তি না হয় তাহার॥
এমনি প্রভুর শক্তি কি কহিব আর।
ভক্তি সাগরের বাঁধ কাটিল আবার॥
উথলিয়া ভক্তিসিন্ধু ডুবাইল দেশ।
কেহ বা সন্ন্যাসী কেহ হইল দরবেশ॥
বিরক্ত বৈষ্ণব কেহ কৈলা সেইখানে।
আউল বাউল হয়ে নাচিছে প্রাঙ্গনে॥
এইভাবে নামে মত্ত হয়ে প্রভু মোর।
গড়াগড়ি দেন প্রভু হইয়া বিভোর॥

জড় সম কখন না থাকে বাহ্যজ্ঞান।
পুলকিত কলেবর কদম্ব সমান॥
আধ নীমিলিত চক্ষু যেন মৃতদেহ।
এমন আশ্চর্য্য ভাব না দেখেছ কেহ॥
কাঁটা খোচা নাহি মানে পড়ে আছাড়িয়া।
কি ভাবে কখন মত্ত না পাই ভাবিয়া॥
ত্রিরাত্রি চলিয়া গেল গাছের তলায়।
অনাহারে উপবাসে কিছু নাহি খায়॥
বহিছে হৃদয়ে দর্‌দর্ অশ্রুধারা।
শত ডাকে কথা নাই পাগলের পারা॥
প্রভু গড়াগড়ি দেন উলঙ্গ হইয়া।
চতুর্থ দিবসে এক রমণী আসিয়া।
অতিথ্য করিলা তবে আটা চূণা দিয়া॥

এ সমুদায় কেন? জীবকে হরিনাম দিয়া পবিত্র করিতেছেন। যাহারা এরূপ উপকৃত হইতেছে তাহারা জানিতেছে না যে তিনি কে? তৎপর সেখান হইতে তিন ক্রোশ দূরে গিরীশ্বর মন্দিরে গমন করিলেন। কথিত আছে যে, উহা স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করেন, আর শিবের বিগ্রহ স্বয়ং ব্রহ্মা স্থাপন করেন।

বড় এক-বিল্ব বৃক্ষ আছে সেইখানে।
পোয়া পথ জুড়িয়াছে শাখার বিথানে॥

গোবিন্দ শুনিলেন যে এ বৃক্ষ কখন ফল ধরে না। এই মন্দিরের তিন ভিত পর্ব্বত কর্ত্তৃক বেষ্টিত। এখানে একটী সন্ন্যাসীর সহিত প্রভুর মিলন হয়, যাহা শুনিলে বুঝা যায় যে শাস্ত্রে যে যোগীগণের কথা বর্ণিত আছে তাহা কল্পিত নয়। সামান্য সন্ন্যাসী ও ভণ্ড সন্ন্যাসী দেখিয়া দেখিয়া

এখন লোকে আর যোগ শাস্ত্রে বিশ্বাস করিতে চাহে না। প্রভু এই মন্দিরে দুই দিবস কাটাইলেন, কিরূপে না "প্রেমেতে বিভোর হয়ে—

আছাড়িয়া বিছাড়িয়া পড়েন ধরায় ॥
কভু হাসি কভু কান্না পাগলের মত।
দরদরে অশ্রু পড়ে ধারা অবিরত ॥"

দুই দিবস এইরূপ ঘোর অচেতন অবস্থায় প্রভুর কাটিয়া গেল, মোটে চেতন হইল না। তিন দিনের দিন একটী জটাধারী সন্ন্যাসী পাহাড় হইতে নামিলেন। তিনি একেবারে উলঙ্গ। তিনি আসিয়া আপন মনে শিবকে পূজা করিয়া, কারু সহিত কোন কথা না বলিয়া, যে পথে আসিয়াছিলেন সেই পথ দিয়া আবার পর্ব্বতোপরি গমন করিলেন। সন্ন্যাসীকে দেখিয়া গোবিন্দ একটু আকৃষ্ট হইলেন, কারণ তিনি এরূপ সন্ন্যাসী কখন দেখেন নাই। দেহটী যেন একখানি "পোড়াকাঠ"। প্রভু যেই চেতন পাইলেন গোবিন্দ অমনি সাহস করিয়া প্রভুকে সেই সন্ন্যাসীর কথা বলিলেন। শুনিবা মাত্র প্রভু সেই পর্ব্বতোপরি চলিলেন। প্রভু সচরাচর এক দিনের অধিক কোন স্থানে থাকেন না, এখানে নির্জ্জন স্থানে যে তিন দিন ছিলেন বোধ হয় সন্ন্যাসীর সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করিবেন এই কারণ। প্রভু চলিলেন ও অবশ্য গোবিন্দও চলিলেন। ক্রমে পর্ব্বতোপরে যাইয়া দেখেন যে সন্ন্যাসী উলঙ্গ, বৃক্ষতলে বসিয়া, একেবারে ধ্যানে মগ্ন, বাহজ্ঞান মাত্র নাই।

প্রভু প্রথমে সন্ন্যাসীকে বিনয় করিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল না। তখন প্রভু দাঁড়াইয়া যোড় হস্তে তাঁহাকে স্তব আরম্ভ করিলেন, ইহাতে সন্ন্যাসী চক্ষু উন্মিলন করিলেন, করিয়া প্রভুর পানে চাহিলেন। চাহিয়া যেন অতি আনন্দের সহিত হাসিয়া উঠিলেন। এই পোড়া কাঠের মুখে হাসি ইহাও এক আশ্চর্য্য দৃশ্য। কেন হাসিলেন তাহা কে বলিতে পারে? প্রভু তখন তাঁহার কাছে বসিলেন। সন্ন্যাসী

কথা কহিলেন, বলিলেন এখানে অপেক্ষা করিয়া আমার আতিথ্য গ্রহণ করুন। ইহা বলিয়া ছয়টা পরটা ফল দিলেন, দুইটা প্রভুকে চারিটা গোবিন্দকে। ফল পাইয়া গোবিন্দের আর দেরি সহে না, কিন্তু প্রসাদ না করিলে খাইতে পারেন না, তাই প্রভুর দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিতে লাগিলেন। প্রভু বুঝিয়া প্রসাদ করিয়া দিলেন, তখন গোবিন্দ চারিটা ফল ভক্ষণ করিলেন।

এ পরটা ফলটা কি? গোবিন্দ বলেন যে উহা মধুসম বড় মিষ্ট। গোবিন্দ চারিটা ফল খাইয়া লোভে একবারে জ্ঞানশূন্য হইলেন, এমন কি ইচ্ছা হইল যে প্রভুর হস্তে যে দুটা ফল রহিয়াছে তাহাও ভক্ষণ করেন। অন্তর্যামি প্রভু জানিয়া গোবিন্দের হস্তে আপনার দুটা ফল দিলেন। গোবিন্দ সেই ফল হাতে করিয়াই হনুমানের দুর্দ্দশার কথা তাহার মনে পড়িল। আপনারা জানেন হনুমান লোভে অভিভূত হওয়া অপরাধে দুঃখ পাইয়াছিলেন, অর্থাৎ তাঁহার গলায় আঁটি বাধিয়া গিয়াছিল। তাই মনে করিয়া ফল খাইতে গোবিন্দ ইতঃস্তত করিতে লাগিলেন। অমনি অন্তর্যামি প্রভু মৃদু হাসিয়া বলিতেছেন "গোবিন্দ! তুমি সচ্ছন্দে খাও, তোমার গলায় আঁটি বাধিবে না।" তখন গোবিন্দ লজ্জা পাইয়া প্রভুর চরণে পড়িলেন, পরে সে দুটা ফলও খাইলেন। সন্ন্যাসী তখন প্রভুকে আর দুটা ফল আনিয়া দিলেন। প্রভু কৃষ্ণ কথা আরম্ভ করিলেন, করিবা মাত্র ভাবে বিভোর হইলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইল।

প্রেম ভরে খুলে গেল জটার বন্ধন।
চরণে চরণ বান্ধি পড়িল তখন॥

কি দুঃখের বিষয় গোবিন্দ তখন ধরিতে পারিলেন না, প্রভু সেই পাথরের উপর পড়িয়া গেলেন—

কপাল ফাটিয়া গেল পাথরের ঘায়।
রুধিরের ধারা কত পড়িল ধরায়॥

মুখে লালা বহে কত জল নাসিকায়।
জড়ের সমান পড়ি রহে গোরা রায় ॥

সন্ন্যাসী তখন এক নূতন জগৎ দেখিলেন। প্রভু আত্মারাম শ্লোক লইয়া কত কাণ্ড করেন তাহা আপনারা জানেন। এই শ্লোকটীর তাৎপর্য্য এই যে, যে সমুদায় আত্মারামগণ সমস্ত গ্রন্থি ছেদন করিয়াছেন তাহারাও তুলসীর গন্ধে আকৃষ্ট হয়েন, অর্থাৎ ভক্তিতে লোভ করেন। এই তত্ত্বটী পূর্ব্বে শ্লোকে আবরিত ছিল, এখন প্রভু তাহার সারত্ব দেখাইতেছেন। এই সন্ন্যাসীটী আত্মারাম ও নিগ্রগ্রন্থি, বটে। এখন তুলসীর গন্ধ পাইয়া কি করিলেন শ্রবণ করুন :—

প্রভুর চরণে পড়ি কান্দিতে লাগিল ॥
পোড়া কাষ্ঠ সম দেহ অঙ্গে নাই বাস।
খুলিল জটার ভরি বহিল নিশ্বাস ॥
শ্মশ্রু বহি অশ্রু ধারা বহিতে লাগিল।
প্রেমে সেই পোড়া কাষ্ঠ ফুলিয়া উঠিল ॥"

জ্ঞান হইতে আনন্দ হয়, প্রেম হইতেও আনন্দ হয়। যাহারা মনের সমুদায় কমনীয় ভাব নষ্ট করিয়া শুধু যোগ দ্বারা আত্মার পরিবর্দ্ধন করেন, তাহারা জ্ঞানানন্দ ভোগ করেন। তাহারা একা, তাহাদের সঙ্গী নাই। ভগবানও তাহাদের সঙ্গী নন, তাহারা আপনার আত্মার সহিত রমণ করেন। আর যাহারা অন্তরের কমনীয় ভাবগুলি বর্দ্ধন করিতে থাকেন তাহাদের সঙ্গী জীব মাত্রেই ও তাহাদের সঙ্গী ভগবান। তাহারা ক্রমে প্রেম লাভ করেন, করিয়া প্রেমানন্দ ভোগ করেন। যাহারা জ্ঞানানন্দ ভোগ করেন, তাহারা এক প্রকার গুলিখোর, আনন্দ লইয়া পড়িয়া থাকেন, প্রেমানন্দ হইতে বঞ্চিত। যাহারা প্রেমানন্দ ভোগ করেন জগৎ তাহাদের, আর জগতের তাহারা, ভগবান তাহাদের' আর ভগবানের তাহারা। তাঁহারা উভয়

প্রেমানন্দ ও জ্ঞানানন্দ ভোগ করেন। প্রেমানন্দ বলিয়া যে কোন বস্তু আছে তাহা জ্ঞানানন্দীগণ অবগত নহেন।

এখন সন্ন্যাসী ঠাকুর এক বিন্দু প্রেম সুধা আস্বাদ করিয়া প্রভুর চরণে পড়িলেন, প্রভু এই সন্ন্যাসী দ্বারা দেখাইলেন যে যাহারা আত্মারাম ও গ্রন্থি শূন্য তাহারাও তুলসী গন্ধতে লোভ করেন। পোড়া কাষ্ঠ এখন সরস হইল। রূপে গর্ব্বিতা স্ত্রী অহংকারে মৃত্তিকায় পা দেন না, তাহার রূপে ভাল লোকের আনন্দ হয় না, বিরক্ত হয়। তিনি দৈবাৎ প্রেমের ফাঁদে পড়িয়া গেলেন। তখন তিনি দীন হইতে দীন হইলেন। তাহার দর্শন ও ভাব অতি মধুর হইল, তাহার হৃদয়ের কমনীয় ভাবগুলি যাহা শুখাইতেছিল তাহা সজীব হইল, আর তাহার সৌন্দর্য্য শক্তি বাড়িয়া উঠিল, সন্ন্যাসীর ঠিক তাহাই হইল।

"ছটফট করিতে লাগিল সন্ন্যাসী বর।
প্রভুরে নেহারি বলে তুমি সে ঈশ্বর॥"

এই নিগ্রন্থি আত্মারাম সন্ন্যাসী বরকে শ্রীভগবানের চরণে আনিয়া প্রভু দ্রুত গতিতে ত্রিপদি নগরে গেলেন। চরিতামৃত সংক্ষেপে এইরূপে প্রভুর ভ্রমণ বর্ণনা করিতেছেন ঃ—

বেঙ্কট হইতে ত্রিপাদ আসিয়া শ্রীরাম দর্শন করিলেন, পরে,—

পানা নরসিংহে আইল প্রভু দয়াময়॥
নৃসিংহ প্রণতি স্তুতি প্রেমাবেশ হৈল।
প্রভুর প্রভাবে লোক চমৎকার হইল॥
শিবকাঞ্চি আসি কৈল শিব দরশন।
বিষ্ণুকাঞ্চি আসি দেখিল লক্ষ্মীনারায়ণ॥
প্রেমাবেশে নৃত্য গীত বহুত করিল।
দিন দুই রহি লোকে কৃষ্ণভক্ত কৈল॥

ত্রিমল্ল দেখি গেল ত্রিকাল হস্তি স্থান।
মহাদেব দেখি তারে করিল প্রণাম॥
পক্ষতীর্থ যাই কৈল শিব দরশন।
বৃদ্ধ কেবল তীর্থ তরে করিল গমন॥
শ্বেত বরাহ দেখি তারে নমস্কার করি।
পীতাম্বর শিব স্থানে গেলা গৌর হরি॥
শিয়ালী ভৈরবী দেবী করি দরশন।
কাবেরী তীরে আইল শচীর নন্দন॥

এখন উপরিউক্ত তীর্থ স্থানে কি কি লীলা করিলেন বলিতেছি। ত্রিপদী নগরে শ্রীরাম দর্শন করিয়া প্রভু ধুলায় পড়িয়া গেলেন। সেখানে রামায়েৎ-গণের বাস, সর্ব্বপ্রধান মথুরা রামায়েত ভারি পণ্ডিত। তখনকার দেশের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় যে সেই সময় দেশে পরম পণ্ডিতের ছড়াছড়ি হইয়াছিল, দেশ কেবল পরম পণ্ডিতের দলে ছাকিয়া ফেলিয়াছিল। এক স্থানে আমি বলিয়াছিলাম যে যখন ভারতবর্ষ বিদ্যা ও অধ্যাত্ম চর্চ্চা করিতে করিতে চরমসীমা উপস্থিত হয়েন প্রভু আসিয়া সেই সময়ে উদয় হইলেন। আমরা দেখিতে পাই যে সে সময় কি বাঙ্গালা কি পশ্চিম, কি উত্তর কি দক্ষিণ সকল স্থানই মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কর্তৃক অলঙ্কৃত হইয়াছিলেন, আর প্রায় সকলেই শঙ্করের ভাষ্য দ্বারা হয় প্রত্যক্ষ নয় পরোক্ষে চালিত হইতেছিলেন। মথুরা—

বড়ই তার্কিক বলি নগরে বিদিত।

তিনি কাজেই প্রভুর নিকট যুদ্ধংদেহি বলিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভু তাঁহাকে বড়ই মধুর সম্ভাষণ করিলেন। বলিতেছেন—

মথুরা ঠাকুর, আমি বিচার না জানি।
তোমার নিকটে শতবার হারি মানি॥

বলিতেছেন, তুমি শ্রীরামের ভক্ত, অবশ্য তোমার নিকট সব তত্ত্ব নিহিত আছে, তুমি কেন আমাকে তাহার কিছু শিক্ষা দাও না? আমার উপকার হয়, শ্রীরামচন্দ্রও তোমার উপর সন্তুষ্ট হইবেন। বিচারে আমাকে জয় করিবে ভাল, কিন্তু ইহাতে তোমার কি লাভ হইবে? শুষ্ক তর্কে কিছু লাভ নাই। তুমি পরম ভক্ত তোমার জিগীষা শোভা পায় না, কেমন —যেমন শুভ্রবস্ত্রে কালির দাগ। তুমি বরং কিছু ভগবৎ কথা বল আমি শুনি। শ্রীভগবানের নাম করিতে, অমনি প্রভু আবিষ্ট হইলেন—

বলিতে বলিতে প্রভু হরিবোল বলি।
মাতিয়া উঠিল নামে হয়ে কুতূহলি॥
কোথায় কৌপীন কোথায় রহিল বহির্ব্বাস।
লোমাঞ্চিত কলেবর ঘন বহে শ্বাস॥
আছাড় খাইয়া তবে পড়িল ধরায়।
অচেতন হইল প্রভু যেন জড়প্রায়॥

সেই সঙ্গে রামায়তগণ ঃ—

নাচিতে লাগিল তবে প্রভুরে বেড়িয়া॥

প্রভু সেখানে অধিকক্ষণ রহিলেন না, উঠিয়া চলিলেন, তখন মথুরা আর পশ্চাৎ ছাড়েন না, সেবার আর বুদ্ধ করিতে নয়। প্রভু অনেক প্রবোধ দিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন। এই ত্রিপদি সেই অবধি বৈষ্ণবের স্থান হইল, এমন কি অতি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব তীর্থ বলিয়া গণিত হইল, শেষে প্রভু পানানরসিংহ গমন করিলেন।

এই ঠাকুর প্রহ্লাদের প্রভু। সেইভাবে বিভোর হইয়া ঠাকুরকে স্তব করিতে লাগিলেন। তখন নৃসিংহের অধিকারী মাধবেন্দ্র ভূজা প্রভুর গলায় তুলসীর মালা পরাইয়া দিল, আর পূজারী দ্রুত গতিতে প্রসাদ আনিল, আনিয়া প্রভুর সম্মুখে রাখিল। প্রভু তাহার কণামাত্র লইলেন, লইয়া

হস্তে করিয়া সেই কণাকে "বহু স্তব" করিলেন। স্তব করিতেছেন আর দুই পদ্ম চক্ষু হইতে অবিরত আনন্দ ধারা পড়িতেছে, গোবিন্দেরও প্রসাদ জুটিল, তাহার উপযুক্ত প্রসাদ। এখানকার প্রধান ভোগ চিনিপানা, তাই ঠাকুরের নাম পানানৃসিংহ। গোবিন্দ বলিতেছেন—

শর্করের পানা মোরে দিল আনাইয়া।
পিয়ে পিয়ে খাই পানা উদর পুরিয়া॥
নৃসিংহের পানা হয় অমৃতের সমান।

তাহার সন্দেহ কি, বিশেষ তখন গ্রীষ্মকাল। পরে প্রভু সেখান হইতে শিবকাঞ্চি ও বিষ্ণুকাঞ্চি আইলেন। বিষ্ণুকাঞ্চির ঠাকুর লক্ষ্মীনারায়ণ, তাহার অধিকারী ভবভূতী, ইনি শেঠী, যেমন ধনবান তেমনি ভক্ত, ইহারা সস্ত্রীক ঠাকুরের সেবা করেন। সেবার নিমিত্ত প্রত্যহ দুই মণ ক্ষীরের পায়স হয়। তাহারা ভোগের নিমিত্ত বৎসরে বহু সহস্র মুদ্রা ব্যয় করেন। তাহার স্ত্রীর সেবা আরো চমৎকার। তিনি প্রত্যহ মন্দির ধৌত করেন।

বিষ্ণুকাঞ্চি হইতে ছয়ক্রোশ দূরে চারি হস্ত পরিমিত গৌরি পট-শিব। সেখান হইতে পক্ষগিরি দেখা যায়, তার নীচে পক্ষতীর্থ, ভদ্রা নদীর ধারে। প্রভু সেই নদীতে স্নান করিলেন, আর সেবা করিলেন—চাম্পি ফল। সে ফল কিরূপ? সেখানে বৃক্ষতলে প্রভু ও ভৃত্য রজনী বঞ্চিলেন। সে রজনী প্রভু এক লীলা করেন। রাত্রিতে শয়ন করিয়া আছেন এমন সময় একটী ব্যাঘ্র গর্জ্জন করিতে করিতে তাহাদের আক্রমণ করিল। উহা বোধ হয় পক্ষগিরিতে বাস করিতেন।

প্রভু হাস্য করিলেন, হরিধ্বনি করিলেন।

হরিধ্বনি শুনি ব্যাঘ্র লেজ গুটাইয়া।
পিছাইয়া গেল এক বলে লম্ফ দিয়া॥

তখন গোবিন্দ বিস্ময়াবিষ্ট ও কৃতজ্ঞ হইয়া প্রভুর চরণরজ বারবার

স্তকে দিতে লাগিলেন। সেখান হইতে পঞ্চক্রোশ দূরে কালতীর্থ (চরিতা-ত বলেন "কেবল" তীর্থ), এখানে বরাহ দেবের মূর্ত্তি। প্রভু দর্শন করিয়া লেকিত ও দরদরিত ধারা হইলেন।

পিচকারি সম অশ্রু বহিতে লাগিল।
ফুলে ফুলে কান্দি প্রভু আকুল হইল॥

সেখান হইতে পঞ্চক্রোশ দক্ষিণ সন্ধিতীর্থ, যে হেতু সেখানে দুই নদীর ঙ্গম, নন্দী ও ভদ্রা। সেখানে সদানন্দ পুরী বাস করেন। নাম শুনুন! দানন্দ পুরী! তিনি প্রভুর ভক্তি দূষিলেন। তিনি বড় পণ্ডিত আর সাহহং এই গর্ব্ব করিতে লাগিলেন। প্রভু তাহাকে তুলসীর গন্ধ ঁকাইলেন। আর তার "সদানন্দত্ব" ফুরাইয়া গেল। তিনি কাঁদিতে াগিলেন। ফল কথা, যে ব্যক্তি বলে আমি ঈশ্বর, অথচ একটি পীপড়া ংশন করিলে বাবারে মারে করিয়া গড়াগড়ি দেয়, তাহার মত হতভাগ্য ক কেহ জগতে আছে? সদানন্দ বুঝিলেন, অর্থাৎ প্রভু বুঝাইয়া দিলেন, য ভগবান অতি প্রকাণ্ড বস্তু, আর তিনি কীটাণু, আর আপনি ভগবান া হইয়া ভগবানকে ভজন করাই ভাল। সদানন্দ প্রভুর পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন। সেখান হইতে প্রভু চাঁইপল্লি তীর্থে গমন করিলেন। পূর্ব্বে গোবিন্দ একটি সন্ন্যাসী দেখিয়াছিলেন, এখন সিদ্ধেশ্বরী নাম্নী অতি তেজস্বিনী একটি সন্ন্যাসীনী দেখিলেন। বিল্ববৃক্ষের তলায় বসিয়া একেবারে ্যানস্থ। বয়স যেন একশত বৎসর হইয়াছে। সেখানে শৃগালি বা শয়ালি বিগ্রহ আছেন। অর্থাৎ এখানে শৃগাল, পূজার বস্তু, তাহার াম শৃগলি ভৈরবী। প্রভু তাহার পর কাবেরী তীরে ও সেখান হইতে াগর নগরে গমন করিলেন।

উপরে যে কয়েকটি তীর্থের কথা লিখিলাম, সেখানে প্রভু কি কি ীলা করেন তাহা গোবিন্দ লেখেন নাই। তিনি গ্রন্থে লিখিয়াছেন য,

তাহার এ গ্রন্থ লেখার অনেক অসুবিধা ছিল, প্রথম দেশের ভাষা বুঝিতেন না, দ্বিতীয় পথে পথে চলিয়াছেন। তাই তিনি কড়চা করিয়া রাখিয়াছিলেন মাত্র। বিস্তার করিয়া লিখিলে, প্রভুর এক এক স্থানের লীলা বর্ণনা করিলে একখানি গ্রন্থ হইত। যাহা হউক, গোবিন্দ যাহা রাখিয়া গিয়াছেন তাহাই প্রচুর ও তাহার নিমিত্ত আমরা চিরকৃতজ্ঞ।

নাগর নগরে বহুতর লোকের বাস। সেখানকার ঠাকুর রামলক্ষ্মণ। প্রভু সেখানে তিন দিবস অনবরত নৃত্যগীত ও নাম বিতরণ করেন, ইহাতে কি হইল, না গ্রাম সমেত ভক্তিতে পাগল হইল। অধিকন্তু দশক্রোশ হতে লোক আসিয়া জুটিতে লাগিল। প্রভুর প্রতাপ দেখিয়া সেখানকার একজন ব্রাহ্মণের ঈর্ষা হইল, সে আসিয়া প্রভুকে গালি দিতে লাগিল। বলে, তুই ভণ্ড সন্ন্যাসী, গ্রামের নির্ব্বোধ লোককে ভুলাইতেছিস, তোকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিব। প্রভু নদীয়ায় যখন ছিলেন তখন প্রহারের ভয়ে সন্ন্যাসী হয়েন, কিন্তু এখানে দেখিতেছি সন্ন্যাসী হইয়াও নিস্তার পাইলেন না। তবে তিনি ব্রাহ্মণের বাক্যে হাসিতে লাগিলেন, আর সহাস্তে বলিলেন, তুমি আমাকে মারিবে সে সোজা কথা, কিন্তু অগ্রে তোমার মুখে হরি বলিতে হইবে। তখন গ্রামের লোক প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছে, তাহারা ইহা কিরূপে সহিবে? তাহারা ব্রাহ্মণকে প্রহার করিবে এইরূপ উদ্যোগ করিল। প্রভু তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। তখন সকল লোকে প্রভুর এরূপ বশীভূত হইয়াছে যে তাহার সামান্য ইচ্ছা তাহাদের কাছে ভগবৎ আজ্ঞা স্বরূপ অলঙ্ঘ্য হইয়াছে। তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া প্রভু ব্রাহ্মণকে বলিতেছেন যে, শুন দয়াময় ঠাকুর, এ সমুদায় কাজ ভাল নয়, বরং হরি বল বলিয়া অনন্ত সুখ আহরণ কর। তুমি প্রকৃতপক্ষে ভক্ত, তাহার সন্দেহ নাই। তবে তোমার এরূপ প্রবৃত্তি কেন?

তুমি, আমারে আঘাত কর তাতে দুঃখ নাই।
প্রাণ ভরে হরি বল এই ভিক্ষা চাই॥

সকলে দেখিল প্রভুর ক্রোধ নাই, কোন বিকার নাই, বরং যেন হৃদয় য়াতে পরিপূর্ণ। ব্রাহ্মণ বিনা অপরাধে তাহাকে যথেষ্ট অপমান করিল, মন কি অন্যে প্রভুকে রক্ষা না করিলে সত্যই তাহাকে প্রহার করিত, হাতে প্রভু কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না, বরং পাছে অন্যে বিপ্রকে প্রহার ক অপমান করে এই ভয়ে ব্যস্ত হইয়া অতি প্রেমের সহিত সেই ব্রাহ্মণকে পদেশ দিতে লাগিলেন। ইহাতে সকলে মুগ্ধ হইল, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা গ্ধ হইল এই "দয়াময়" ঠাকুর। সে আর থাকিতে পারিল না। প্রভু রক্ষা কর, রক্ষা কর, আমার একি দুর্ম্মতি", বলিয়া—

প্রভুর চরণ তলে পড়িল ধরায়॥
এইরূপে ব্রাহ্মণে যে কৃতার্থ করিয়া।
চলিল চৈতন্যদেব নাগর ছাড়িয়া॥

যাইয়া সাত ক্রোশ দূরে তাঞ্জোরে উপস্থিত হইলেন। চরিতামৃত সংক্ষেপে লিয়াছেন—

শিয়ালি ভৈরবী দেখি করি দরশন।
কাবেরী তীরে আইল শচীর নন্দন॥

সেখানে গো-সমাজ শিব দেখিলেন, পরে কুম্ভকর্ণের কপালের সরোবর দখিয়া পরিশেষে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে আইলেন। তাঞ্জোর নগরে ব্রাহ্মণ ধলেশ্বর, াধাকৃষ্ণ বিগ্রহ সেবা করেন। সেই ঠাকুর বাড়ীর আঙ্গিনায় এক কাণ্ড বকুল বৃক্ষতলে থাকেন, আর অনেক বৈষ্ণব সন্ন্যাসী সেখানে বাস রেন। গো-সমাজ শিব তাহার বামভাগে থাকেন। ধলেশ্বর, প্রভুকে ম্ভকর্ণ সরোবর দেখাইতে লইয়া গেলেন। প্রবাদ এই যে, এই রোবরটি কুম্ভকর্ণের মাথা আর কিছু নয়। কুম্ভকর্ণ লঙ্কায় মরেন. তাহার

সেই অত বড় মাথা তাঞ্জোরে কে বহিয়া আনিল তাহার সংবাদ আমরা পাই নাই। সেখান হইতে অতি সুন্দর চণ্ডালু পর্ব্বত দেখা যায়। দেখিতে যেন একখানা সুন্দর চিত্র। সেখানে বিস্তর গোফা আছে, আর উহাতে অনেক সন্ন্যাসী থাকিয়া তপস্যা করেন। এইরূপে ভারতবর্ষে সহস্র সহস্র পর্ব্বতে লক্ষ লক্ষ গোফা ছিল ও এখনও আছে। তবে তখন সেখানে সন্ন্যাসীগণ বাস করিতেন, এখন সমুদায় শূন্য পড়িয়া আছে, কি ব্যাঘ্র ভল্লুকের বাসস্থান হইয়াছে। দক্ষিণদেশে মুসলমান উপদ্রব তখন প্রবেশ করে নাই। কাজেই ভারতবর্ষে মুসলমানগণ আসিবার পূর্ব্বে কি অবস্থা ছিল, তাহা তখনকার দক্ষিণদেশ দেখিলে বুঝা যাইত। এই যে প্রভু চলিয়াছেন, ইহাতে প্রতি পদে পদে তীর্থস্থান পাইতেছেন। আর সকল স্থানই সাধু সন্ন্যাসীগণ কর্ত্তৃক অলঙ্কৃত। নিকটে একটি ক্ষুদ্র বনে সুরেশ্বর নামক সন্ন্যাসী দশজন শিষ্য লইয়া বাস করেন। বনটি অতি মনোহর, বড় বড় গাছ ও একটি ঝরণার দ্বারা শোভিত। সাধু, সন্ন্যাসী, উঁদাসীন ও যোগীগণ এইরূপ বাছিয়া সুন্দর স্থানে থাকেন। নিকটস্থ গ্রাম হইতে লোকে তাহাদের ভিক্ষা যোগাইয়া থাকেন। এইরূপ পূর্ব্বে ভারতবর্ষে সকল স্থানে আশ্রম ছিল। প্রভু সেখানে কয় দিন থাকিয়া, সন্ন্যাসী কয়েকটিকে প্রেমে উন্মত্ত করিয়া, সেই বৈকুণ্ঠতুল্য স্থান ত্যাগ করিয়া পদ্মকোটে গেলেন।

সেখানে অষ্টভুজা দেবী থাকেন। প্রভুকে দেখিতে বহুলোক আইল। তাহাদের সহিত দুই এক কথা বলিতে বলিতে কি এক আশ্চর্য্য অলৌকিক ভাব হইল। প্রভু হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। আর চারিদিকে তাহার প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। দেবী যেন দুলিতে লাগিলেন আর পুষ্প-বৃষ্টি হইতে লাগিল, সেই পুষ্প লইয়া রমণীগণ ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন।

বালক বালিকা যুবক ক্ষেপিয়া উঠিল।
অষ্টভুজা দেবী যেন দুলিতে লাগিল॥
পদ্মগন্ধ চারিদিকে লাগিল বহিতে।
সেইখানে পুষ্পবৃষ্টি হইল আচম্বিতে॥

পশ্চাতে রমণীগণ ছিলেন, তাহারা সেই ফুল কুড়াইয়া কেলি আরম্ভ করিলেন, অর্থাৎ পরস্পরে পরস্পরের গাত্রে ফুল ফেলিতে লাগিলেন।

এই সমুদায় অলৌকিক কাণ্ড হইতেছে, যেন সকলে আবেশিত, তাহাদের সম্পূর্ণ চেতন নাই। এমন সময় একটি অন্ধ ব্রাহ্মণ সাধু, ধীরে ধীরে আসিয়া, প্রভুর পদদুখানি জড়াইয়া ধরিল, ধরিয়া বলিতেছে, "হে জগদীশ্বর কৃপা কর।" প্রভু বলিলেন "এখানে জগদীশ্বর কোথা, সন্মুখে জগদীশ্বরী আছেন বটে!" অন্ধ বলিলেন, "প্রভু আমাকে দয়া কর, আমি চক্ষু ভিক্ষা করি না, আমি কেবল একবার তোমার রূপ দেখিব।" প্রভু বলিলেন, "তোমার চর্ম্মচক্ষু নাই, তুমি কি রূপে দেখিবে, তবে তুমি জ্ঞান চক্ষু দ্বারা সমুদায় দেখিতে পাইতে পারো বটে।"

কিন্তু অন্ধ পা ছাড়েন না। বলিলেন, "তবে শুনিবে? আমি বহুকাল এই ভগবতীর আশ্রয়ে মন্দিরে পড়িয়া আছি। কল্য নিশিতে আমাকে ভগবতী স্বপ্নে দেখাইয়াছেন যে, তুমি আসিতেছ আর তুমিই অগতির গতি। তাহাই তোমার চরণে আশ্রয় লইয়াছি। জীবে তোমাকে দয়াময় বলে। তুমি তোমার সেই দয়ার গুণে আমাকে তোমার রূপটি একবার দেখাও, আমি আর কিছুই চাই না।" প্রভু অগ্রে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই আবার বলিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন, "আমি সামান্য মানুষ, তবে এক হিসাবে আমি ভগবান, যেহেতু জীবমাত্রের হৃদয়ে ভগবান বাস করেন। কিন্তু তুমি আমাকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া আমাকে অপরাধী করিতেছ।"

অন্ধ বলিলেন, "ও সব কথা থাকুক ; আমাকে তোমার রূপ দেখাও।" ইহা বলিয়া কান্দিয়া আকুল হইলেন। তখন প্রভু অস্থির হইলেন। কারণ প্রভু বরাবর একটি বিষম "দৌর্ব্বল্যের" পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন, অর্থাৎ লোকের আর্ত্তি শুনিলে অস্থির হইতেন, লোকের আর্ত্তি দেখিতে পারেন নাই। পরে অন্ধের কর ধরিলেন, ধরিয়া তুলিলেন, তুলিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। প্রভুর স্পর্শ পাইবামাত্র অন্ধ শিহরিয়া উঠিলেন, আর তখনি নয়ন মেলিলেন। একটু স্থির নয়নে প্রভুর চন্দ্রবদন নিরীক্ষণ করিলেন, করিয়া তাহার মুখ অতি প্রফুল্ল হইল। আর অমনি অচেতন হইয়া পড়িয়া গেলেন। সে চেতন আর ভাঙ্গিল না, তিনি প্রভুকে দর্শন করিয়াই প্রাণত্যাগ করিলেন।

তখন মহা কলরব হইল, প্রভু সেই মৃতদেহ বেড়িয়া কীর্ত্তন ও নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রভু অমনি লোকের অগোচরে পলায়ন করিলেন।

যেখানে এরূপ কোন অলৌকিক কাণ্ড হয় প্রভু সেখান হইতে দ্রুত পলায়ন করেন। প্রভু যদি কোন কুষ্ঠকে আরোগ্য কি অন্ধকে চক্ষুদান দিলেন, তবে লক্ষ লক্ষ লোকে তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিবে, আর তাঁহার কার্য্যের ব্যাঘাত হইবে। তাই সেখান হইতে পলায়ন করিয়া ত্রিপাত্র নগরে গেলেন। ত্রিপাত্র কাবেরীর দক্ষিণে সমুদ্র হইতে একটু দূরে।

সেখানে চণ্ডেশ্বর শিব। সে মন্দিরে একবার ববম্ শব্দ করিলে এক দণ্ডকাল পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনি হয়। আঙ্গিনায় এক প্রকাণ্ড বিল্ববৃক্ষ, সেখানে অনেক শৈব পণ্ডিত বাস করেন। তাঁহাদের প্রধান পণ্ডিতপ্রবর [illegible]ত বৃদ্ধ ভর্গদেব বসিয়াছিলেন। প্রভু উপস্থিত হইলে অমনি চিনিলেন। প্রভুর যশ প্রভুর আগে আগে চলিতেছে। ভর্গদেব তাঁহার অনুগত জনকে বলিতেছেন, তোমরা চৈতন্যের কথা শুনিয়াছ, যাঁহার প্রতাপে দেশে আর পাপী রহিল না। যিনি হরিনামে জগৎ মাতাইয়াছেন, তিনি স্বদেশ

ছাড়িয়া এদেশ উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন। দেখ যেমন শুনিয়াছি তাই বটে, এমন সুন্দর চিত্তাকর্ষক বিগ্রহ তোমরা কি দেখিয়াছ?" প্রভু অগ্রে দাঁড়াইয়াছেন, আর ভর্গ তাহাকে শুনাইয়া এই সব কথা বলিতেছেন। পরে বলিতেছেন, "না হবে কেন উনি শ্রীকৃষ্ণের অবতার। এসো আমরা সকলে প্রণাম করি।" ইহাই বলিয়া সকলে প্রণাম করিলেন। প্রভু অমনি প্রতি প্রণাম করিয়া অতি বিনীত ভাবে বলিতেছেন, "ভর্গদেব! আপনি আমাকে বড় অপরাধী করিতেছেন। আমার নাম চৈতন্য বটে, আমার বাড়ী বঙ্গদেশে, নদীয়ায়। আমি অতি ক্ষুদ্র একটি জীব।" তখন ভর্গ বলিতেছেন, "আমি অতি বৃদ্ধ আমাকে উদ্ধার করিতে এখানে আসিয়াছ, আমার সঙ্গে লুকোচুরি ভাল নয়। আমি তোমাকে চিনেছি আমার মাথায় চরণ তুলিয়া দাও। কি সৌভাগ্য! কি তোমার কৃপা!" ইহা বলিয়া ভর্গ ধূলায় লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। প্রভু করেন কি সেখানে সাত দিন থাকিতে হইল। সমুদায় শৈবগণকে মালাধারণ করাইয়া কৃষ্ণ-প্রেমে উন্মত্ত করাইয়া তাহাদিগকে ছাড়িলেন। গোবিন্দ বলিতেছেন যে, "প্রভুকে দেখিবামাত্র যে লোকে আকৃষ্ট হয় তাহার অনেক কারণ ছিল।" বলিতেছেন।

আমার প্রভুর কথা কি কহিব আর।
আশ্চর্য্য প্রভাব তার বিচিত্র আকার॥
দিনান্তে সামান্য ভোজন করে গোরারায়।
না খাইয়া দেহ ক্ষীণ যষ্টির প্রায়॥
অস্থি চর্ম্ম অবশিষ্ট হইয়াছে তাঁর।
তথাপি দেহের জ্যোতি অগ্নির আকার॥
মোহিত সকলে হয় অঙ্গের আভায়।
অহেতুক পদ্ম গন্ধ সদা তার গায়॥

(৬ষ্ঠ—৬ষ্ঠ খণ্ড)

যে জন তাঁহার প্রতি আঁখি মেলি চায়।
তেজের প্রভাবে চক্ষু ঝলসিয়া যায়॥

ভর্গদেব প্রভুর সঙ্গে আসিতে চাহিলেন, কিন্তু প্রভু অনেক বিনয় করিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিলেন।

লক্ষ লক্ষ লোক আসে প্রভুকে দেখিতে।
কাতর না হয় প্রভু কৃষ্ণ নাম দিতে॥
"ক্ষেপা হরিবোলা" বলে প্রভুরে সকলে।
খেপাইতে কত লোক হরি বোল বলে॥
হরি বলি কত লোক পেছু পেছু ধায়।
নাম শুনি প্রভু মোর ধূলি মাখে গায়॥
কেহ বলে ওরে ভাই সেই ক্ষেপা যায়।
হরি হরি বলি সবে খেপাও উহায়।
আরম্ভিল খেপাইতে সব শিশুগণ।
সেই সঙ্গে নাচে প্রভু শচীর নন্দন॥

বালকগণ প্রভুকে কিরূপে হরি বলে খেপাইত পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহারা প্রভুর নাম খেপা হরিবোলা দিয়াছিল। বালকগণ বলে "হরি হরি বোল" আর পরস্পর বলাবলি করে যে, এই দেখ পাগল খেপে আর কি। প্রভু তাহাদের ভাব বুঝিয়া বসিয়া গায়ে ধূলা মাখেন কখন নৃত্য করেন কখন ধূলায় গড়াগড়ি দেন। আমার প্রভু যখন এই চপল ও সরল বালকের ন্যায় হয়েন তখন সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর হয়েন।

সেখান হইতে প্রভু পঞ্চাশ যোজন ব্যাপি একখানি মহাবনে প্রবেশ করিলেন। আহার কেবল বনফল, ও তাহার অভাব ছিল না। তিন দিবস মনুষ্যের মুখ দেখা গেল না, পরে এক সন্ন্যাসীর দলের সহিত দেখা হইল। তখন সকলে একত্রে চলিলেন, আর বন পার হইয়া শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে

উপস্থিত হইলেন। এই নগরে আমরা প্রকাশানন্দ ও গোপালকে পাই। সমুদ্রতীর ত্যাগ করিয়া পঞ্চদশ দিবস বন পার হইয়া সকলে রঙ্গক্ষেত্রে পহুছিলেন। অভ্যন্তরে চলিলেন আর—

সেইখানে ভট্ট নামে এক বিপ্রবর।
প্রভুরে লইয়া গেল আপনার ঘর॥
প্রেমাবেশে নাচে প্রভু ব্রাহ্মণের ঘরে।
তাহা দেখি ব্রাহ্মণ পুলক অন্তরে॥

ইহার নাম বেঙ্কট ভট্ট। ইহার পুত্র গোপাল ভট্ট, বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামীর একজন। প্রকাশানন্দ সরস্বতী এই বেঙ্কট ভট্টের সহোদর; যাহার প্রভুদত্ত নাম প্রবোধানন্দ। গোপাল ভট্ট ও প্রবোধানন্দ এই দুই জনের অদ্ভুত জীবন আমি যথাসাধ্য বর্ণনা করিয়া একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক লিখিয়াছি। তাহাতে লেখা আছে যে প্রভু বেঙ্কটের বাড়ীতে চাতুর্মাস্য করেন। আমি যেমন পড়িয়াছিলাম, তেমনি লিখিয়াছিলাম, এখন আমার বোধ হইতেছে সেটি ভুল। প্রভু বৈশাখে নীলাচল ত্যাগ করিয়া মাঘ মাসে প্রত্যাগমন করেন। যে বৎসর গমন করেন সেই বৎসর যদি প্রত্যাবর্ত্তন করেন তবে তিনি মোটে দশ মাস দক্ষিণে ছিলেন। তাহার চারিমাস যদি বেঙ্কটের বাড়ীতে অতিবাহিত করিয়া থাকেন তবে তাঁহার সমুদায় দক্ষিণদেশ ভ্রমণ করিয়া পরে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন কি এত অল্প সময়ে সম্ভব হয়? তাহা হয় না। তিনি কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত যাইয়া ভারতবর্ষের পশ্চিম ধার দিয়া ঘুরিয়া দ্বারকায় গমন করেন। সেখান হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সুতরাং তিনি দক্ষিণে অষ্টাদশ মাস ছিলেন। যদি চাতুর্মাস্য নিয়ম তিনি পালন করিয়া থাকেন, তবে তাহার আর একবার উহা পালন করিতে হইয়াছিল। সে কোথা? যদি কোথাও করিয়া থাকেন তবে তাহার এই দুই বার চাতুর্মাস্য করিতে তাঁহার অষ্ট মাস

লাগিয়াছিল। তিনি কি তাঁহার প্রিয় ভক্তগণকে ছাড়িয়া অষ্ট মাস দক্ষিণে চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন? তিনি কি চুপ করিয়া থাকার বস্তু? তিনি চলিয়াছেন—দৌড়িয়া; তাঁহার ক্ষুধার ভয় নাই, অনিদ্রার ভয় নাই, ব্যাঘ্রের ভয় নাই, তবে বৃষ্টি কি তাঁহার এত ভয়ের কারণ হইয়াছিল? আসল কথা, তাহার যে সঙ্গি গোবিন্দ তিনি চতুর্মাস্যের কথা আদৌ বলেন নাই।

প্রভু বেঙ্কটের বাড়ীতে অবশ্য কিছুকাল ছিলেন, আর বালক গোপাল তাহার সেবা করিত। যখন প্রভু সেই স্থান ত্যাগ করেন তখন বেঙ্কট ও গোপাল দুই জনে প্রভুর পাছ লাগিলেন, প্রভু উভয়কে নিরস্ত করিলেন। গোপালকে বলিলেন যে তাহার পিতামাতা অদর্শনে যেন তিনি বৃন্দাবনে গমন করেন। সেখানে প্রভু তাহার সংবাদ লইবেন। তাই ইহার ত্রিশ বৎসর পরে গোপাল বৃন্দাবনে গমন করেন। সে যাহা হউক যাহারা ইচ্ছা করেন সে কাহিনী উপরিউক্ত পুস্তকে দেখিতে পারেন। চরিতামৃতে বলেন যে, সেই তীর্থে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় পাঠ করিতে বড় ভাল বাসিতেন। কিন্তু নিজের বিদ্যা অধিক ছিল না, তাই অশুদ্ধ পড়িতেন আর লোকে তাহাকে উপহাস করিত। তিনি তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হইতেন না, কারণ,—

গীতা

আবিষ্ট হইয়া পড়ে আনন্দিত মনে।
পুলকাশ্রু কম্প স্বেদ যাবৎ পঠনে॥

মহাপ্রভু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাশয়! আমি শুনিতে চাই গীতার কোন অর্থে আপনার এত সুখ হয়। ব্রাহ্মণ বলিলেন, আমি মূর্খ অর্থ কিছু বুঝি না। তবে যখন আমি পড়ি, তখন দেখি অর্জ্জুনের রথে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে উপদেশ দিতেছেন তাহাই দেখিয়া আমার এত আনন্দ হয়, গীতা না পড়িয়া থাকিতে পারি না। প্রভু তাহাকে আলিঙ্গন

করিয়া বলিলেন যে, তোমারি গীতা পাঠের অধিকার। তুমিই ইহার প্রকৃত অর্থ বুঝ। তখন ব্রাহ্মণ বলিলেন, বুঝেছি তুমিত সেই কৃষ্ণ। গোবিন্দ এই কাহিনী এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন যথা, অর্জ্জুন মিশ্র নামক এক ব্রাহ্মণ অশুদ্ধ গীতা পাঠ করেন অথচ আনন্দে বিচলিত হয়েন।

প্রভু বলে কেন কান্দ ব্রাহ্মণ ঠাকুর।
বিপ্র বলে গীতা পড়ি আনন্দ প্রচুর॥
অর্জ্জুনের রথে কৃষ্ণ দেখিবারে পাই।
সেই লোভে গীতা পড়ি সন্ন্যাসী গোসাঞি॥
প্রভু বলে কৃষ্ণ তুমি পাও দরশন।
তবে মোরে দয়া করি দাও আলিঙ্গন॥
বিপ্র বলে তুমি কৃষ্ণ কৃতার্থ করিলে।
এত বলি পদযুগ সাপটি ধরিলেঁ॥

সেখানে প্রভু শুনিলেন যে, যথা গোবিন্দের কড়্চা—

বৃষভ পর্ব্বতে থাকে পরমানন্দ পুরী।
তাহারে দেখিতে প্রভু হইল আগুসারি॥
পুরি সহ কৃষ্ণ কথা বহুত কহিলা।

চরিতামৃতে পুরী গোসাঞির সম্বন্ধে বলেন ঃ—

তিন দিন প্রেমে দোঁহে কৃষ্ণ কথা রঙ্গে।
এক বিপ্র ঘরে দোঁহে রহে এক সঙ্গে॥
তোমার নিকটে রহি হেন বাঞ্ছা হয়।
নীলাচলে আসিবে মোরে হইয়া সদয়॥

অর্থাৎ প্রভু আর পরমানন্দ পুরী তিন দিবস এক ব্রাহ্মণের বাড়ী থাকিয়া কৃষ্ণ কথায় বিহ্বল ছিলেন। প্রভু বলিলেন চলুন নীলাচলে একত্র থাকিব, আর পরমানন্দপুরী অবশ্য এই প্রস্তাবে কৃতার্থ হইলেন।

এই পরমানন্দ পুরী গোসাঞির প্রতি প্রভু এত সদয় কেন? তাহার কারণ ইনি মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ও প্রভুর গুরু ঈশ্বর পুরীর ধর্ম্ম ভাই। তাহারা উভয়ে মাধবেন্দ্র পুরীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। আর উভয়েই কৃষ্ণ প্রেমে মাতোয়ারা। তাই পরমানন্দ পুরীকে প্রভু প্রণাম করিতেন, আর নীলাচলে যাইতে আদেশ করিলেন। এই পুরী গোসাঞি চিরদিন প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে বাস করেন, ভক্তগণ ভাবিতেন যে বিশ্বরূপের তেজ তাহাতে ছিল। অর্থাৎ পুরী গোসাঞির হৃদয়ে প্রভুর দাদা বিশ্বরূপ প্রবেশ করিয়া, কনিষ্ঠ নিমাইর কার্য্যের সহায়তা করিতেন।

সেখান হইতে কামকোটী, কামকোটী হইতে দক্ষিণ মথুরায় আইলেন। কৃতমালা নদীতে স্নান করিয়া এক রাম ভক্ত ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণে তাহার বাড়ী প্রভু উপস্থিত হইলেন। ইনি সুধু রামভক্ত নন, রামের নামে একেবারে পাগল। ব্রাহ্মণ কিছু পাক করিতেছেন না দেখিয়া প্রভু বলিলেন, "কি ঠাকুর কৈ আমার ভিক্ষা কই, পাক করিতেছেন না কেন?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "পাক কি করিব? এ বনে সামগ্রী কোথায়? লক্ষণ বনে গিয়াছেন। তিনি যাহা কিছু আনেন তাহা আনিলে সীতা পাক করিবেন।" প্রভু দেখিলেন, যে ব্রাহ্মণ আপনাকে শ্রীরাম ভাবিতেছেন। সে যাহা হউক, ব্রাহ্মণের চেতন হইল, তিনি পাক করিয়া তৃতীয় প্রহরে প্রভুকে ভিক্ষা দিলেন।

সেই ব্রাহ্মণ উপবাস করেন, যে হেতু তাহার দুঃখ যে রাবণ সীতাকে স্পর্শ করিয়াছিল। প্রভু যখন রামেশ্বর তীর্থে আইলেন সেখানে এক পুঁথিতে দেখিলেন যে রাবণ যে সীতা হরণ করে সে মায়া সীতা, প্রভু সেই পাতা নকল করিয়া তাহা প্রতীতার্থে সেই পুরাতন পাতাখানা লইয়া সেই ব্রাহ্মণকে আনিয়া দিয়া তাহার চিরজীবনের দুঃখ মোচন করিলেন।

প্রভু রামনাদে আসিয়া সেখানে রামের চরণ দেখিয়া মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাহার পরে রামেশ্বরে, রামেশ্বর শিব দর্শন করিলেন। বহুতর

পণ্ডিত উদাসীন সেখানে বাস করেন। তাহার মধ্যে যিনি বড় পণ্ডিত তিনি অবশ্য বুদ্ধং দেহি বলিয়া উপস্থিত। প্রভু তখনি পরাজয় স্বীকার করিলেন। বলিলেন, তোমার সহিত বিচারে আমি পারিব কেন? তুমি আমাপেক্ষা খুব বড় পণ্ডিত। প্রভুর এরূপ বিনয় দেখিয়া সে একটু স্তম্ভিত হইল, হইয়া ভাবিতে লাগিল। প্রভু তাহা দেখিয়া বলিতেছেন, সন্ন্যাসী ঠাকুর ভাবিতেছ কি? বিচার ছাড়, যাহাতে ভগবচ্চরণে প্রীতি হয়, তাই কর। বিচারে অহঙ্কার বৃদ্ধি, আর অহঙ্কার বৃদ্ধি হইলে, দর্পহারী ভগবান আছেন, বুঝলে? বলিতে বলিতে প্রভু আবেশিত হইলেন। আর সেই অবস্থায় নৃত্য করিতে করিতে :—

পড়িল চৈতন্য প্রভু আছাড় খাইয়া।
পাথরের ধারে গেল থুতনি কাটিয়া॥
দরদর রক্ত ধারা পড়িতে লাগিল।
যতনে পণ্ডিত বর তাহা মুছাইয়া দিল॥

সেখানে তিন দিন থাকিয়া তাহাদিগকে ভক্তি দিয়া বামে মাধ্বি [illegible] গমন করিলেন। শুনিলেন সেখানে একজন উচ্চশ্রেণীর সন্ন্যাসী আছেন। প্রকৃতই তিনি একজন যোগ সিদ্ধ। অতি বৃদ্ধ, শ্বেত শ্মশ্রুতে হৃদয় ঢাকিয়াছে, উলঙ্গ, বসিয়া আছেন? ধ্যানস্থ, মুখে কোন শব্দ নাই। বসিয়া আছেন বৃক্ষ তলে, সেই তাহার ঘর। প্রভু তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহার ধ্যান ভাঙ্গিল না। তিন দিন এরূপে গেল। সন্ন্যাসী এইরূপ তিন দিন ধ্যানস্থ থাকেন, পরে সহজ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কিঞ্চিৎ ফলমুল আহার করেন, করিয়া জীবন ধারণ করেন। সন্ন্যাসী যে দিন প্রথম ধ্যানস্থ হয়েন, প্রভু সেইদিন গিয়াছিলেন। তাই তিনি তিন দিন রহিলেন, সন্ন্যাসী চেতন পাইলে, অমনি প্রভু কথা কহিতে লাগিলেন। কি যে কথা হইল গোবিন্দ তাহার কিছু বুঝিতে পারিলেন না।

দুই চারি কথা কহি যোগী মহাজন।
"চাম্পনি শিঙড়ি" বলি হাসিল তখন॥
চাম্পনি শিঙড়ি বলি অতি শুদ্ধ মনে।
হাসিয়া প্রণাম করে প্রভুর চরণে॥
প্রতি নমস্কার করি মোর গোরা রায়।
আনন্দে ভাসিয়া তবে কৃষ্ণগুণ গায়॥

যখন সেই যোগীবর প্রভুকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন, তখন অন্যান্য সন্ন্যাসীগণ তটস্থ হইয়া প্রভুকে কাযেই প্রণাম করিলেন। প্রভু সেখানে সাত দিন ছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কি করিলেন কি বলিলেন জানিতে পারি নাই।

তখন মাঘ মাস, প্রভু বৈশাখে নীলাচল ত্যাগ করেন, এবং দশ মাসে রামেশ্বর আইলেন। আর পরের মাঘে নীলাচল প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দশ মাসে রামেশ্বর আইসেন তাহার প্রমাণ এই যে মাঘিপূর্ণিমায় তাম্রপর্ণীর কোলায় প্রভু স্নান করেন। তাহার পরে চৈতন্য চরিতামৃত সংক্ষেপে এইরূপ প্রভুর তীর্থ দর্শন বর্ণনা করিতেছেন।

তথা আসি স্নান করি তাম্রপর্ণি তীরে।
নব ত্রিপদি দেখি বুলে কুতুহলে॥
চিয়ড়তালা তীর্থে শ্রীরাম লক্ষণ।
তিলকাঞ্চি আসি কৈল শিব দরশন॥
গজেন্দ্র মোক্ষণ তীর্থে দেখি বিষ্ণু মূর্ত্তি।
পানাগড়ি তীর্থে আসি দেখি সীতাপতি॥
চামতপুর আসি দেখি শ্রীরাম লক্ষণ!
শ্রীবৈকুণ্ঠে বিষ্ণু আসি কৈল দরশন॥
মলয়া পর্ব্বতে কৈল অগস্ত্য বন্দন।
কন্যা কুমারী তাহা কৈল দরশন॥

তাহার পরে আমলকি তলাতে রাম দেখিয়া পরে পয়স্বিনী তীরে, সেখান হইতে আদি কেশব মন্দিরে গেলেন। আর সেখানে সেই অমূল্য গ্রন্থ "ব্রহ্ম সংহিতা" পাইলেন।

আবার বলিতেছেন :—

পলাক্ষী আসিয়া দেখে শঙ্কর নারায়ণে।
সিংহারি মঠ আইল শঙ্করাচার্য্য স্থানে॥
মৎস্য তীর্থ দেখি কৈল তুঙ্গভদ্রা স্নানে।

গোবিন্দের কড়চায় পাই যে, প্রভু পলাক্ষিতে শিব নারায়ণ দেখিয়া শঙ্করাচার্য্যের মঠে শঙ্করের শিষ্যগণকে বিচারে পরাস্ত করিয়া, মৎস্য তীর্থে, পরে কাচাড়ে, তাহার পরে নাগ পঞ্চনদীতীরে, তাহার পরে চিতানে, পরে তুঙ্গভদ্রা তীরে, পরে কোটি গিরিতে, শেষে চণ্ডপুরে গেলেন।

প্রভু কন্যা কুমারীতে সমুদ্র স্নান করিয়া বড় একদল সন্ন্যাসীর সহিত পঞ্চদশ ক্রোশ হাটিয়া, সাতল পর্ব্বতে গমন করিলেন। সেখানে একজন শেঠী আসিয়া সকল সন্ন্যাসীকে দুগ্ধ আটা দিলেন। সে এক দিন ছিল। যখন দেশের প্রত্যেক শতের মধ্যে পঁচাত্তর জন পরিশ্রম করিত আর পচিশ জন তাহাদের দ্বারা পালিত হইয়া ধর্ম্ম যাজন করিতেন। এই সন্ন্যাসীগণের সহিত প্রভু মিলিত হইলেন না, কেন, তিনি জানেন। তবে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ত্রিবাঙ্কুর দেশে প্রবেশ করিলেন। সে দেশের লোক পরম হিন্দু, তাহারা অতিথীকে অভ্যর্থনা না করা মহা পাপ মনে করিত। রাজার নাম রুদ্রপতি, ভারি ঐশ্বর্য্যশালী, বদান্যতা ও সেইরূপ! সে দেশে অতিথীর ত কোন দুঃখ নাই। আবার নগরের তিন স্থানে রাজার ব্যায়ে তিনটী অন্নছত্র আছে। সেখানে যে যতদিন ইচ্ছা থাকিতে পারে। লোকে সকলে রাজার সুখ্যাতি করে। বলে রাজা যেমন প্রজা পালক তেমনি ভক্ত। সন্ধ্যাকালে প্রভু ত্রিবাঙ্কুরে গমন করিলেন। যাইয়া এক

বৃক্ষতলে প্রফুল্ল অন্তঃকরণে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। তখনি একজন ভাগ্যবন্ত লোক আহারীয় আনিয়া দিল।

প্রাতে যেরূপ হইয়া থাকে সেইরূপ হইল, অর্থাৎ প্রচার হইল যে, এক অপরূপ সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। ক্রমে লোক জুটিতে লাগিল। আর সকলে দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়া জোড় হস্তে সম্মুখে দাঁড়াইা রহিল। প্রভু বসিয়া আপন মনের ভাবে আপনি গরগর রহিলেন।

নয়নের কোণ বহি অশ্রুধারা পড়ে।
লোমাঞ্চিত কলেবর পুলক অন্তরে॥

একটু পরে গ্রাম্য লোক স্তব স্তুতি আরম্ভ করিল, পরে বাড়ী লইবার জন্য অনুনয় বিনয়, কেহ সেখানেই আহারীয় আনিতে লাগিল। কিন্তু প্রভু ভাবে বিভোর নয়ন মেলিলেন না। শেষে তর্ক প্রয়াসী একজন আইলেন, তিনি অবশ্য ব্রহ্মবাদী। ক্রমে নগরে মহা কলরব হইল। রাজা শুনিলেন। তখন প্রভুকে আনিতে দূত পাঠাইলেন। রাজদূত প্রভুকে ধরিয়া লইয়া যাইবে সেই ভাব করিল। প্রভু যাইতে অস্বীকার, রাজদূত বলিলেন, সন্ন্যাসী তুমি বড় নির্ব্বোধ, রাজা ডাকিতেছেন, তোমার ভাগ্য, তুমি গেলে প্রচুর অর্থ পাবে। প্রভু বলিলেন আমার অর্থের প্রয়োজন নাই। আমি সন্ন্যাসী, আমার বিষয়ীর সহিত সংসর্গ করিতে নাই। দূত প্রভুকে সরলভাবে ভাল পরামর্শ দিতেছিল। তাহাতে ধন্যবাদ পাইল না, বরং রুক্ষ কথা শুনিল, কাযেই ক্রুদ্ধ হইল। দূত বলিল বটে! তোমাকে মজা দেখাইতেছি।

এই কথা বলি তবে দূত করি ক্রোধ।
রাজ দ্বারে চলি গেল দিতে প্রতিশোধ॥

দূত যাইয়া প্রভুর নামে নানা কথা বলিলেন। যাহা প্রভু বলেন নাই তাহাও বলিলেন। কিন্তু রাজা ক্রুদ্ধ না হইয়া কৌতুহলাক্রান্ত হইলেন। সন্ন্যাসীর সম্বল কৌপীন, তিনি রাজা, সেই সন্ন্যাসী তাহাকে গ্রাহ্য করিল

না, এরূপ তিনি কখন দেখেন নাই। এরূপ সন্ন্যাসী আছেন তাহার বিশ্বাস ছিল না।

সন্ন্যাসী হেরিতে চলে রাজা রুদ্রপতি।
ভক্তি ভরে বাহিরিয়া আসে শীঘ্রগতি॥
হস্তী অশ্ব তেয়াগিয়া অতি দূর দেশে।
সন্ন্যাসীর সঙ্গে আসে অতি দীন বেশে॥
দুই চারি মন্ত্রি সহ রাজা মহাশয়।
প্রভুর নিকটে আসি ভক্তি ভরে কয়॥
জোড় হস্তে রুদ্রপতি কহে বার বার।
দয়া করি অপরাধ ক্ষমহ আমার॥
না বুঝিয়া ডাকিয়াছিলাম আপনারে।
সেই অপরাধ মোর ক্ষম এইবারে॥
জ্ঞান শিক্ষা দেহ মোরে অধম তারণ।

রাজার সঙ্গে আবার ধর্ম্ম শাস্ত্র বেত্তাও দুই চারিজন, পণ্ডিত আছেন। রাজা বৈষ্ণব এবং ভাগবতে পণ্ডিত। প্রভু বলিলেন, রাজা তুমি বড় ভাগ্যবান, তুমি ভাগবতী, আমার নিকট আবার কি জ্ঞান চাও? আমি জ্ঞান জানি না, আমি জানি কেবল—রাধাকৃষ্ণ। যেই প্রভু রাধাকৃষ্ণের নাম লইলেন অমনি যাহা হইবার তাহা হইল ঃ—

লইতে কৃষ্ণের নাম প্রেম উপজিল।
দরদর অশ্রু ধারা পড়িতে লাগিল॥
কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত প্রভু অমনি উঠিয়া।
নাচিতে লাগিল দুই বাহু পসারিয়া॥
গোরা হরিবোল বলে অজ্ঞান হইয়া।
নাচিতে নাচিতে পড়ে আছাড় খাইয়া॥

পাছাড়িয়া রাজা তবে প্রভুরে তুলিল।
সেই সঙ্গে মহারাজ মাতিয়া উঠিল॥
হরি বলি মহারাজ নাচিতে লাগিল।
নয়নের জলে তার হৃদয় ভাসিল॥
লোমাঞ্চিত কলেবর পুলকে পুরিল।
ধূলায় পড়িয়া অঙ্গে ধূসর হইল॥
দেখিয়া রাজায় ভক্তি আমার নিমাই
কোল দিয়া রাজারে বলেন এস ভাই॥
হরি নামে যার চক্ষে বহে অশ্রু ধারা।
সেই জন হয় মোর নয়নের তারা॥
দেখিয়া তোমার ভক্তি রাজা মহাশয়।
জুড়াল আমার প্রাণ জানিহ নিশ্চয়॥

প্রভু সেখান হইতে শীঘ্র বিদায় হইলেন, কারণ, রুদ্রপতি রাজা! প্রতাপরুদ্র নীলাচলে এইরূপ প্রভুকে একবার স্পর্শ করিয়াছিলেন, তাই প্রভু বলিয়াছিলেন, ছি! আমার বিষয়ীর স্পর্শ হইল। কিন্তু রুদ্রপতির সহিত আর এক ভাব কেন? ইহার কারণ, প্রতাপরুদ্রের সহিত সেরূপ ব্যবহার করা প্রয়োজন ছিল, কারণ সেখানে তাঁহার থাকিতে হইবে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি প্রভু কোট গিরি ত্যাগ করিয়া চণ্ডপুরে গমন করিলেন। তাহার বামে সত্যগিরি পর্ব্বত রাখিয়া প্রভু নগরে গেলেন, যাইয়া বটবৃক্ষ তলে বসিলেন। কারণ সেখানে একটী বড় সন্ন্যাসী আছেন অন্তর্য্যামী প্রভু তাহা জানিয়াছেন, ও তাঁহাকে কৃপা করার ইচ্ছা আছে। সেই সন্ন্যাসীর সহিত দেখা হইল। তাহার এক কর্ণে সোণার কুণ্ডল, সন্ন্যাসীর নাম ঈশ্বর ভারতী। তিনি আসিয়া প্রভুর নিকট মায়াবাদ তত্ত্ব কহিতে লাগিলেন। লোকটী ভাল, সরল, ইচ্ছা প্রভুর কি মত তাহা শ্রবণ করেন।

কথা কি প্রভুকে দর্শন মাত্র তাহার মনে এক নূতন ভাবের উদয় হইয়াছে, সেটি এই যে, এই নূতন সন্ন্যাসী তাহা অপেক্ষা অনেক উন্নত। আবার প্রভু যেমন যাইতেছেন, প্রভুর সুখ্যাতি অগ্রে অগ্রে চলিতেছে। সুখ্যাতি এইরূপ যে, একজন পরম রূপবান্, পরম পণ্ডিত ও পরম ভক্ত সন্ন্যাসী দেশ সমেত লোককে হরিবোলা করিতেছেন, আর তাঁহার প্রতাপে দেশে পাপী তাপী আর থাকিতেছে না। অতএব তাহার নিকট তাহার এরূপ শক্তির কারণ জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। সে কথা সরল ভাবে জিজ্ঞাসা করিলে পারিতেন। কিন্তু মনে অভিমান আছে, তাহা পারিলেন না। তর্ক উঠাইয়া প্রকারান্তরে প্রভুর সাধন ভজন কি, ও তাহার ভিত্তিভূমি কি, ইত্যাদি জানিয়া লইবেন। অবশ্য প্রভু সন্ন্যাসীর মনের ভাব বেশ বুঝিতেছেন। তাই সন্ন্যাসীর কথায় কোন উত্তর না দিয়া, চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। আপনাদের মনে আছে যে একদিন শচী জননীর ইচ্ছা হইয়াছিল যে, নিমাইকে কথা বলাইবেন কারণ নিমাইর কথা যেন মধু হইতে মধু। সেইজন্য বালক নিমাইকে কথা বলাইয়া কর্ণ তৃপ্ত করিবেন, তাই নিমাইকে কথা বলাইবার নানা চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ধূর্ত্ত নিমাই তাহা বুঝিয়া মোটে কথা বলে না। এ সম্বন্ধে একটি কবিতাও আছে। বড় পিড়াপিড়ি করিলে নিমাই কেবল মাথা নাড়িতে ও হাসিতে লাগিল। তখন শচী রাগ করিয়া হাতে ঠেঙ্গা ধরিলেন, আর নিমাই দৌড় মারিল।

এখানে তাহাই হইতেছে। প্রভু সন্ন্যাসীঠাকুরের মনোগত ভাব বুঝিলেন, তাই চুপ করিয়া রহিলেন। প্রভু যদি কোন উত্তর দিলেন না অথচ অল্প অল্প হাসিতে লাগিলেন। তখন শচী যেরূপ করিয়াছিলেন, সন্ন্যাসী তাই করিলেন। অবশ্য ঠেঙ্গা ধরিলেন না, তবে ক্রোধ করিলেন, করিয়া প্রভুকে নানা মন্দ বলিতে লাগিলেন।

অল্প হাসিল প্রভু মুখ ফিরাইয়া।
ভাল মন্দ নাহি কহে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বিরক্ত হইয়া অবশেষে ন্যাসীবর॥
প্রভুকে কহেন তুমি নাহি কহ বাণি।
সুপণ্ডিত বলিয়া তোমারে নাহি মানি॥

এখানে কড়্চা হইতে উদ্ধৃত করিতে বড় ইচ্ছা হইতেছে। সন্ন্যাসী বলিতেছেন।

সুপণ্ডিত বলিয়া তোমারে নাহি মানি।
সর্ব্বলোকে বলে তুমি বড়ই পণ্ডিত।
মুহি দেখি জ্ঞান নাহি তোমার কিঞ্চিত॥
দেশ শুদ্ধ হরিবোলা করিয়াছ তুমি।
তোমার কিঞ্চিত গুণ নাহি দেখি আমি॥
শুনেছি শাস্ত্রজ্ঞ কিন্তু মুখে নাহি কথা।
ভ্রমিয়া বেড়াও ভিক্ষা করি যথাতথা॥
বিদ্যা নাহি জ্ঞান নাহি বিচার করিতে।
তবে কেন মূর্খ লোকে ভোলে আচম্বিতে॥
কি জানি কেমন ছলে কৌশল করিয়া।
সূক্ষ্মতত্ত্ব সর্ব্বলোকে দেও দেখাইয়া॥
এ দেশের মূর্খলোকে হরিবোলা করি।
কেমনে বাইবে তুমি বুঝিব চাতুরী॥
শক্তি যদি থাকে তবে করহে বিচার।
এইবারে বুদ্ধিশুদ্ধি বুঝিব তোমার॥
এত বলি ভারতী গোসাঞি দৌড় দিল।
তিন সঙ্গী সহ পুনঃ আসিয়া মিলিল॥

চারিজনে বসিল প্রভুর চারিভিতে।
এই রঙ্গ দেখি প্রভু লাগিল হাসিতে॥
ভারতী বলিল তুমি উড়াও হাসিয়া।
মুহি যাহা বলি তাহা দেখ আলোচিয়া॥

ভারতী বলিতেছেন, এই তিন জন মধ্যস্থ রহিলেন। তুমি আমাকে বুঝাইয়া দাও যে আমাদের উপাস্য কে?

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে প্রভু কখন বা কাহাকে ব্যঙ্গ করিয়া বশীভূত করিতেন, তাহার উদাহরণ এই একটি দেখুন; প্রভু তখন রহস্য ভাব ছাড়িয়া দিলেন, দিয়া গম্ভীর ভাবে বলিতে লাগিলেন। হে পণ্ডিত! আমি বিচার জানি না, তাহাতে আবার তুমি অত বড় পণ্ডিত, তোমার নিকট আমি শত বার হারি মানিলাম।

চাহ যদি জয়পত্র লিখে দিতে পারি।
তোমার বিচারে আমি মানিলাম হারি॥

যোগীর বিচার ইচ্ছা নয়, জয়ও ইচ্ছা নাই। তাহার প্রার্থনা জ্ঞান উপার্জ্জন, তাই কাতর ভাবে প্রভুর পানে চাহিতে লাগিলেন। তখন প্রভুর দয়া হইল। প্রভু বলিলেন "আমি ভগবান্", "আমিও যে তিনিও সে" এ সমুদায় দম্ভ ত্যাগ কর। করিয়া সেই মধু হইতে মধু যে ভগবান তাঁহাকে ভজনা কর। তাহা হইলে শান্ত হইবে, সুখ পাইবে। ইহা বলিয়া প্রভু কৃষ্ণকথা, অর্থাৎ কৃষ্ণের মাধুর্য্য বর্ণনা আরম্ভ করিলেন। একে কৃষ্ণের কথা, তাহাতে আবার প্রভুর মুখে কাযেই সুধাবৃষ্টি আরম্ভ হইল। ভক্তগণ অবশ্য জানেন যে যাহার ভক্তি উদয় হয় তাহার সমুদায় লাবণ্যময় হয়, ও স্বর মধু হয়। আবার এরূপ অবস্থাপন্ন ভক্তের মুখে কৃষ্ণ নাম কি মধু, তাহা যিনি শুনিয়াছেন তিনি জানেন। তাই পদ, "কেবা শুনাইল শ্যাম নাম?" তাই পদ "লইতে কৃষ্ণ নাম জিহ্বা নাচে অবিরাম।" প্রভু

কৃষ্ণ কথা কইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে বিভাবিত হইলেন। (যেমন প্রাচীন পদে আছে।)

রাইধ্বনি কৃষ্ণকথা কইতে ছিল।
কথা কইতে কইছে মুরছিল॥

সেইরূপ কৃষ্ণকথা কইতে প্রভুর কথা ঘন হইয়া আসিল, গদগদ হইলেন, বলিতে জান বলিতে পারেন না, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন। পরে কাজেই কৃষ্ণকথা বন্ধ হইল।

পড়িতে লাগিল অশ্রু হৃদয় বাহিয়া।
কৌপিনে গ্রন্থি ক্রমে যাইল খসিয়া॥
থর থরি হৃদ্ কম্প শরীর ঘামিল।
কৃষ্ণ বলি ডাক দিয়া টলিতে লাগিল॥
কৃষ্ণ হে কোথায় আজ প্রভু দয়াময়।
ভক্তি বিতরিয়া কর বিশুদ্ধ হৃদয়॥
এই কথা বলি প্রভু কান্দিতে লাগিল।
মনের আবেগ ক্রমে দ্বিগুণ বাড়িল॥
ভাল মন্দ কথা নাহি শুনে বিশ্বম্ভর।
ফুলে ফুলে কান্দিতে লাগিল বিশ্বম্ভর॥
তমালের বৃক্ষ এক সমুখে দেখিয়া।
কৃষ্ণ বলি ধেয়ে গিয়া ধরে জড়াইয়া॥

তখন যোগী প্রভুর চরণে পড়িলেন। বলিতেছেন আমি বিচার চাই না, আমি জয় চাই না, আমি ভক্তি চাই। প্রভু আর তখন সে সমুদায় কিছু শুনিতে পাইতেছেন না। তবে,

অশ্রুজলে প্রভু মোর পৃথিবী ভিজায়।
মহা ভাবাবেশে অঙ্গ স্তম্ভিত হইল।
সোণার দোসর দেহ ধুলায় পড়িল॥

কৃষ্ণ বলি পৃথিবীতে প্রভু গড়িযায়।
ধুলায় ধুসর অঙ্গ বিন্ধিল কাটায় ॥

প্রভুর অল্প বাহ্য হইল, দেখিলেন সন্ন্যাসী ব্যাকুল হইয়া কান্দিতেছেন। তখন পৃষ্ঠে হাত দিয়া বলিলেন, কৃষ্ণ তোমায় কৃপা করুন। প্রভু সন্ন্যাসীকে স্পর্শ করিয়া এ কথা বলিতেই তাঁহার প্রেমোদয় হইল।

কেমন প্রভুর কৃপা কহনে না যায়।
প্রেমে মত্ত হয়ে যোগী ধূলায় লুটায় ॥
যোগী বলে তুমিই আমার কৃষ্ণ হবে।

মহাত্মাগণকে ভক্তগণ স্তুতি করিয়া থাকেন, বলেন, তুমি পরম ভক্ত, তুমি ভগবানের কৃপার পাত্র ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু প্রভুকে এরূপ স্তুতি কেহ করিত না। যিনি স্তুতি করিতেন, তিনি বলিতেন তুমিই সেই কৃষ্ণ, তুমিই সেই ভগবান। কারণ তাঁহার সঙ্গলাভ করিলেই মনে এই ভাব হইত যে, ইনি মনুষ্য হইতে বড়।

প্রভু সেই স্থান ত্যাগ করিবেন, ঈশ্বর ভারতী আসিতে দিবেন না। বলিতেছেন, "আমি তোমায় ভক্তিডোরে বাঁধিয়া রাখিব, যাইতে দিব না।"

ঈশ্বর ভারতী তবে এতেক বলিয়া।
জোরে টানাটানি করে খড়ম ধরিয়া।
প্রভু বলেন কৃষ্ণে তোমার এতেক বিশ্বাস।
আজি হতে তব নাম হইল কৃষ্ণদাস।

প্রভুর আশ্রয় লইলেই, যে এরূপ ভাগ্যবান তাহার নাম পরিবর্ত্তিত হয়, নাম প্রভু স্বয়ং রাখেন, আর নাম প্রায়ই কৃষ্ণদাস, না হয় হরিদাস এইরূপ।

প্রভুর ভক্তের মধ্যে হরিদাস ও কৃষ্ণদাস নামধারী অসংখ্য লোক ছিলেন। তবে বিশেষ লোকের বিশেষ নাম রাখা হইত, যেমন রূপ আর সনাতন,

এই নাম প্রভু দুই ভাইকে দর্শন মাত্রে অর্পণ করেন। প্রভু চণ্ডীপুর ত্যাগ করিয়া দুই দিবস জনমানব শূন্য পর্ব্বত দিয়া চলিলেন।

কেবল কদম্ব বৃক্ষ দেখি সারি সারি।

দুই জনে চলিতেছেন, ইহার মধ্যে দেখেন ব্যাঘ্র জলপান করিতেছে, গোবিন্দ উহা দেখিয়া ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া প্রভুর নিকট ঘনাইয়া গেলেন ও শব্দ না করিয়া প্রভুকে ইঙ্গিত দ্বারা উহা দেখাইয়া দিলেন।

মোর ভাবগতি দেখি ঈষৎ হাসিয়া।
বলে তুমি ভয় কর কিসের লাগিয়া॥
হরিনাম বলে নাহি রহে যম ভয়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাক না কর সংশয়॥

গোবিন্দ বলিতেছেন, ইহা প্রভুর মুখে শুনিয়া আমি নির্ভীক হইলাম। ব্যাঘ্র কিন্তু উহাদিগকে দেখিতে পায় নাই। আর একদিকে চলিয়া গেল, পরে তাঁহারা এক দরিদ্র পল্লীতে গমন করিলেন। প্রভুকে এক বৃক্ষতলে বসিতে দেখিয়া গোবিন্দ এক অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর বাড়ী ভিক্ষা করিতে গেলেন। ব্রাহ্মণ বলেন, আমার দিবার কিছুই নাই, কিন্তু তাই বলে অতিথি ফিরাইতে পারি না, আপনি অপেক্ষা করুন্। ইহা বলিয়া ব্রাহ্মণ ভিক্ষায় বাহির হইলেন, একটু পরে দুটা নারিকেল আনিয়া দিলেন, সেই সে দিনকার আহার হইল। সন্ধ্যাকালে প্রভু তাহাদের বাড়ীতে গমন করিলেন, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী উভয়ে করযোড়ে প্রভুর অগ্রে দাঁড়াইলেন। ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, আমরা অতি দরিদ্র, আমার ঠাকুর গোপাল আছেন, ভিক্ষা করিয়া তাঁহার সেবা করি। আমি এরূপ দরিদ্র যে বসিতে আসন দিব, তাহাও আমার নাই। হঠাৎ মনে হইতে পারে যে, প্রভু জানিয়া শুনিয়া এরূপ দরিদ্রের বাড়ী কেন গমন করিলেন, কিন্তু কারণ ছিল। ব্রাহ্মণ যখন বলিলেন যে, বসিতে যে দিব তাহার আসনখানি

পর্য্যন্ত নাই, তখন ব্রাহ্মণী বলিতেছেন, "ঠাকুর! তুমি আসন আর কি দিবে, মাথা পেতে দাও, দেখিতেছ না স্বয়ং গোপাল আসিয়াছেন। ভোগ আর কি দিবে, শ্রীপাদপদ্মে তুলসী চন্দন দাও।" ব্রাহ্মণ তাহাই করিতে গেলেন, কিন্তু প্রভু করিতে দিলেন না, তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন, করিয়া বলিতেছেন, দেখ আমি সামান্য মানুষ, এই তুলসী চন্দন গোপালকে দাও। বিপ্র বলেন, ভাল তুমি আমাদের ন্যায় মানুষ, কিন্তু সন্ন্যাসী ঠাকুর আমাকে বল দেখি :—

তব অঙ্গে সৌদামিনী খেলা করে কেন।
তব দেহে পদ্মগন্ধ অনুমানি হেন॥
তুমি যদি ভগবান নহ দয়াময়।
তবে কেন তব অঙ্গে পদ্ম গন্ধ কয়?

এই যে প্রভুর অঙ্গে সর্ব্বদা পদ্ম গন্ধের কথা ও সৌদামিনী খেলার কথা, ইহা গোবিন্দ বারম্বার বলিয়াছেন। পদ্মগন্ধ সর্ব্বদায়, সৌদামিনী মাঝে মাঝে প্রকাশ পাইত। যে ভাগ্যবান, যেখানে প্রভুর আপনাকে লুকাইবার কোন কারণ নাই, সেখানে ঐ বিদ্যুল্লতা অতি জাজ্বল্যরূপে প্রকাশ হইত।

প্রভু ত্রিবাঙ্কুর ত্যাগ করিয়া ক্রমে মহারাষ্ট্রীয় দেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সেখানে অনেকগুলি অদ্ভুত লীলা করেন। প্রভু গুর্জ্জরী নগর ছাড়িয়া পুনা যাইবেন মনস্থ করিলেন। কিন্তু তাহা না করিয়া একবারে বিজাপুরে গেলেন। সেখান হইতে পাণ্ডুপুরে বা পাণ্ডারপুরে গমন করিলেন, যেখানে তাঁহার অগ্রজ বিশ্বরূপ অতি আশ্চর্য্যরূপে নিত্যধামে চলিয়া যান। শিবানন্দ সেন তখন সেখানে ছিলেন। তিনি দেখিলেন বিশ্বরূপের আত্মা সহস্র সূর্য্যের ন্যায় দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল। তাহা দেখিয়া শিবানন্দ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

বহুকাল হইল যখন আমরা বোম্বাই নগরে থিওসোফিষ্টগণের অতিথি হইয়া, তাহাদের সাধনপদ্ধতি শিখিতেছিলাম, তখন কেবল প্রথম তাঁহারা আসিয়াছেন, একটী পার্সি ব্যতীত আর কাহারও সঙ্গে তাঁহাদের আলাপ হয় নাই। একদিন তাঁহাদের প্রাচীর-পরিবেষ্টিত একটা বাঙ্গলার বারান্দায় আমি ও অল্‌কট সাহেব একটী মান্দুরে শয়ন করিয়া গল্প করিতেছিলাম। ইহার মধ্যে শুনিলাম যে কীর্ত্তন হইতেছে। "কীর্ত্তন" হইতেছে কেন বলি? কারণ খোল করতাল বাজাইতেছিল, কীর্ত্তনের সুরে গীত গাওয়া হইতেছিল, আখর দেওয়া হইতেছিল। মোটামুটী আমাদের দেশে যেরূপ কীর্ত্তন হয়, ঠিক সেইরূপ শুনিলাম। প্রথমে লক্ষ করি নাই, পরে যেন কর্ণে নিতাই গৌরের নাম শুনিলাম। তখন চমকিয়া উঠিলাম, ভাবিলাম এ আবার কি ব্যাপার, অনুসন্ধান করিতে হইবে, যাইয়া দেখি তাহারা চলিয়া গিয়াছে, আর তাঁহাদের ঠিকানা পাইলাম না। ইহাতে একটু বিমর্ষ হইলাম, কিন্তু এ কথাটী আমাদের বরাবর মনে রহিয়া গেল।

এখন শ্রীযুক্ত রামযাদব বাগচী, তিনি দেহ রাখিয়াছেন, কিরূপে গৌরভক্ত হইলেন তাহা তিনি এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার বাটী শ্রীনবদ্বীপে, কিন্তু ইংরাজি পড়িয়া পণ্ডিত হইয়া কিছু মানিতেন না। তাঁহার দক্ষিণদেশে ইলোরার গহ্বর দেখিতে ইচ্ছা হয়। এই গহ্বরের মধ্যে প্রাচীন নানাবিধ ভগ্নপ্রায় মন্দির আছে, যাহা দেখিতে পৃথিবীর অনেক লোক সেখানে গিয়া থাকেন। প্রভু এখন যেখানে বেড়াইতেছেন অর্থাৎ পাণ্ডুপুর, তাহারি নিকটে ইলোরা। রামযাদব বাবু কষ্টে শ্রষ্টে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। দেখেন কি সেখানে একটী শ্রীরাধাকৃষ্ণের মন্দির আছে, আর সন্ধ্যার সময় সেই মন্দিরে আরতি হইতেছে।

কিন্তু আর এক কাণ্ড দেখিয়া তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তিনি

দেখিতেছেন যে, সেই বিগ্রহের সম্মুখে আমাদের দেশীয় খোল করতাল লইয়া ঐ দেশীয় কয়েক জন বৈষ্ণব সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিল। আমাদের সঙ্কীর্ত্তন বলার তাৎপর্য্য এই যে, যদিও সে কীর্ত্তন-ভাষা স্বতন্ত্র, কিন্তু তবু উহার অন্যান্য আকৃতি ঠিক আমাদের সঙ্কীর্ত্তনের মত। রামযাদব বাগচী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কীর্ত্তন শুনিতেছেন। এমন সময় সেই কীর্ত্তনের মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গের নাম শুনিলেন। ইহাতে তাঁহার শরীর বিস্ময়ে কাঁপিয়া উঠিল। এই নিবিড় জঙ্গলে, এই বহু দূরদেশে, এই খোল করতাল, এই কীর্ত্তন, আর আমাদের নবদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণ কুমারটীর নাম কিরূপে আইল ? এই ভাবিতে ভাবিতে রামযাদব বাবু বিভোর হইলেন।

কীর্ত্তনান্তে বৈষ্ণবগণের নিকট ইহার তথ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু তাহারা কিছুই বলিতে পারিল না। তখন রামযাদব বাবুর এই সংকল্প হইল যে, ইহার তথ্য না জানিয়া যাইবেন না। এই উদ্দেশে সেখানে রহিয়া গেলেন। দুই দিবসের অনুসন্ধানে একটি প্রাচীন বৈষ্ণব পাইলেন, যিনি ইহার তথ্য বলিলেন। তিনি বলিলেন যে, তোমাদের বাড়ী যে বঙ্গদেশে সেই বঙ্গদেশ হইতে এই খোল করতাল ও এই কীর্ত্তন আসিয়াছে। কিরূপে আইল ইহা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "তোমাদের দেশের যিনি চৈতন্যদেব তিনি এই মন্দিরের সম্মুখে নৃত্য করিয়াছিলেন। সেই হইতে এই বঙ্গীয় কীর্ত্তন ইত্যাদি এখানে আসিয়াছে, আর অদ্যাপি আছে।"

এ কিরূপ অদ্ভুত কাণ্ড একবার বিচার করুন। চারি শত বর্ষ পূর্ব্বে পথে যাইতে যাইতে সেই ইলোরার মন্দিরের সম্মুখে শ্রীগৌরাঙ্গ নৃত্য করিয়াছিলেন, আর সেই কথা, সেই তরঙ্গ অদ্যাপি আছে। একবার এই বিষয়টী অনুভব করুন, তবে বুঝিবেন যে রামযাদব বাবু কি ভাবে মোহিত হইলেন। "এখানে তোমাদের চৈতন্যদেব ত্য করিয়াছিলেন।"

বৈষ্ণব ইহাই বলিলেন। কেবল নৃত্য করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার ধর্ম্মের বীজ বপন করা হইয়াছিল। রামযাদব বাবু ভাবিলেন, তাঁহার বাড়ী শ্রীনবদ্বীপে, তিনি গৌরাঙ্গের কিছুই তথ্য জানেন না। আর এই ইলোরায় তাঁহাকে পূজা করে। ইহাই ভাবিয়া তাঁহার ধিক্কার হইল। আর তখন তিনি গৌরাঙ্গ প্রভুকে তল্লাস করিতে লাগিলেন। তল্লাস করিতে গিয়া প্রায় যাহা হইয়া থাকে তাহাই হইল, অর্থাৎ তিনি বান্ধা পড়িলেন।

প্রভু পাণ্ডুপুর বা পাণ্ডারপুর গেলেন। এ অতি পবিত্র স্থান, ভীমা-নদীর ধারে, যাহাকে দেশীয় লোকে গঙ্গা বলেন। এখানে অনেক সন্ন্যাসী বাস বা আসা যাওয়া করেন। এখানে তুকারামের বাস ছিল, যে তুকারাম মহারাষ্ট্রীয় দেশ ভক্তিতে প্লাবিত করেন। এখন এই তুকারামের কাহিনী শ্রবন করুণ। বহুদিন হইল যখন আমি পুনা নগরে গমন করি, তখন কথায় কথায় এক ভদ্র মজলিসে শ্রীগৌরাঙ্গের নাম করিয়াছিলাম, তাহাতে বম্বে প্রদেশের অতি প্রধান পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান, শ্রীযুক্ত মহাদেব রাণাডে বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, তোমাদের যেমন চৈতন্য আছেন, আমাদের তেমন তুকারাম আছেন। সকলেই আপনার আপনার দ্রব্য বড় দেখে। তুকারামের মাহাত্ম্যের কথা যদি তুমি জানিতে তবে আর তোমার চৈতন্যকে বড় বলিতে না।

শ্রীযুক্ত রাণাডে মহাশয়ের কথায় আর কি উত্তর দিব, কিন্তু তুকারামের কথা আমি সেই প্রথম শুনিলাম। ইহাতে কাজেই তুকারামের বিষয় অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। অনুসন্ধান দ্বারা জানিলাম, যে তুকারাম যদিও সর্ব্ব মহারাষ্ট্রে পূজিত, তবুও অতি নীচ জাতীয়। তিনি রাধাকৃষ্ণ ভক্ত, কোলাপুরের সাতারা ও পুনার নিকট ভীমানদীর তীরস্থ পাণ্ডুপুরবাসী ছিলেন। সেখানে শ্রীকৃষ্ণের আর এক মূর্ত্তি বিট্ঠলদেব আছেন, তাঁহাকে পূজা করিতেন। তাঁহার প্রেম অকথ্য, আর শিষ্য অগণন,

তিনি বিট্‌ঠলের সম্মুখে গীত গাহিতেন ও নৃত্য করিতেন। সেই গীতগুলিকে আভঙ্গ বলে।

তিনি যেমন গীত গাহিতেন, অমনি তাঁহার ভক্তগণ উহা লিখিয়া রাখিতেন। তাহাতে তুকারামের আভঙ্গ বলিয়া একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হয়।

আর শুনিলাম তুকারাম ভজন করিতে করিতে সশরীরে রথে আরোহণ করিয়া সর্ব্ব সমক্ষে বৈকুণ্ঠে আরোহণ করেন। অদ্যাপি পুনা দেশের পণ্ডিতগণ ব্যতীত প্রায় অনেকেই তাঁহার শিষ্য। পুনা নগরে তুকারাম সম্বন্ধে এই কাহিনী শুনিলাম। তাঁহার কয়েক বৎসর পরে ভারত বিখ্যাত পণ্ডিত বিশ্বনাথ নারায়ণ মণ্ডলিক আমার সহিত দেখা করিতে আইসেন। তাঁহার নিকট আমি তুকারামের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। পণ্ডিত বিশ্বনাথ ইংরাজি ও সংস্কৃত বিদ্যায় পরম পণ্ডিত। তিনি তুকারামের সংবাদ কিরূপে জানিবেন, তিনি কিছু বলিতে পারিলেন না। যাহা হউক তিনি কৃপা করিয়া তুকারামের একখণ্ড আভঙ্গ আমাকে আনাইয়া দিলেন। এখানি বড় গ্রন্থ, মুদ্রিত হইয়াছে। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় লিখিত বলিয়া আমরা বুঝিতে পারিলাম না। যাহারা বুঝেন তাহাদের নিকট আভঙ্গের অর্থ করিয়া লইতে লাগিলাম।

দেখিলাম যে তুকারাম আমাদের গোষ্ঠি। ব্রজের নিগূঢ় রসের অধিকারী, ইহাতে নিতান্ত বিস্মিত হইলাম।

তখন ভাবিলাম তুকারাম এরস কোথায় পাইলেন? এত শ্রীগৌরাঙ্গের পথ, ইহাত "অনর্পিত", ইহা ত অন্য স্থানে গোচর নাই, তুকারাম কি শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপা পাত্র?

তাহার পরে তুকারামের আভঙ্গে তিনি কিরূপে গুরুর নিকট কৃপা পায়েন তাহার বিবরণ দেখিতে পাইলাম। সেটী এই,—

সদ্‌গুরু রায়েন কৃপা মুঝো কেলি।

পরি নাহি ঘটলি সে ওয়া কাঁহি।
সাপড় বিলে ওযাটে যাতা গঙ্গাস্নান।
মণ্ডকি তুজান ঠেকাইল কর।
ভোজন মাগতি তুপ পাওসের।
পড়িল বিসর স্বপ্না মাজি।
কাঁহি করে উপজলা আগুরায়।
মানোনিয়া কাজ তরা গাজি।
রাঘব চৈতন্য কেশব চৈতন্য।
সাঙ্গিতলি খুন মাড়ি কেচি।
বাবাজি আপলে সাঙ্গিতলে নমোঙ্গ।
মন্ত্র দিলা রাম কৃষ্ণ হরি।
মাঘ শুক্ল দশমী পাহুনী গুরুবার।
কেলা অঙ্গিকার তুকা ভনে।

এই অভঙ্গের মোটামুটী বঙ্গানুবাদ করিতেছি—

প্রভু গুরু তিনি আমায় করিলেন কৃপা।
কিন্তু আমাহতে তাঁহার নাহি হলো সেবা॥
আমি যেতোছনু করিবারে গঙ্গাস্নান।
মোর শিরে প্রভু কর করিলা প্রদান॥
প্রভু মোরে চেয়েছিল ঘৃত আর অন্ন।
আমি দিতে নারিনু হয়ে ছিনু অচেতন॥
কিছু নাহি জানি পরে কিবা ঘটেছিল।
কোন কার্য্যের তরে প্রভু কোথা চলি গেল॥
রাঘব চৈতন্য আর কেশব চৈতন্য।
তাঁর কথা বলি দেখাইল এক চিহ্ন॥

বাবাজি বলিয়া বলিল নিজ নাম।
রামকৃষ্ণ হরিনাম করিলেন প্রদান ॥
মাঘ শুক্ল দশমী গুরুবার দিনে।
প্রভু কৃপা মোরে কৈল তুকারাম ভনে ॥

এখন ইহার পরিষ্কার অর্থ করিতেছি। তুকা নিজের কাহিনী এইরূপ বলিতেছেন। একদিন মাঘ মাসে বৃহস্পতিবারে শুক্ল দশমী তিথিতে আমি গঙ্গা। ভীমাকে পাণ্ডুপুরে গঙ্গা বলে) স্নানে যাইতেছিলাম। ইহার মধ্যে প্রভু দর্শন দিলেন। দিয়া আমার মাথায় হস্ত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, তাহাতে আমি অচেতন হইলাম। আমাকে রাম কৃষ্ণ হরি এই তিনটী নাম দিলেন। আর কি সঙ্কেত করিলেন, আর রাঘব চৈতন্য কেশব চৈতন্য বলিলেন। আর আপনাকে বাবাজী বলিলেন, প্রভু আমার নিকট তণ্ডুল ও ঘৃত চাহিলেন। কিন্তু তিনি আমার মস্তকে হস্ত দিলে আমি অচেতন হইয়া পড়ি, তাহার পর চেতন পাইয়া দেখি যে, স্বেচ্ছাময় প্রভু নিজের কার্য্যের নিমিত্ত কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। এই নিমিত্ত তাঁহার সেবা করিতে পারিলাম না।

তুকারাম যে প্রভুর সেবা করিতে পারেন নাই, তণ্ডুল ও ঘৃত দিতে পারেন নাই, সেই ক্ষোভ চিরদিন তাঁহার হৃদয়ে জ্বলন্ত অনলের ন্যায় ছিল।

তুকারাম বলিতেছেন যে, তাঁহার প্রভু হরি কৃষ্ণ রাম এই তিনটি নাম দিয়াছিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই শ্রীগৌরাঙ্গের মহামন্ত্র যাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব জপ করেন, সেটি এই ঃ—

হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে ॥

প্রকৃতপক্ষে গৌরাঙ্গের মহামন্ত্র হরি কৃষ্ণ ও রাম এই তিনটি নাম। তুকারাম যে রূপ কৃপা প্রাপ্ত হন, শ্রীগৌরাঙ্গ ঐ রূপে অনেক সময় ভক্ত-

গণকে কৃপা করিতেন তাহা সকলে জানেন। বিশেষতঃ যখন দক্ষিণদেশে ভ্রমণ করেন, প্রভু তখন কেবল স্পর্শ করিয়া জীবকে সমুদায় শক্তি সঞ্চার করিতেন। যথা, চরিতামৃতে—

নবদ্বীপে যেই শক্তি না কৈল প্রকাশ।
সে শক্তি প্রকাশি নিস্তারিল দক্ষিণদেশ॥

কৃপাময় পাঠক, দেখিবেন যে, প্রভু এইরূপে কৃপা করিতে করিতে আসিতেছেন, এইরূপে প্রভু পাণ্ডুপুর তুকারামের স্থানে গমন করিলেন। এই যে মহাভাগবত সৃষ্টি করিতে করিতে প্রভু যাইতেছেন, তাহারা অনেকে তিনি যে কে, কোথা বাড়ী, কি নাম, কিছুই জানিতে পারিলেন না। প্রভু "কৃষ্ণ কেশব পাহিমাং রাম রাঘব রক্ষমাং" বলিতে বলিতে যাইতেছেন। এমন সময় ভীমানদীতীরে তুকারামকে দেখিলেন। প্রভু তাহাকে দেখিয়া মাথায় হস্ত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন ও কর্ণে হরেকৃষ্ণ মন্ত্র দিলেন। তাহার সঙ্গে যে ভক্তটি ছিলেন, বোধ হয় তিনি তণ্ডুল ও ঘৃত চাহিয়া থাকিবেন। আর সেই ভৃত্য হয়ত বলিয়া থাকিবেন, যে প্রভুর নাম কৃষ্ণচৈতন্য। কিন্তু প্রভু যখন তুকারামকে স্পর্শ করিয়া কর্ণে মন্ত্র দিলেন, তখন তিনি অচেতন হইয়া পড়িলেন। ভৃত্যের কাছে শুনিলেন প্রভুর নাম কৃষ্ণচৈতন্য, আর প্রভুর মুখে রাম রাঘব কৃষ্ণ কেশব শ্লোক শুনিলেন। ইহাতে বাবাজীর নাম কেশবচৈতন্য কি রাঘবচৈতন্য এইরূপ কি হইবে সাব্যস্ত করিলেন। বস্তুতঃ এক সন্ন্যাসীর দুই নাম হইতে পারে না। তুকারাম অচেতনাবস্থায় যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহাতে সাব্যস্ত করিলেন যে তাহাতে তাহার প্রভুর নাম, হয় রাঘবচৈতন্য, নয় কেশবচৈতন্য হইবে। বিশেষতঃ সাধুগণের বাবাজি আখ্যা কেবল বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে, আর কোথায় নয়।

আর একটু বিস্তার করিয়া বলি। তুকা বলিতেছেন যে গুরুর সহিত

থে দেখা হয়, দেখা হইলে তিনি আমার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ রেন, তাহাতেই আমি অচেতন হই।

এ গুরু কে? এ শক্তি কেবল মহাপ্রভু জগতে দেখাইয়া য়াছেন।

গুরুর কাছে কি তত্ত্ব শিখিলেন? শিখিলেন ব্রজের নিগূঢ় রস, যাহা গতে পূর্ব্বে ছিল না। বৈষ্ণবগণের শ্রীরামানুজ প্রভৃতি চারি সম্প্রদায়, ই রস অপর কোন সম্প্রদায়ে নাই, কেবল মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ে আছে, তরাং এ গুরু, হয় মহাপ্রভু স্বয়ং, না হয় তাঁহার কোন ভক্ত।

তিনি কে?

তুকা। তাঁহাকে চিনি না, একবার মাত্র তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম। দখিয়াই অচেতন হই, এমন কি তিনি যে চাউল আর ঘৃত চাহেন াহা দিতে পারি নাই।

একটু ঠাহরিয়া দেখ দেখি তিনি কে বলিতে পার কি?

তুকা। তিনি আমাকে তিনটী নাম দেন, সে কৃষ্ণ, হরি ও রাম.

এ তিনটী নাম মহাপ্রভুর বহিরঙ্গের পক্ষে মূলমন্ত্র। অতএব ইহাতে বাধ হয় সেই গুরু শ্রীমহাপ্রভু।

আর কিছু মনে পড়ে?

তুকা। তাঁহার নাম শুনিলাম যেন কি চৈতন্য, কেশবচৈতন্য কি াঘবচৈতন্য।

মহাপ্রভুর নাম কৃষ্ণচৈতন্য, সুতরাং নাম শুনিলেও বোধ হয় যে, তুকারামের গুরু আর কেহ নহে মহাপ্রভু। তাহা যদি হইবে তবে তুকা কেশব", "রাঘব" এ দুটী কথা কোথা পাইল? তাহার উত্তর যে াহাপ্রভু "কৃষ্ণ কেশব রক্ষমাং" "রাম রাঘব রক্ষমাং" বলিতে বলিতে পথে যাইতেন।

তুকা। যেন তাঁহার আর এক নাম শুনিলাম, "বাবাজী"।

এই বাবাজী শব্দ কেবল বাঙ্গালায় প্রচলিত বৈষ্ণব ভক্তগণকে বুঝায়। অতএব এই গুরু বাঙ্গালী।

ভাল, তোমরা কোন সম্প্রদায়ে বৈষ্ণব?

তুকা। আমরা চৈতন্য সম্প্রদায়ের।

এখন দেখুন জগতে চৈতন্য এক বই নাই। আমরা দেখিতেছি যে মহাপ্রভু সেই সময় সেই পাণ্ডারপুর গিয়াছিলেন, আর আমরা দেখিতেছি তিনি এইরূপে আচার্য্য সৃষ্টি করিতে করিতে যাইতেছিলেন।

কেহ বলেন যে তুকা মহাপ্রভুর পরে প্রকাশ হয়েন, খুব সম্ভব ইহা ভুল। আর যদি তাহা না হয়, তবে সেই তুকার গুরু প্রভুর কোন ভক্ত তার সন্দেহ নাই। তাহা না হইলে তিনি চৈতন্য সম্প্রদায়ে ভুক্ত হইতেন না।

তুকারাম দিবানিশি প্রেমানন্দে মত্ত থাকিতেন, আর সেই অবস্থায় বিট্‌ঠলদেবের অগ্রে নৃত্য ও তখনি রচনা করিয়া গীত গাহিতেন। তুকারাম ও তাঁহার শিষ্যগণ আপনাদিগকে চৈতন্য সম্প্রদায় বলিয়া পরিচয় চিরদিন দিয়া আসিতেছেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ দ্রুতবেগে অগম্য দক্ষিণদেশ ভ্রমণ করিলেন। যেখানে উপযুক্ত পাত্র দেখিতেন, সেখানে তাহাকে কৃপা করিতেন, যদি সে পথের মাঝে না থাকে তবে পথ ত্যাগ করিয়া বিপথ দিয়া তাহার নিকট যাইয়া তাহাকে কৃপা করিতেছেন। প্রভুর সময় অতি অল্প, দুই এক বৎসরের মধ্যে সমুদায় দক্ষিণদেশে ভক্তি ধর্ম্ম প্রচার করিতে হইবে। তাই যখন অন্তর্যামী প্রভু জানিলেন যে কোন স্থানে একটী বিষবৃক্ষ আছে সেই স্থানে যাইয়া, সেই প্রকাণ্ড বৃক্ষটী কর্ত্তন করিয়া সেই স্থানে একটী অমৃত বৃক্ষ রোপণ করিতেছেন। প্রভু শিশু বৃক্ষ ত্যাগ করিয়া যাহাতে বীজ হইয়াছে এইরূপ বড় বড় বৃক্ষের নিকট যাইতেছেন। শিশু বৃক্ষেতে বীজ ফলে না,

ক্ষেত্র বৃক্ষে বীজ ফলে। উপযুক্ত পাত্র দেখিলে তাহাকে আশ্চর্য্য শক্তি দিতেছেন।

এইরূপে ভুবন-পাবন আচার্য্য সৃষ্টি করিতে করিতে দক্ষিণদেশে ভ্রমণ করিলেন। প্রভু কেবল স্পর্শ করিয়া হৃদয়ে যে ব্রজের রস প্রবেশ করাইতেন, ইহা অমানুষিক শক্তি। মূর্খ নীচ জাতি তুকারাম প্রভুর স্পর্শ পাইল, আর তাহার হৃদয়ে সমস্ত উজ্জ্বল নীলমণির রস স্ফুরিত হইল ইহা অমানুষিক শক্তি সন্দেহ নাই।

পাণ্ডুপুর হইতে অল্প দূরে ইলোরা প্রাচীন মন্দির সমূহ, সেখানে শ্রীকৃষ্ণের মন্দির আছে, প্রভু সেখানে গমন করেন, রামযাদব বাবু সে মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। আর সেখানে তিনি কি জানিতে পারিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। চরিতামৃত সংক্ষেপে এইরূপ বলিয়াছেন, যথা—

কোলাকুল লক্ষ্মী দেখি ক্ষীর ভগবতী।
লাঙ্গা গণেশ দেখি চোরা ভগবতী॥
তথা হইতে পাণ্ডুপুর আইল গৌরচন্দ্র।
বিট্‌ঠল ঠাকুর দেখি পাইল আনন্দ॥

আমরা একটু অগ্রে বলিয়াছি যে তুকারাম যেরূপ পুনর্জন্ম লাভ করিলেন তাহা জানিলেই মনে হয় যে, এ প্রভুর কার্য্য অন্যের নহে, অন্য এরূপ শক্তি দেখাইতে পারেন নাই। ভক্তিভাজন বৃন্দাবনের পুরন পণ্ডিত ও ভক্ত শ্রীমধুসূদন গোস্বামী আমাকে এই পত্রখানি লিখিয়াছিলেন। "আমাদের শ্রীমন্মহাপ্রভু কখন কি করিতেন তাহা কাহাকেও বলিতেন না। কোথায় কি করিয়া আসিয়াছেন তাহাও বলিতেন না। সুতরাং তাহার অনেক লীলা অপ্রকাশ আছে। কিন্তু আমাদের এই পশ্চিম দেশে মহাপ্রভুর একটী শাখা আছে। তাঁহারা বলিয়া থাকেন আমরা থানেশ্বরী শ্রীজগন্নাথের পরিবার। এই থানেশ্বরী গ্রামটী কুরুক্ষেত্রের

নিকটাবস্থিত তাহা জানেন। থানেশ্বরী জগন্নাথের বংশধর লোকেরা এই আখ্যায়িকা বলিয়া থাকেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু থানেশ্বর যাইয়া শ্রীজগন্নাথ পণ্ডিতের দরজার সম্মুখে একটী বৃক্ষমূলে তিন দিন তিন রাত্রি উপবেশন করিয়াছিলেন। জগন্নাথ, শঙ্করমতানুযায়ী বেদান্তের পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কাহাকে গ্রাহ্য করিতেন না, বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময় অথবা বাড়ী আসিবার সময় প্রভুকে দেখিয়া একটু হাসিয়া চলিয়া যাইতেন। শ্রীপ্রভু ও নেত্র নিমীলন করিয়া হরিনাম করিতেন, আর কাহার সহিত কথা কহিতেন না। গ্রামের সহস্র সহস্র লোক প্রভুকে ঘিরিয়া বসিয়া থাকিত ও সঙ্গে সঙ্গে নাম করিত, তাহা দেখিয়া পণ্ডিতের আরো হাসি পাইত। পণ্ডিতপ্রবর যখন প্রভুকে দেখিয়া হাসিয়া যাইতেন, প্রভু সেই সময় পণ্ডিতের দিকে সজল নয়নে দৃষ্টিপাত করিতেন। পণ্ডিত যদিও বিদ্যাদর্পে হাসিতেন, কিন্তু প্রভুর দৃষ্টিপাত সময় তাঁহার মন কেন অস্থির হইত, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেন না, তিনি প্রভুকে হাসিয়া যাইবার সময় একটী কথা বলিয়া যাইতেন, সেটী এই, "অহংব্রহ্মোহস্মি।" কেবল মাত্র তিন দিনের মধ্যে কয়েকবার প্রভুর কৃপা দৃষ্টি লাভ করিয়াও শ্রীমুখের হরিনাম শ্রবণ করিয়া চতুর্থ দিবসের প্রাতঃকালে তাঁহার পূর্ব্বকার যে বাক্য "অহংব্রহ্মোহস্মি" উহা পরিত্যাগপূর্ব্বক যোড়হস্তে ক্রন্দন করিয়া, "তত্ত্বমসি তত্ত্বমসি" বলিতে বলিতে প্রভুর পাদপদ্মে শরণাপন্ন হইলেন। প্রভু তাঁহাকে কৃপা করিয়া শ্রীবৃন্দাবন যাইতে আজ্ঞা দিয়া অন্যত্র যাত্রা করিলেন, পণ্ডিতও প্রভুর বিরহে কাতর হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে আসিলেন এবং তথায় শ্রীমদ্রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর আশ্রয়ে রহিলেন। অদ্যাপি তাঁহার বংশধরগণ পশ্চিমোত্তর প্রদেশের নানাস্থানে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দোহাই দিয়া জীবোদ্ধার করিতেছেন।"

এইরূপ জীবোদ্ধার পদ্ধতি দেখিলেই প্রভুর কথা মনে পড়ে। প্রকৃত

ই কাহিনী তুকারামের কাহিনীর সহিত অনেক ঐক্য হয়। তুকারামের াণ দক্ষিণে আর থানেশ্বরী জগন্নাথের গণ উত্তরে। তুকারামের গণেরা লেন তাঁহারা চৈতন্য সম্প্রদায়। জগন্নাথের গণেরাও তাহাই বলেন। তুকারামকে প্রভু অন্যের অগোচরে কৃপা করেন, জগন্নাথকেও তাহাই। ল আবার বলি, ঐ কৃপাপদ্ধতি দেখিলে, বোধ হয় যে মহাপ্রভুর কাণ্ড। চবে প্রভু যে থানেশ্বরে গিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না। হয়ত গয়াছিলেন। ইহাও হইতে পারে, জগন্নাথকে তাহার নিজগ্রামে নয়, তবে বৃন্দাবনের পথে কোন স্থানে কৃপা করিয়া থাকিবেন।

মনে থাকে যে, প্রভু যুবতী ভার্য্যা বৃদ্ধ মাতা ছাড়িয়া আসিয়াছেন। তিনি শ্রীভগবানের পদ ত্যাগ করিয়া কৌপীন পরিয়াছেন। তিনি রাজরাজেশ্বরের সেবা পাইতেছিলেন, তাহা ছাড়িলেন। তিনি এখন দক্ষিণদেশে হাটিয়া চলিয়াছেন। উপবাসে, অনিদ্রায়, পথশ্রান্তে দেহ শীর্ণ। যখন দক্ষিণে গমন করেন ভক্তগণ জিজ্ঞাসিলেন কেন যাইতেছ? বলিলেন আমার দাদার তল্লাসে। কিন্তু উদ্দেশ্য কেবল জীবের মঙ্গল। সেই জীব তাঁহাকে আদর করিতেছে না, তাহাতেও তাহার দৃক্‌পাত নাই। সেই জীব তাহাকে মারিতে চাহিতেছে, তাহাতেও তাহার প্রতি তাঁহার, মমতা কমিতেছে না। তিনি কৃপা করিলেন, করিয়া পাছে তাঁহাকে জানিতে পায়, তাই দৌড় মারিয়া পলাইলেন। বড় ভয়, পাছে তিনি কে, তাহা জানিতে পারে, পাছে কেহ তাহাকে ধন্যবাদ দেয়, পাছে কেহ তাহার প্রতিষ্ঠা করে, এই সকল ভাবিয়া,—

সাধে কি তার লাগি ঘুরিয়া মরি।
না জানি কত তার ধার ধারি॥

অনেক সময় প্রভুর এই কৃপাপদ্ধতিতে একটু রহস্য রস দেখা যাইত। এইরূপে তিনি শিখিমাহিতীকে কৃপা করেন। তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যে

প্রভু তাঁহাকে দেখিয়া হাসিলেন, এইরূপে তুকারামের মাথায় হাত দিয়া তাহাকে পাগল করিয়া পলায়ন করিলেন। তুকারাম চেতন পাইয়া আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না।

কিন্তু পাণ্ডুপুর আসিবার পূর্ব্বে প্রভু অনেক মধু হইতে মধু লীলা করেন। প্রভু গুর্জ্জরী নগরে আইলেন, আসিয়া দেখিলেন সেখানে বহু অট্টালিকা ও অসংখ্য কুণ্ড। প্রভু সেখানে স্নান করিয়া একটি কুণ্ডতীরে বসিয়া হরিগুণ গাহিতে লাগিলেন। লোক জুটিতেছে, দাঁড়াইয়া শুনিতেছে, মোহিত হইতেছে, বলিতেছে "একি মধু? কৃষ্ণনাম এত মধু? সন্ন্যাসী ঠাকুর তোমার মুখে হরিনাম বড় মধুর।" কিন্তু প্রভুর মুদিত নয়ন, বাহ্যজ্ঞান মাত্র নাই।

চক্ষু মুদি গোরাচাঁদ ঢুলিতে লাগিল।
নয়ন ফাটিয়া অশ্রু আসি দেখা দিল॥
লোকজন নাহি দেখে মোর গোরারায়।
কৃষ্ণহে বলিয়া কান্দি মৃত্তিকা ভিজায়॥
ফোপারি ফোপারি প্রভু কান্দিতে লাগিল।
বাধন খুলিয়া পৃষ্ঠে জটা এলাইল॥
লোমাঞ্চিত কলেবর কান্দিয়া আকুল।
আলুথালু বেশে প্রভু কহে নানা ভুল॥
কভু প্রভু মত্ত হয়ে গড়াগড়ি যায়।
আছাড়ি আছাড়ি কভু পড়য়ে ধরায়॥
ঐ মোর প্রিয়সখা মুকুন্দ মুরারি।
এই বলি ধেয়ে যান চৈতন্য ভিখারী॥
কখন বলেন এস প্রাণ নরহরি।
কৃষ্ণনাম শুনি তোরে আলিঙ্গন করি॥

এইভাবে নানা কথা কহে গোরারায়।
ভাবে মত্ত হয়ে প্রভু ছুটিয়া বেড়ায়॥
আশ্চর্য্য প্রভাব শুনি যত মহাজন।
প্রভুর সমীপে সব করে আগমন॥

গোবিন্দ এ কথা যখন দেশে ফিরিয়া মুরারি, নরহরি ও মুকুন্দের নিকট বলিয়াছিলেন, তখন তাহারা কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন, তাহা বুঝা যায়। প্রভু তাহাদের বিরহে কান্দিয়াছিলেন, কি ভাগ্য! অর্জ্জুন নামক একজন মহাপণ্ডিত সেখানে বসিয়া সব দেখিতেছেন কিন্তু তিনি তবু কোমল হইলেন না, তিনি যুদ্ধ চাহিতে লাগিলেন। তাহাকে প্রভু কৃপা করিয়া স্পষ্ট করিয়া বলিলেন যে, তাহার শুষ্ক বিদ্যা ফেলিয়া ভগবানের ভজন করিলে তাহার প্রকৃত মঙ্গল হইবে। ইহা বলিয়া প্রভু কৃষ্ণকে ডাকিলেন, এমনি ভাবে ডাকিলেন যেন কৃষ্ণ সম্মুখে, এমনভাবে ডাকিলেন যে সে ভাবে কেবল তিনিই ডাকিতে পারেন। গোবিন্দ বলিতেছেন :—

"প্রভুর মুখে কতবার ডাক শুনিয়াছি, কিন্তু আজকার মত কৃষ্ণকে আহ্বান কখন শুনি নাই।" তখন সেখানে যে কাণ্ড হইল তাহা গোবিন্দের বর্ণনায় কিছু জানিতে পাওয়া যায়। যেন স্ত্রীপুরুষ সকলে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইলেন।

সেখানে তখন যেন বৈকুণ্ঠ হইল।
দলে দলে গ্রাম্য লোক আসি দেখা দিল॥
শত শত লোক চারিদিকে দাঁড়াইয়া।
হরিনাম শুনিতেছে নিঃশব্দ হইয়া॥
নাম শুনিবারে যেন স্বর্গে দেবগণ।
মাথার উপর আসি করিছে শ্রবণ॥
ছুটিল পদ্মের গন্ধ বিমোহিত করি।
অজ্ঞান হইয়া নাম করে গৌরহরি॥

প্রভুর মুখের পানে সবার নয়ন।
ঝর ঝর করি অশ্রু পড়ে অনুক্ষণ॥
বড় বড় মহারাঠী আসি দলে দলে।
শুনিতে লাগিল নাম মিলিয়া সকলে॥
পশ্চাৎ ভাগেতে মুঁই দেখি তাকাইয়া।
শত শত কুলবধূ আছে দাঁড়াইয়া॥
অসংখ্য বৈষ্ণব শৈব সন্ন্যাসী জুটিয়া।
হরিনাম শুনিতেছে বিভল হইয়া॥
এইরূপ হরিনাম করিতে করিতে।
অজ্ঞান হইয়া প্রভু লাগিল নাচিতে॥

তখন হুঙ্কারে গর্জ্জনে সকল মর্ত্ত্যলোককে বিমোহিত করিয়া প্রভু মৃতবৎ অচেতন হইয়া পড়িলেন।

প্রভু অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিলেন আর নগরবাসীগণ তাঁহাকে সন্তর্পণ আরম্ভ করিলেন। অর্জ্জুনের আর বিচার ইচ্ছা রহিল না। প্রভু এরূপ তরঙ্গ উঠাইলেন যে, উপস্থিত ব্যক্তি সকলে তাহাতে ডুবিয়া গেলেন।

সেখান হইতে গুর্জ্জরী, আর গুর্জ্জরী ত্যাগ করিয়া প্রভু বিজয়পুরে গেলেন। এখান হইতে পাণ্ডুপুর বা পাণ্ডারপুরে বিট্ঠল দর্শন করিতে গমন করেন, সে তুকারামের স্থান। সে পর্ব্বত হইতে নামিয়া কুলাচলে আরোহণ করিলেন। অবশেষে পুণানগরে প্রবেশ করিলেন।

বাঙ্গালায় যেমন নবদ্বীপ, দক্ষিণে সেইরূপ পুণা। সেখানে অচ্ছসর সরোবরের তীরে একটী বৃহৎ বকুলতলায় প্রভু বসিলেন; সেখানে অধ্যাপক ও পড়ুয়ার মেলা হয়, যেমন নবদ্বীপে গঙ্গাতীরে হইত। প্রভুকে দেখিয়া যেমন হয়ে থাকে, বিস্তর লোক জুটিতে লাগিল। প্রভুর

মাথায় জটা, পরিধান কৌপীন, গাত্রে ধূলা, উপবাসে শরীর শীর্ণ। আবার তাঁহার সৌন্দর্য্য অমানুষিক, তাঁহাকে দেখিলে লোকের মনে কারুণ্যরসের উদয় হয়, নয়নে জল আইসে। মনে হয় যে, এই গোলকের বস্তুটীকে কুসুমাসনে অতি যত্নপূর্ব্বক বসাইয়া সেবা করা উচিত। কিন্তু ইহার অবস্থা অতি শোচনীয়, দেখিলে হৃদয় যেন বিদীর্ণ হয়।

প্রভু নয়ন মুদিয়া আপনার মনে কৃষ্ণের সহিত কথা বলিতেছেন। বলিতেছেন, "কৃষ্ণ দেখা দাও আমি আর বাঁচি না। আমি কোথায় গেলে তোমায় পাব" ইত্যাদি ইত্যাদি। পণ্ডিতগণ প্রভুর সেই আবেগ শুনিতেছেন ও তাঁহার ভাব দেখিয়া মোহিত হইতেছেন। ইহার মধ্যে একজন, যে জন্যই হউক, বলিয়া উঠিলেন, "সন্ন্যাসী! তুমি কেন ব্যাকুল হইতেছ? তোমার কৃষ্ণ এই জলে লুকাইয়া আছেন।"

এই বাণী শুনি প্রভু চমকি উঠিল।
লোমাঞ্চিত কলেবর উঠে দাঁড়াইল॥
এমন অশ্রুর বেগ কভু দেখি নাই।

প্রভু এরূপ কান্দিতে লাগিলেন যে, উপস্থিতগণের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। সেই পণ্ডিত আবার ঐ কথা বলিলেন, "সন্ন্যাসী কেন কান্দ তোমার কৃষ্ণ এই সরোবরেই আছেন?" এবার প্রভু আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না। হুহুঙ্কার করিয়া জলে ঝাঁপ দিলেন!

লোকে তখন প্রভুর ভাব দেখিয়া,এত আকৃষ্ট হইয়াছেন যে, তাঁহার জলে ঝাঁপ যে তাঁহার মনোগত কার্য্য, কাচপনা নয়, সকলে বুঝিলেন। কাজেই, বহুতর লোক সেই সঙ্গে জলে ঝাঁপ দিলেন। প্রভুকে উঠাইয়া, তখন সকলে সেই পণ্ডিতকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। প্রভু তখন চেতনা পাইয়াছেন। তিনি তখন সেই ভদ্রলোকের পক্ষ হইয়া কথা কহিতে লাগিলেন।

সেখান হইতে প্রভু ভোলেশ্বর গেলেন, প্রকাণ্ড পর্ব্বতের উপরে এক মন্দির, তাহার মধ্যে মহাদেব। তাহার পরে দেবলেশ্বর গমন করিলেন। সেখান হইতে জিজুরী নগরে খাণ্ডবাকে দর্শন করিতে প্রভু চলিলেন। এখানে মুরারিগণ প্রতিপালিত হয়েন। ইহাদের দুর্দ্দশার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যে কন্যার বিবাহ না হয়, তাহার বিবাহ খাণ্ডবার সঙ্গে হয়, ইহারাই মুরারি। খাণ্ডবা মন্দির তাহাদিগকে পালন করেন। আর সেই মুরারিগণ ঠাকুরের সম্মুখে নৃত্যগীত করেন। এই উত্তম উদ্দেশ্যে এই প্রথা প্রচলিত হয়, ইহারা যেন খৃষ্টিয়ানদিগের "নন"। নন দিগের ন্যায় মুরারিগণেরও পতন হইয়াছে, প্রায় সকলেই বেশ্যাবৃত্তি করেন। এমন কি তাহাদের এক পাড়া হইয়াছে, সেখানে ভদ্রলোক যায় না।

ইহাদের কথা শুনিয়াই প্রভুর দয়া উপজিল। দেখুন, প্রভুকে যে সকলে দয়ার ঠাকুর বলে, সে সাধে না। দুঃখ তিনি দেখিতে পারিতেন না। দুঃখ দেখিলে কান্দিয়া উঠিতেন। মুরারিগণের কথা শুনিবামাত্র প্রভুর হৃদয় ব্যথিত হইল। প্রভু ভারতবর্ষের চারিদিকে নগ্নপদে অনাহারে অনিদ্রায় হাটিতেছেন, কেন? কেবল জীবে দয়ার নিমিত্ত। প্রভুর কি কিছু স্বার্থ ছিল? যদি দেখেন যে কোন স্থানে তাঁহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, অমনি সেস্থান হইতে পলায়ন করেন। যদি লোকে বলেন তুমি ভগবান্, অমনি জিভ্ কাটেন। যদি রাজা পদতলে পড়েন, তবে তাহাকে দূর দূর করেন। যে তাহাকে প্রহার করিতে আইসে, আগে তাহাকে আলিঙ্গন করেন। তাই মহাজনেরা প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া বলেন—

কে আর করিবে দয়া পতিত দেখিয়া।
পতিত দেখিয়া কেবা উঠিবে কান্দিয়া॥ বাসুদেব ঘোষ।

গোবিন্দ ভয়ে আকুল; বলেন প্রভু করেন কি, সেখানে যাবেন না; লোকে কি বলিবে? প্রভু সে কথা কর্ণে করিলেন না, একবারে মুরারি

পাড়ায় প্রবেশ করিলেন। কাজেই মুরারিগণ অপরূপ সন্ন্যাসীকে দেখিতে আসিলেন। প্রভুর নির্ম্মল পবিত্র মুখ, তাহার অরুণ করুণ চক্ষু দেখিয়া মুরারিগণের হৃদয়ে ভক্তির উদয় হইল। প্রভুর দর্শনে তাহাদের হৃদয় শুধু ভক্তিতে নয় করুণায় দ্রবীভূত হইল। আর তাহারা অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন, তোমাদের পতি কৃষ্ণ, তোমাদের আর ভাবনা কি? তবে পতিকে বিশুদ্ধ মনে ভজিতে হইবে। ইহা বলিয়া প্রভু কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, শেষে যাহা হইবার তাহা হইল, মুরারিগণ তাহাদের পাপ স্মরণ করিয়া অস্থির হইলেন। তখন উদ্ধারের নিমিত্ত প্রভুর চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। সকলের প্রধান অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী ঐশ্বর্য্যশালী ইন্দিরা বলিলেন—

বৃদ্ধ হইয়াছি মুই কুকর্ম্ম করিয়া।
উদ্ধার করহে মোরে পদধূলি দিয়া॥
ইহা বলি ইন্দিরা ধূলায় লুটি যায়।

পরে প্রভুর কাণ্ড শ্রবণ করুন। যত মুরারি সকলেই ভেক লইলেন, হরিনামে মত্ত হইলেন, একজনও আর কুপথে রহিলেন না। তাহারা এতদিনে প্রকৃতই দেবদাসী হইলেন।

প্রভু চোরানন্দী চলিলেন, সেখানে ডাকাতের বাস। বড় বলবান ডাকাইত। সকলে প্রভুকে সেখানে যাইতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। রামস্বামী বলিলেন, "স্বামী অবশ্য তোমার কোন ভয় নাই, কিন্তু তুমি সেখানে কেন যাও? সেত তীর্থস্থান নয়, তুমি যেও না। কারণ—

যদি কোন অমঙ্গল করে দস্যুগণ।
তোমার বিরহে লোক ত্যজিবে জীবন॥

প্রভু অতি বিনীত হইয়া বলিলেন, প্রয়োজন আছে, তাই যাইতেছি।

তাঁহার কি প্রয়োজন, পরে জানা গেল। সেখানে একটি প্রকাণ্ড বিষবৃক্ষ ছিল, সেটি ছেদন করিতে হইবে, সেই তাঁহার উদ্দেশ্য।

প্রভু গ্রামে প্রবেশ করিতেই একটি বৃক্ষ দেখিলেন, দেখিয়া যেন বিশ্রাম করিতে তাহার তলে বসিলেন। তখন বেলা আন্দাজ এক প্রহর। দস্যুগণ সর্ব্বদা সতর্ক থাকে যে কেহ তাহাদের অজ্ঞাতসারে তাহাদের গ্রামে প্রবেশ করিতে না পারে। এইজন্য প্রহরী নিযুক্ত আছে। তাহারা প্রভুকে দেখিল, দেখিয়া নিকটে আসিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে আর দুএক জন মিলিল। তাহারা আসিয়া প্রভুকে সেখানে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। উত্তর না পাইয়া বলিল যে তিনি এখানে বসিতে পারিবেন না। তাহাদের সর্দ্দারের নিকট তাঁহার যাইতে হইবে। প্রভু মাথা নাড়িয়া যাইতে অস্বীকার করিলেন। কিন্তু প্রহরীগণ জিদ্ করিতে লাগিল, ইচ্ছা যেন বল করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইবে। কিন্তু প্রভুকে যে জোর করিয়া লইয়া যাইবে, সে সাহসও হইতেছে না, কারণ প্রভুকে দেখিয়া তাহাদের একটু নরম হইতে হইয়াছে। পরে তাহারা অভ্যন্তরে যাইয়া সর্দ্দারকে সংবাদ দিল, সর্দ্দারের নাম নারোজী। সে অতিশয় বলবান, ভারি যোদ্ধা, বয়ঃক্রম ষাটি, কিন্তু দেখিতে তাহার অপেক্ষা ন্যূন। সর্দ্দার একটি সন্ন্যাসী আগমনের কথা শুনিয়া দৌড়াইয়া আসিল, এবং প্রভুকে দেখিয়াই স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। দেখিল পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসরের যুবক। তাঁহার বর্ণ কাঁচা সোণার ন্যায়, অঙ্গ দিয়া লাবণ্য চোঁয়াইয়া পড়িতেছে, বদন সুন্দর নির্ম্মল ও চিত্তাকর্ষক। নারোজীর যাহা কখন হয় নাই, এখন তাহাই হইল, অর্থাৎ হৃদয়ে ভক্তির উদয় হইল। তখন সে সাষ্টাঙ্গে প্রভুকে প্রণাম করিল, এবং তাহার দেখাদেখি সমুদয় দস্যুগণ তাহাই করিল।

প্রভু হাঁ না কিছু না বলিয়া নয়ন মুদিয়া বসিয়া আছেন। তখন

নারোজী করযোড়ে ধীরে ধীরে বলিল, "আপনি আমার সঙ্গে ভিতরে আসুন, আপনার আতিথ্য করিব।" প্রভু উত্তর করিলেন যে, তিনি কোথাও যাইবেন না, এই বৃক্ষতলেই থাকিবেন। দস্যুর ইহাতে ক্রোধ করা উচিত ছিল। কারণ তাহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে কেহ পারে, ইহা তাহার জানা ছিল না। কিন্তু সে ক্রোধ করিল না। অনুচরগণকে বলিল যে, তাহারা গোঁসাইর নিমিত্ত দুধ আটা চিনি ইত্যাদি লইয়া এখানে আইসে। অনুচরগণ ইহাতে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তাহাদের কর্ত্তার কাহাকেও এরূপ আদর করা অভ্যাস ছিল না, সুতরাং তাহারা নানা জনে নানারূপ আহার উপস্থিত করিল। গোবিন্দ বলিতেছেন যে, তাঁহার আহারের দ্রব্য দেখিয়া হৃদয় আনন্দে পুলকিত হইল।

কিন্তু প্রভু নয়ন মুদিয়া আছেন, আর নারোজী স্থিরনেত্রে তাঁহার চন্দ্রবদনখানি দেখিতেছেন। যত দেখিতেছেন ততই বিচলিত হইতেছেন। পরে তাহার বাহ্যজ্ঞান প্রায় গেল, যে হেতু মনের ভাব আর গোপন করিতে পারিতেছেন না, যাহা মনে আসিতেছিল তাহাই মুখে বলিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, কত পাপ করিয়াছি? কেন পাপ করিয়াছি? লোকের দ্রব্যাপহরণ করিয়াছি, কত মনুষ্য এই হস্তে বধ করিয়াছি, কেন? স্ত্রীপুত্রের নিমিত্ত? আমারত স্ত্রীপুত্র নাই। আপনার উদরের জন্য, আমি ব্রাহ্মণের ছেলে ভিক্ষা করিয়া দুটা অন্ন সংগ্রহ করিতে পারিতাম। পাপ করিয়া করিয়া জীবন কাটাইলাম, এখন দণ্ড লইবার সময় হইয়াছে। আমি এই যে দণ্ড পাইতে আরম্ভ করিয়াছি। প্রাণের মধ্যে জ্বলিয়া উঠিতেছে। আর, একি বিপদ? আমার হৃদয়ে দয়ামায়া নাই। কিন্তু :—

সন্ন্যাসী দেখিয়া আমার প্রাণ কান্দে কেন?

প্রভু নয়ন মুদিয়া আছেন, পরে উহা হইতে দরদরিত ধারা পড়িতে

লাগিল। ক্রমে প্রভু বিহ্বল হইলেন, ও তখন উঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে আহারীয় সাজান রহিয়াছে, প্রভু তাহার মধ্যস্থানে অচেতন হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তাহাতে দ্রব্যাদি নষ্ট হইতে লাগিল।

দুই চারি জন বলে কেমন সন্ন্যাসী।
ইচ্ছা করি নষ্ট করে খাদ্যদ্রব্যরাশি ॥

নারোজী বলিলেন :—

নষ্ট হইল সব দ্রব্য নাহি কর ভয়।
পুন যোগাইব আমি এই দ্রব্যচয় ॥

এইরূপে :—

অপরাহ্ণ কালে মোর গোরাগুণমণি।
প্রেমে মুরছিত হইয়া পড়িল ধরণী ॥

তখন নারোজী প্রভুর চরণে পড়িলেন, পড়িয়া আশ্রয় চাহিলেন। অগ্রে হাতে যে অস্ত্র ছিল, তাহা টানিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন। বাকি ছিল কৌপীন পরিধান, তাহাও করিলেন। করিয়া সেই প্রকাণ্ড দেহধারী যোদ্ধা, দীনের দীন হইয়া, প্রভুর অগ্রে দাঁড়াইয়া করজোড়ে বলিতেছেন :—

এত দিন চক্ষু অন্ধ ছিল ভ্রান্তিধূমে।
আজি হইতে অস্ত্রশস্ত্র ফেলাইলাম ভূমে ॥
এই মুখে কত জনে কটু বলিয়াছি।
এই হস্তে কত নরহত্যা করিয়াছি ॥

নারোজী তাহার দলস্থ গণকে বিদায় দিয়া বলিলেন, "তোমরা যাও সুপথে গমন কর, আর কুকার্য্য করিও না"। ইহা বলিয়া প্রভুর পশ্চাৎ দাঁড়াইলেন। প্রভু চলিলেন, পশ্চাতে নারোজী চলিলেন। প্রভু নিষেধ করিলেন না। নারোজী ছায়ার মত প্রভুর পশ্চাতে চলিলেন, মুখে

াক্য নাই। নারোজী যে পশ্চাতে আসিতেছেন তাহা প্রভু জানিলেন কনা তাহাও বুঝা গেল না। এই দিন হইতে তাহারা তিন জন হইলেন। প্রভু, গোবিন্দ তাঁহার ভৃত্য ও নারোজী তাহার কি বলিব?—বডি গার্ড। ই চৌরানন্দি যেখানে নারোজী ছিলেন, এখন সেখানে "কিরকি" াপনগর, সেখানে বম্বের লাটসাহেব বাস করেন।

সেখান হইতে খণ্ডলা যাইয়া প্রভু মূলানদীতে স্নান করিলেন। খণ্ডলা-াসীগণ আতিথ্যধর্ম্মের অত্যন্ত পক্ষপাতী।

বড় আতিথেয় হয় যত খণ্ডলিয়া।
টানাটানি করে সবে প্রভুকে লইয়া॥
অবশেষে সকলে বিবাদ বাধাইল।
খুনাখুনি করিবারে প্রস্তুত হইল॥

প্রভু বলিলেন যে ভিক্ষা করিয়া আমার সঙ্গিগণ অন্ন আনিয়াছে ামাদের প্রয়োজন যাহা তাহার অধিক লইবার অধিকার নাই। অতএব াপনারা আমাকে ক্ষমা করুন।

এতবলি প্রভু আর বাক্য না কহিল।
নয়ন মুদিয়া হরি বলিতে লাগিল॥

পরে, প্রেমে বিভোর হইয়া সমস্ত রজনী নৃত্য করিয়া কাটাইলেন, সেই ন সেখানকার যত লোক তাহাদের শিক্ষা। এই এক রজনীর মধ্যে রনাম বিতরণ করিতে হইবে। বহুলোক আসিয়াছিলেন তাহারা াই রজনী প্রভুর ভজনের ফললাভ করিয়া চিরজীবন, এমন কি পুত্র ৌত্রাদি ক্রমে, ভোগ করিতে লাগিলেন। যাহার দর্শনে মন পবিত্র হয় াহার সঙ্গে এক রজনী যাপন করিয়া ফল কি হয়? গৌরাঙ্গ প্রভুর বিত্র বায়ু গাত্রে লাগিলে, যে ফল হয়, তাহাই খণ্ডলাবাসীগণের হইল। রোজী পশ্চাৎ থাকিয়া প্রভুর সেবা করিতেছেন। কিরূপ, না:—

কাছে বসি স্বেদ বারি নারোজী মুছায়।

সেখান হইতে নাসিকে গেলেন, নাসিক ত্যাগ করিয়া দমন নগরে ও দমন ত্যাগ করিয়া পঞ্চদশ দিবস পথে কাটাইয়া সুরাটে উপস্থিত হইলেন। সুরাট হইতে বরোচ, বরোচ হইতে বরদায় গেলেন। সেখানে গোবিন্দের মন্দিরের সম্মুখে বিপদ ঘটিল। এ পর্য্যন্ত আন্দাজ দেড় মাসকাল নারোজী প্রভুর পশ্চাৎ ছায়ার মত চলিয়াছেন। নারোজী প্রভুর সঙ্গে আসিতে থাকিলে প্রভু আপত্তি করেন নাই। তাহার কারণ এই এক বোধ হয় যে, নারোজী ভেক লইয়াছেন, তাহার পরে তাহার যে সময় হইয়া আসিয়াছে, তাহা প্রভু অবশ্য জানিতেন। নারোজী প্রভুর নানা সেবা করিতে করিতে যাইতেছেন, যথা পাদসম্বাহন, বায়ু বীজন, মূর্চ্ছার সময় সন্তর্পন ইত্যাদি।

বরদায় গোবিন্দের মন্দিরের সম্মুখে নারোজীর জ্বর হইল।

তিন দিন পরে সেথা বিপদ ঘটিল।
জ্বর রোগে নারোজীর মরণ ঘটিল ॥
মৃত্যুকালে সম্মুখে বসিয়া গোরারায়।
পদ্ম হস্ত বুলাইল নারোজীর গায় ॥
নারোজী মরণকালে যোড় হাত করি।
চাহিয়া প্রভুর পানে বলে হরি হরি ॥
যেই কালে নারোজীর নয়ন মুদিল।
আপনি শ্রীমুখে কর্ণে কৃষ্ণ নাম দিল ॥
নারোজীরে কোলে করি প্রভু বিশ্বম্ভর।
তমাল তল হইতে করে স্থানান্তর ॥

আপনারা এখন বলুন নারোজীর মৃত্যুর পরে কি গতি হইল? যদি কেহ অন্যের এক কপর্দ্দক হরণ করেন, তবে তাহার নিমিত্ত সে দণ্ডার্হ হয়।

নারোজী বহুতর লোকের সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছেন। যদি কেহ কাহাকে অকারণে আঘাত করে, তবে সে দণ্ডনীয় হয়। নারোজী কত লোকের প্রাণ বধ করিয়াছেন, অতএব নারোজীর কি গতি হইল? এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার তাৎপর্য্য শ্রবণ করুন।

যাঁহারা মহাজ্ঞানী তাঁহারা বলেন যে, কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে, তাহা হইতে অব্যাহতি পাইবার কাহারও যো নাই। অর্থাৎ তুমি তোমার ভাল মন্দের কর্ত্তা। তুমি ইচ্ছা কর ভাল ফল আহরণ করিতে পারিবে ও ইচ্ছা কর আপনার সর্ব্বনাশ করিতে পারিবে। তাহা যদি হইল তবে ভগবান্ কোথা থাকিলেন? ভগবান্‌কে কেন লোকে উপাসনা করিবে? লোকে ভগবানকে অবহেলা করিয়া বলিবে, আমি যদি ভাল হই, তবে তুমি ভগবান্ ক্রোধ করিয়াও কিছু করিতে পারিবে না। আর যদি মন্দ হই, তবে তুমি ভগবান আমাকে রক্ষা করিতেও পারিবে না। তাহা যদি হইল তবে ভগবানকে উপাসনা কেন করিব? এ সমুদায় জ্ঞানীলোক প্রকারান্তরে বলেন যে, আমাদের কর্ত্তা আর কেহ নাই, আমাদের কর্ম্মই আমাদের কর্ত্তা। ভগবদ্ ভজনের প্রয়োজন নাই।

যাঁহারা ভক্ত তাঁহারা বলেন, শ্রীভগবানের আশ্রয় লইলে তিনি কর্ম্ম ধ্বংশ করেন। ইহার মধ্যে কোনটা ঠিক? এই তত্ত্ব নারোজীর জীবনীতে মীমাংসা হইবে।

নারোজী ঠাকুরের ভাব দেখুন। ঠাকুর হরিদাস চিরজীবন কঠোর ভজন করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার হত্যাকারীগণের মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া আসিয়াছেন, আর নারোজী ঠাকুর চিরদিন অর্থের নিমিত্ত মনুষ্য বধ করিয়া আসিয়াছেন। হরিদাসের দেহ লইয়া প্রভু নৃত্য করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে দেহটী তখন মৃত। আর নারোজী জীবিত থাকিতে তাহার দেহ কোলে লইলেন, তাহার গাত্রে পদ্ম হস্ত বুলাইলেন, কর্ণে

কৃষ্ণ নাম দিলেন। প্রবোধানন্দ, প্রভুর দয়া ও শক্তি এই শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—

"ধর্ম্মাস্পৃষ্টঃ সততপরাবিষ্ট এবাত্যধর্ম্মে
দৃষ্টিং প্রাপ্তো নহি খলু সতাং সৃষ্টিষু ক্বাপি নো সন্।
যদ্দত্তং শ্রীহরিরসসুধাস্বাদমত্তঃ প্রনৃত্য
তুচ্চৈর্গায়ত্যথ বিলুঠতি স্তৌমি তং কঞ্চিদীশং॥"

অর্থাৎ—"যে ব্যক্তিকে ধর্ম্ম কখন স্পর্শ করে নাই, যে সর্ব্বদা অধর্ম্মে আবিষ্ট, যে কখন পাপপুঞ্জ-নাশক সাধুজনের দৃষ্টিপথে ও সজ্জন রচিত স্থানে গমন করে নাই, সে ব্যক্তিও যদ্দত্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমরস-সুধার আস্বাদনে মত্ত হইয়া নৃত্য, গীত ও ভূমিতে বিলুণ্ঠন করে, সেই গৌরাঙ্গদেবকে নমস্কার।"

প্রভু জগাই মাধাইকে নিমেষ মধ্যে জাবাধম হইতে, ভক্ত শিরোমণি, করিলেন। নদীয়ার লোকে তাহাতে কি প্রভুকে দুষিয়াছিল? মনে ভাবুন একজন জগাই মাধাই কর্ত্তৃক অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। এমত লোক নদীয়ায় বিস্তর ছিল। তাহারা জগাই মাধাইর উদ্ধার শুনিয়া প্রতিশোধের ইচ্ছায় মনের আনন্দে জগাই মাধাইকে দেখিতে গিয়াছিল। মনে ভাবিয়াছিল যে, যাইয়া তাহাদিগকে বলিবে যে, "কেমনরে ডাকাতি এখন কেমন?" কিন্তু যাইয়া তাহাদিগকে দর্শন করিয়া তাহাদের প্রতিশোধের ইচ্ছা একেবারে লোপ হইয়া গিয়াছিল। যিনি ঘাটে যাইতেছেন, জগাই মাধাই, অমনি তাঁহার চরণে পড়িতেছেন, বলিতেছেন, "জানিয়া কি না জানিয়া যদি আমরা তোমার নিকট অপরাধ করিয়া থাকি আমাদের মাপ কর।" যাহাদের কাছে ইহারা প্রকৃত অপরাধ করিয়াছেন তাহারা তাহাদের তখনকার দশা দেখিয়া আর তাহাদের প্রতি কৃপার্ত্ত না হইয়া পারিতেছেন না, পূর্ব্বকার শত্রুতার নিমিত্ত যে প্রতিশোধ ইচ্ছা তাহা লোপ

হইয়া যাইতেছে। মাধাই যাহার অনিষ্ট করিয়াছে, সে ব্যক্তি তাহার পূর্ব্বকার প্রতাপ ও এখনকার দৈন্য ও দুর্দ্দশা দেখিয়া যখন তাহার প্রতি কৃপার্ত্ত হইতেছে, তখন ভগবান্ কেন হইবেন না? যাহাকে দণ্ড করিবে সে যদি সেই দণ্ড প্রার্থনা করে, তবে তাহার প্রতি ক্রোধ আর থাকে না।

বিদ্যাপতি প্রার্থনা করিলেন যে, "হে প্রভু যখন তুমি বিচার করিবে তখন আমার গুণলেশ পাইবে না, অতএব আমি বিচার চাহি না, আমি করুণা চাই।" আবার বড় লোক ভগবানের ন্যায়পরতার বড় পক্ষপাতী। তাহাদের বিবেচনা করা উচিত, যদি ভগবান বিচারপতি হয়েন, তবে তাহাদের নিজের কি দশা হইবে? ভগবান্ যদি বিচারপতি হইয়া বসেন তবে তোমার আমার কাহার অব্যাহতি নাই, তুমি যে এতবড় লোক তোমারও অব্যাহতি নাই। অতএব আমি আমার ভাল মন্দের কর্ত্তা, শ্রীভগবান নহেন, ইহা বাতুলের কথা, প্রকৃত জ্ঞানীর কথা নয়।

পূর্ব্বে বলিলাম প্রভু নাসিক নগরে গিয়াছিলেন। এখানে স্পূর্পনখার নাসিকা ছেদন হয় বলিয়া ইহা তীর্থস্থান। সেখানে রামের কুটির ও তাহার চরণ চিহ্ন আছে, প্রভু সেখানে গিয়া, (গোবিন্দ বলিয়াছেন)—

অবশেষে মোর কণ্ঠ আকড়ি বাঁধিয়া।
কোথা মোর রাম বলি উঠিল কান্দিয়া॥
পদ্ম গন্ধ বহিতেছে প্রভুর শরীরে।
সমীরণ বহিতে লাগিল ধীরে ধীরে॥
কি কব প্রেমের কথা কহিতে ডরাই।
এমন আশ্চর্য্য ভাব কভু দেখিনাই॥
কৃষ্ণ হে বলিয়া ডাকে কথায় কথায়।
পাগলের ন্যায় কভু ইতি উতি চায়॥

কি জানি কাহাকে ডাকে আকাশে চাহিয়া।
কখন চমকি উঠে কি যেন দেখিয়া ॥
উপবাসে কেটে যায় দুই একদিন।
অন্ন না খাইয়া দেহ হইয়াছে ক্ষীণ ॥

সেখানে লক্ষণ স্থাপিত গণেশ আছেন। সেই নিবিড় জঙ্গলের গুহায় প্রভু একা বসিয়াছেন। গোবিন্দ ভিক্ষা নিমিত্ত গিয়াছেন, নারোজী দূরে ফল আহরণ করিতেছেন।

ধীরে ধীরে গোবিন্দ সেখানে আইলেন। দেখেন যে জঙ্গলে আলো দেখা যাইতেছে, ইহাতে তিনি প্রভুর নিকট নিঃশব্দে আসিতে লাগিলেন, দেখেন কি ঃ—

ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে বনের ভিতর।
চক্ষু মুদি কি ভাবিছে গৌর সুন্দর ॥
অঙ্গ হতে বাহির হতেছে তেজরাশি।

তেজ দেখিয়া গোবিন্দের নয়নে ধাধা লাগিল, তিনি গুটি গুটি আরো নিকট যাইতে লাগিলেন, যাইয়া এক ধারে দাঁড়াইলেন।

পদ শব্দ পেয়ে প্রভু যেন আচম্বিতে।
সব ভাব সম্বরিল দেখিতে দেখিতে ॥

শ্রীনবদ্বীপে প্রভু মুহুর্মুহু প্রকাশ হইতেন, তখন তাঁহার শরীর সহস্র সূর্য্যের তেজ ধরিত। নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া সর্ব্বসমক্ষে আর প্রকাশ হইতেন না। এক দিবস গোবিন্দের ভাগ্যে ছিল, তাই তিনি দেখিলেন

সেখান হইতে দামন নগরে, সে স্থান ত্যাগ করিয়া ও পঞ্চদশ দিবস পথে পথে হাটিয়া সুরাটে গেলেন। প্রভু আজ সমুদ্র ধারে আসিয়াছেন, এবার পশ্চিম ধারে। সেখানে সুরাট রাজার প্রতিষ্ঠিত অষ্টভুজা দেবী। প্রভু সেখানে তিন দিবস ছিলেন। একজন ভাল মানুষ সন্ন্যাসী প্রভুর

নকট সাধন ভজনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, প্রভু তাহার সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন, এমন সময় এক ব্রাহ্মণ, একটি ছাগ বলি দিতে আইল। প্রভু তাহা দেখিয়া মনে ব্যথা পাইয়া তাহাকে বলিলেন যে, দেবী বৈষ্ণবী, তিনি মাংস আহার করেন না। তাঁহার ঘাড়ে দোষ দিয়া তোমরা মাংস ভক্ষণ করিবা? জীবটা পরিত্যাগ কর। ব্রাহ্মণ তাহাই করিল। তাহার পরে প্রভু তাপ্তী নদীতে স্নান করিতে চলিলেন, সেখানে বলি স্থাপিত বামন আছেন, আর সেই নিমিত্ত সেই নদী তীর্থরূপে পরিগণিত। সেখান হইতে যজ্ঞকুণ্ড দেখিবার নিমিত্ত বরোচ নগরে নর্ম্মদার তীরে গমন করিলেন। সেখান হইতে বরদা নগরে যাইয়া ডাঁকরজি দেখিতে চলিলেন। ডাঁকরজি দেখিয়া আবার বরদায় ফিরিয়া আসিলেন। বরদার রাজা পরম বৈষ্ণব। সেখানে মন্দিরে শ্রীগোবিন্দবিগ্রহ আছেন। প্রতাপরুদ্রের ন্যায় রাজা স্বহস্তে মন্দির পরিষ্কার করেন। স্বহস্তে তুলসী মঞ্জরী তুলিয়া, গোবিন্দের পাদপদ্মে দিয়া তাহার পূজা করেন। প্রভু সন্ধ্যাকালে গোবিন্দের মন্দিরে যাইয়া প্রেমে অধীর হইলেন :—

ছিন্ন এক বহির্বাস পাগলের বেশ।
সদা উনমত প্রভুর কৃষ্ণের আবেশ॥

এখানে নারোজী এক তমাল তলায় প্রভুর কোলে শয়ন করিয়া, তাঁহার চন্দ্রবদন দেখিতে দেখিতে দেহ ছাড়িলেন। এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। প্রভু অমনি তমাল তলা হইতে দেহকে স্থানান্তরিত করিলেন ও ভিক্ষা করিয়া তাহার সমাধি দিলেন। পরে যেরূপ হরিদাসের অন্তর্ধানের সময়ে করিয়াছিলেন, সেইরূপ, সেই সমাধি বেড়িয়া, কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। মহাকলরব হইল, শেষে রাজা আইলেন। রাজার ইচ্ছা প্রভুকে ভিক্ষা দিবেন। প্রভু বলিলেন, বিলাসীর ভিক্ষা তিনি লয়েন না। রাজা ছাড়েন না, তখন তাহার ইঙ্গিতক্রমে গোবিন্দ মুষ্টিভিক্ষা লইলেন।

প্রভু বরদা ত্যাগ করিয়া মহানদী, যাহা মানচিত্রে মাহি বলিয়া পরিচিত, পার হইলেন। পরে আহাম্মাদাবাদে যাইয়া প্রভু প্রথমে মুসলমানরাজ্যের নিদর্শন পাইলেন। বাঙ্গালা ত্যাগ করিয়া আর উহা দেখেন নাই। প্রতাপরুদ্রের সাম্রাজ্য গোদাবরীর ওপার পর্য্যন্ত। সেখান হইতে যত দেশ গিয়াছেন, সমুদায় হিন্দু শাসনাধীনে। আহাম্মাদাবাদেও যে কোন মুসলমানকে দেখিয়াছিলেন না, তাহার কোন উল্লেখ নাই। নগর অতি জাঁকের, বড় বড় অট্টালিকা কর্ত্তৃক শোভিত, নগরবাসী অতিথি-সেবায় অনুরক্ত, প্রভুকে সকলে লইয়া টানাটানি করিতে লাগিল। প্রভু গৃহস্থের বাটী যাইতে অস্বীকার করিলেন। বহুতর লোক তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিল। একজন পণ্ডিত শ্রীভাগবত কথা উঠাইয়া শ্লোক পড়িতে লাগিলেন। সুতরাং তাহার সহিত প্রভুর একটু কথা হইল। পরে লোককলরব, কীর্ত্তন, প্রভুর নৃত্য। তাহার পরে যাহা হয় তাহা হইল, প্রভু বহুলোকের হৃদয়ে ধর্ম্মের বীজ বপন করিলেন।

তাহার পরে শুভ্রামতী নদী পার হইলেন। সেখানে যাইয়া দেখেন, কয়েক জন লোক দ্বারকা তীর্থে গমন করিতেছেন। তাহার মধ্যে দুই জন বাঙ্গালী আছেন, রামানন্দ বসু ও গোবিন্দচরণ। গোবিন্দ ইহাদের দেখিলেন, দেখিয়াই পরস্পরে বুঝিলেন যে, তাহারা বাঙ্গালী, সুতরাং সকলে সুখী হইলেন। গোবিন্দ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, রামানন্দ বলিলেন, তিনি কুলিন গ্রামের বসু পরিবারের একজন। রামানন্দ গোবিন্দের পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় গোবিন্দ বলিলেন যে তিনি প্রভুর সঙ্গে যাইতেছেন।

রামানন্দ। প্রভু! তিনি কোথা?

গোবিন্দ। ঐ যে তিনি নদীতে (শুভ্রামতী) স্নান করিতেছেন।

অমনি ধেয়ে গিয়া রামানন্দ প্রণাম করিলেন।

প্রভু বলিলেন, তুমি দেশের কথা স্মরণ করাইয়া দিলে। নিত্যানন্দ

প্রভৃতি দুই শত জনে নীলাচলে প্রভুকে অপেক্ষা করিতেছেন, প্রভু তাহাদের ভুলিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালায় লক্ষ লক্ষ লোকে তাহার অদর্শনে রোদন করিতেছেন, তাঁহার অভাবে শ্রীনবদ্বীপ অন্ধকার।

যথা প্রেমদাসের গীত :—

নীলাচলপুরে, গতায়াত করে,
যত বৈরাগী সন্ন্যাসী।
তাহা সবাকারে, কান্দিয়া সুধায়,
যত নবদ্বীপবাসী॥
তোমরা কি সন্ন্যাসী দেখিয়াছ? ধ্রু।
বয়স নবীন, গলিত কাঞ্চন,
জিনি তনুখানি গোরা।
হরেকৃষ্ণ নাম, বলয়ে সঘন,
নয়নে গলয়ে ধারা॥

আর প্রভুর নিজ বাড়ী? তাঁহার জননী? তাঁহার ঘরণী? কোথায় তাঁহারা, আর কোথায় আমাদের প্রভু? সকলকে ছাড়িয়া, সংসার ত্যাগ করিয়া, ছিন্ন কৌপীন পরিধান করিয়া, কৃষ্ণনাম বিলাইয়া বেড়াইতেছেন। কলে একত্র হইয়া বাঙ্গালায় কথা কহিতে কহিতে দ্বারকায় চলিলেন। ই গোবিন্দ মিতালি পাতাইয়াছেন। প্রভু গোবিন্দকে ও গোবিন্দ রণকে বলিতেছেন, তোমরা যদি মিতা হইলে তবে রামানন্দ আমার মিতা! মানন্দ ইহাতে লজ্জা পাইয়া করযোড়ে যেন অনুনয় করিতে লাগিলেন। মানন্দকে কে না জানে, ইনি বিখ্যাত পদকর্ত্তা। প্রভু সমুদায় ভুলিয়াছেন, কন? হৃদয়ে কেবল এক ইচ্ছা রহিয়াছে, জীবোদ্ধার, তাই রামানন্দ ও গাবিন্দচরণকে দেখিয়া বলিতেছেন, আমার যে একটা দেশ আছে তাহা তামরা স্মরণ করাইয়া দিলে!

রামানন্দ নিজ পদে বলিয়াছেন—

রামানন্দের বাণী, দিবা নিশি নাহি জানি,
গৌর আমায় পাগল করিলে।

পরে সকলে ঘোগা নগরে গমন করিলেন। এ নগর সমুদ্রের ধারে ও পুরবন্দর রাজধানী হইতে সেখানে এখন রেলপথ গিয়াছে। এখানে বারমুখী নামক বেশ্যা বাস করে। তাহার ন্যায় রূপবতী পৃথিবীতে নাই, তাহার ঐশ্বর্য্যের ও সীমা নাই।—

"বেশ্যাবৃত্তি করিয়া সাধিয়াছে বহুধন।
বহুমূল্য হয় তাহার বসন ভূষণ॥
বহু দাস দাসী লয়ে থাকে সেইখানে।
জাঁক পসারের কথা সব লোক জানে॥
প্রকাণ্ড বাগিচা নাম পিয়ারা কানন।
কাননের ধারে প্রভু করেন গমন॥
অতি বড় নিম্ববৃক্ষ আছে সেইখানে।
কি ভাবিয়া প্রভু গিয়া বসিল সেইখানে॥

বারমুখীর প্রকাণ্ড বাড়ী। প্রভু তাহার বাড়ী পার্শে প্রকাণ্ড বাগানে, এমন স্থানে বসিলেন যে, বারমুখী জানালায় বসিয়া তাঁহাকে দেখিতে পায়। প্রভু বাগানে, বারমুখী দোতালার জানালায় বসিয়া প্রভুকে দর্শন করিতেছে, কারণ প্রভু, সে যে তাঁহাকে দেখিতে পায়, এইরূপ স্থানে ইচ্ছা করিয়া বসিয়াছেন। অথচ প্রভুর তাহাকে দেখিবার কোন সুবিধা না[illegible] তবু ঠিক জানিবেন যে, প্রভু জানিতেছেন যে, বারমুখী তাঁহাকে দেখি[illegible]। বারমুখী তাঁহাকে দেখিবে না, তবে তিনি সেখানে গিয়াছেন কেন[illegible] বারমুখী যেমন পৃথিবীর মধ্যে সুন্দরীর শিরোমণি, প্রভু তেমনি সুন্দরের শিরোমণি। প্রভু ও তাহার তিন জন ভক্ত সেখানেই সেবা করিলেন, লোক জুটিতেছে তাহা বলা বাহুল্য।

পিচকারি সম অশ্রু বহিতে লাগিল।
তাহা দেখি ঘোগাবাসী আশ্চর্য্য হইল॥
দেখিয়া প্রভুর সেই হরি সংকীর্ত্তন।
মাতিয়া উঠিল প্রেমে দুই চারিজন॥
গ্রাম্য লোক জনের নয়নে বহে বারি।
বহুলোক আসি দাঁড়াইলা সারি সারি॥
কেমন ভক্তির ভাব কহনে না যায়।
অনিমিষে প্রভুর বদন পানে চায়॥
কখন হাসিছে প্রভু কখন কান্দিছে।
কখন বা বাহুতুলি নাচিছে গাইছে॥
থর থর কাপে কভু ঘর্ম্ম বারি বহে।
কখন বা প্রেমাবেশে চুপ করি রহে॥
কখন টলিছে রোমাঞ্চিত কলেবরে।
প্রাণ কৃষ্ণ বলি কভু ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥
শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে মত্ত নবীন সন্ন্যাসী।
এই কথা কানাকানি করে ঘোগাবাসী॥
হরি হরি বলিতে আনন্দ ধারা বহে।
পুতুলের প্রায় সবে দাণ্ডাইয়া রহে॥
আধ নিমিলিত চক্ষু জটা এলায়েছে।
ধুলা মাটি মেখে অঙ্গ মলিন হয়েছে॥
"কোথায় প্রাণের কৃষ্ণ" এই বলি ডাকে।
কখন বা হাত তুলি উৰ্দ্ধ মুখে থাকে॥
একবার ঐ যে বলি ধাইয়া চলিল।
বাহু পসারিয়া নিম্বে জড়ায়ে ধরিল॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে মত্ত হইল নিমাই।
এমন উন্মাদ মুঞি কভু দেখি নাই॥
বহুদিন সঙ্গে থাকি ফিরি নানা দেশ।
দেখি নাই কোন দিন এমন আবেশে॥
প্রকাণ্ড এক গর্ত্ত ছিল সড়কের ধারে।
আবেশ গড়ায়ে পড়ে তাহার ভিতরে॥

এ পর্য্যন্ত বারমুখী আপনার রূপ দেখাইয়া অন্যকে মুগ্ধ করিয়া আসিয়াছে। এখন প্রভু আপনার রূপ দেখাইয়া তাহাকে মুগ্ধ করিতেছেন। দেহের রূপ নয়, ভিতরের রূপ। বারমুখীর তখন এরূপ হয়েছে যে, প্রভুর চরণে আসিয়া পড়ে আর কি, কিন্তু ভয় করিতেছে। প্রভু তাহার উপর কৃপা কেন করিবেন? সে না নগরের অথবা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধম? প্রভুর, বারমুখীর সেই ভ্রম ঘুচাইতে হইতেছে, ভ্রম এই যে সে অতি অধম সেই নিমিত্ত কৃপা পাইবার অনুপযুক্ত। সে এইরূপে করিলেন।

বালাজি বলিয়া একজন ব্রাহ্মণ সেখানে ছিল, প্রভুর উপর তাহার ক্রোধ হইয়াছে। কেন হইয়াছে, তাহা নিরাকরণ করা কঠিন, তবে ভালর প্রতি মন্দের চিরকাল ঐ রূপ শত্রুতা। প্রভু যত উন্মত্ত হইতেছেন, তাহার, তাঁহার প্রতি তত, দ্বেষ হইতেছে। শেষে আর থাকিতে পারিল না। প্রভুর সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে গালি দিতে লাগিল। বলিতেছে, "তুই ভণ্ড, তোর ভণ্ডামি ভাঙ্গিতেছি, এখানে ভণ্ডামি চলিবে না।" কেন যে ভণ্ডামি চলিবে না, তাহা আর বালাজি খুলিয়া বলিলেন না। বোধ হয় মনের ভাব এই যে, আমি বালাজি এখানে আছি, সেখানে কেমন করিয়া কেহ ভণ্ডামি করিয়া উহা জীর্ণ করিবে? শেষে প্রভুকে মারিবে তাহা বলিতে লাগিল, পরে তাহার উদ্যোগও করিল। অবশ্য বালাজি ভাবিতেছে

এ তাহার স্থান আর সন্ন্যাসী বিদেশী, তাহার বলে সন্ন্যাসী পারিবে ন। কিন্তু বলপ্রয়োগ করিতে গিয়া বালাজি একটু ফাঁফরে পড়িল। রণ সকলে হাহাকার করিয়া, তাহাকেই আক্রমণ করিল। প্রভুর বাহ ল। কাজেই তিনি বালাজির পক্ষ হইলেন। তাহাকে বলিতে গিলেন, ছি! এ সমস্ত প্রবৃত্তি কেন পোষণ করিতেছ? উহা পোষণ রিয়া তোমার লাভ কি? এসো তোমাকে পরম ধন দিতেছি। প্রভু তখন হাকে বাৎসল্য ভাবে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তখন বালাজি দ্বিরুক্তি রিতে পারিল না, গ্রহগ্রস্তের ন্যায় শুনিতে লাগিল। যেহেতু প্রভু তখন হার স্বাতন্ত্র্য হরণ করিয়াছেন। তাহার পরে তাহার কর্ণে হরিনাম দিলেন। র তখন বালাজি শক্তি পাইয়া বিহ্বল হইয়া পড়িয়া গেল। বালাজির উদ্ধার র্য্য সমাধা হইল; কেননা সে অহেতুক প্রভুকে প্রহার করিতে গিয়াছিল! বোধ হয় প্রভুর ইচ্ছাক্রমেই বালাজির ঘাড়ে দুষ্ট সরস্বতী আশ্রয় ন। প্রভু বালাজিকে দেখাইলেন যে, ভগবানের দয়া মনুষ্যের দয়ার তীর নয়, সে আর এক প্রকার, অনেক বড়। বালাজির উদ্ধার খিয়া বারমুখী আশ্বাসিত হইল। তখন আপনার গণকে এই কথা ল যে, আমি উদাসিনী হইব, ঠাকুরের আশ্রয় লইব, সেই নিমিত্ত তেছি। তাহারা, তাহার মুখ দেখিয়া বুঝিল যে, বারমুখীর সঙ্কল্প তাহারা রোদন করিতে লাগিল। বারমুখী অগ্রবর্ত্তী হইলে, তার না সহচরী মিরা, ক্রন্দন করিতে করিতে পশ্চাৎ আসিতে লাগিল। মুখী তাহাকে সান্তনা করিয়া বলিল, আমি নরক হইতে উদ্ধার হইব, পতিতপাবন সন্ন্যাসীর স্মরণ লইব, তুমি আমার ধন ভোগ কর। কেবল সৎকার্য্যে ব্যয় করিও। আমি অবশ্য কৃপা পাইব। বালাজি রকে প্রহার করিতে গিয়াছিল, প্রভু তাহাকে কৃপা করিলেন, আমার তাই য়া ভরসা হইয়াছে!

বারমুখী আসিতেছে, কি জন্য আসিতেছে, তাহা তখন প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। কারণ বারমুখীর আসিবার সময় একটা প্রকাণ্ড গোল হইয়াছে। লোকে একবারে বিস্ময়ে ও আনন্দে বিভোর হইয়াছে। বারমুখী আসিতেছে লোকে মাঝে পথ দিতেছে। প্রভু নয়ন মুদিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। বারমুখী আসিয়া পদতলে পড়িল, আর—

তিন চারি পদ প্রভু অমনি হটিল।

প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইল, দাঁড়াইয়া আপনার কেশ এলাইয়া দিল। সে কেশ তাহার গৌর বর্ণের নিকট কিরূপ দেখাইতেছিল না—

বিদ্যুতের পাশে যেন মেঘ রাশি রাশি।

করযোড়ে বলিতেছে, "প্রভু, আমি আর পাপ করিব না। আমাকে চরণে স্থান দাও।" মিরা দাসী সঙ্গে একখানি কাঁচি ও মলিন বসন আনিয়াছিল, সে কাঁচিখানা লইয়া বারমুখী আপনার দীর্ঘ কেশ কচ্‌কচ্‌ করিয়া ছেদন করিল। পরে সেই মলিন বসন পরিয়া যোড় হস্তে প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইল। ইহাতে দর্শকগণের কিরূপ মনের ভাব হইল বিচার করুন।

প্রভু বারমুখীকে চুপে চুপে কৃপা করিলে পারিতেন, কিন্তু তাহা করিলেন না। কি করিলেন? না সেই পরমা সুন্দরী ধনশালী বেশ্যাকে, সহস্র লোকের সম্মুখে দাঁড় করাইলেন, করাইয়া কচচ্ছেদন (কেশচ্ছেদন) করাইলেন, কৌপীন পরাইলেন, পরাইয়া তাহাকে কৃপা করিলেন, উদ্দেশ্য যে বারমুখীর উদ্ধারের সঙ্গে এই সহস্র সহস্র লোক পবিত্র হউক।

বারমুখীকে প্রভু আশ্বাস দিলেন। দিয়া বলিতেছেন, তুমি তুলসী কানন করিয়া এখানে শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর। বারমুখী পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী। অনেকে তাহার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইত। আবার ভাল লোকে উহা দেখিয়া ভয়ে ও ঘৃণায় শিহরিয়া উঠিতেন। এখন

তিনি চুল কাটিয়াছেন, ভূষণ ছাড়িয়াছেন, মলিন বসন পড়িয়াছেন, ইহাতে কি তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা কুৎসিত হইয়াছেন? ঠিক তাহা নয়। বারমুখীর এক নূতন সৌন্দর্য্য হইল। পূর্ব্বে ঐ রূপে মন্দ লোকে কেবল মুগ্ধ হইত, কিন্তু বারমুখীর এখন যেরূপ হইল, তাহাতে ভাল মন্দ সকল লোকেই মোহিত হইতে লাগিলেন। সেই বারমুখীর সৌন্দর্য্যক্রমে এখন বাড়িতে লাগিল। কিন্তু এই যে বলিলাম, সে আর একরূপ সৌন্দর্য্য, পূর্ব্বকার সৌন্দর্য্য নয়।

বিবেচনা করুন, নারোজী প্রথম শ্রেণীর ডাকাইত, বারমুখী প্রথম শ্রেণীর বেশ্যা, প্রভুকে দর্শন মাত্র ইহাদের পুনর্জ্জন্ম হইল। ইহাতে প্রভুর অবতারের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিবেন। সহচরী মিরাবাই অনেক কান্দিল। কিন্তু বারমুখী কিছু গ্রাহ্য করিল না। বরং মিরাকে উপদেশ দিল, ভাই আপনার পথ দেখ আর কুকর্ম্ম করিও না।

সেখান হইতে প্রভু ছয় দিন হাটিয়া সোমনাথে গেলেন, যে সোমনাথ মুসলমান কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হয়। মন্দিরের অবস্থা দেখিয়া প্রভু দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রভু ক্রন্দন করিতেছেন। ইহার মধ্যে ঝড় উঠিল। প্রভু বসিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় দুই চারিজন পাণ্ডা আসিয়া উপস্থিত, বলে টাকা দাও। প্রভু বলিলেন, আমরা সন্ন্যাসী টাকা কোথা পাব। ইহাতে গোবিন্দ চরণ, দুটি মুদ্রা দিলেন। এই পাণ্ডার উৎপাতে আমাদের দেবস্থানগুলির দশা এইরূপ হইয়াছে। সেখান হইতে জুনাগড়ে যাইয়া দেখিলেন, খুব বড় নগর। সেখানকার ঠাকুর রণছোড়জী। সেখানে গির্ণার পাহাড়ে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ চিহ্ন আছে, তাহাই দেখিতে প্রভু পাহাড়ে উঠিলেন। পথে দেখেন দ্বাদশ জন সন্ন্যাসী দুঃখ মনে বসিয়া, তাহার কারণ, তাহাদের বৃদ্ধ গুরু ভার্গদেব পীড়িত। প্রভু অমনি যাইতে নিরস্ত হইলেন, হইয়া ভার্গদেবকে রোগ হইতে মুক্ত করিলেন। তাহাতে—

রোগ হইতে ভার্গদেব পেয়ে অব্যাহতি।
প্রভুর চরণে করে অসংখ্য প্রণতি॥

ভার্গদেব বলিতেছেন, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। তাহাতেই আমার চক্ষু-রোগ হইয়াছে বোধ হয়। কারণ আমি ত তোমাকে কৃষ্ণবর্ণ দেখিতেছি। প্রভু ইহা শুনিয়া জিভ কাটিলেন। তাহাতে ভার্গব স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন আমি তোমাকে চিনেছি।

কার কাছে ফাঁকি দেহ নবীন সন্ন্যাসী?

প্রভু তাহাকে নয়নে নয়নে ভঙ্গিতে কি বলিলেন। যথা ঃ—

কি কহিল ভর্গদেবে প্রভু আঁখি ঠারি।
অমনি তাহার চক্ষে বহে অশ্রুবারি॥

পরে সকলে মিলিয়া গির্ণার পাহাড়ে শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিলেন। সেখানে প্রভু অকথ্য প্রেমতরঙ্গ উঠাইলেন। রামানন্দ ও গোবিন্দ দুই জন চরণে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। ভদ্রানদীতীরে রজনী কাটাইলেন। সম্মুখে ধন্নিধরঝারি বিখ্যাত জঙ্গল; এখানে অদ্যাপি সিংহ পাওয়া যায়। এই জঙ্গল পার হইতে সাত দিন লাগিয়াছিল। কিন্তু এখন তাহারা ষোলজন, বোধ হয় এই বন পার হইতে প্রভুর সাহায্য করিতে হইবে বলিয়া ভর্গদেব পীড়িত হইয়া পড়েন। সুঁড়িপথ দিয়া যাইতে হয়, দুই প্রহর হইলে সূর্য্য দেখা যায়। তবে মাঝে মাঝে কাষ্ঠের দুর্গ আছে, সেখানে যাত্রীগণ রজনীতে বাস করেন, আহার বৃক্ষের ফল, এত ফল যে,—

সহস্র লোকের খাদ্য পথে পড়ে থাকে।
ঈশ্বরের কত দয়া কহিব কাহাকে॥

তাহার একপ্রকার ফল কামরাঙ্গার মত।

চৌশিরা সিজ সম যেই গাছ শোভে।
আশ্চর্য্য তাহার ফল খাই অতি লোভে॥

টুপ টাপ খায় ফল গোবিন্দচরণ।
রামানন্দ ধীরে ধীরে করে আস্বাদন ॥

গোবিন্দ নিজে কিরূপে খান তাহা বলেন নাই, তবে এইটুকু লিলেন :—

উদর পূরিয়া ফল যত পারি খাই।

মধ্যে মধ্যে এই নিবিড় জঙ্গলে প্রভু গান ধরিতেছেন :—

হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ হরে!

যখন তখন প্রভু এই নামগান করেন। তখন এই ষোলজন সঙ্গে তান রিলেন। এইরূপে কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রভাস তীর্থে আইলেন। প্রভু বশ্য যদুকুলের দুর্দশার কথা মনে করিয়া খুব কান্দিলেন, কিন্তু আশ্চর্য্য ই :—

কান্দিয়া এতেক হর্ষ কেহ নাহি পায়।
কান্দিয়া আনন্দ প্রভু ধরায় ছড়ায় ॥

পরিশেষে প্রভু দ্বারকায় গমন করিলেন, কৃষ্ণের দুই স্থান, বৃন্দাবন ও রকা। বৃন্দাবনে প্রভু গমন করিয়া কি করিয়াছিলেন, তাহা আপনারা নেন। এখন দ্বারকায় সেই প্রকার লীলা আরম্ভ হইল। প্রভু সেখানে ক পক্ষ ছিলেন, দ্বারকানগর একেবারে উন্মত্ত হইল।

ধর্ম্মের ভারেতে পুরী করে টলমল।
সকলের চিত্ত যেন হইল নির্ম্মল ॥
মন্দ মন্দ বায়ু সদা বহিতে লাগিল।
পুষ্প গন্ধে সব বাড়ী যেন আমোদিল ॥
যেইখানে মরুক্ষেত্র কিছুমাত্র নাই।
সেখানে বহাল নদী চৈতন্য গোঁসাই ॥
সমস্ত দেশের মধ্যে পাপী না রহিল।

পাণ্ডাগণ এই প্রভু-আগমন উপলক্ষে একদিন মহোৎসব করিল, সকলের নিমন্ত্রণ, প্রভু নিজে এক ভার লইলেন, যথা ঃ—

পণ্ডুদের মধ্যে গিয়া গোরামণি।
প্রসাদ বণ্টন প্রভু করেন আপনি॥৮

দ্বারকা দেখা হইলে, ওদিকে আর তীর্থস্থান নাই, অমনি প্রভু বলিলেন, চল নীলাচলে যাই। দ্বারকা ত্যাগ করিবার সময় বহু লোক প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল, তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দিয়া, পুনরায় বরদায় আইলেন। আর সেখান হইতে চলিয়া আসিয়া, ষোল দিনে নর্ম্মদায় স্নান করিলেন, সেখানে প্রভু ভর্গদেবকে বিদায় করিয়া দিলেন, দিয়া নর্ম্মদার ধারে ধারে চলিলেন। প্রভুর দক্ষিণভ্রমণ সম্পূর্ণ হইয়া আসিতেছে, আমরা এখন অবশিষ্ট লীলাগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করিব।

দেহদ বা দানগর হইয়া কুক্ষী আইলেন, এখানে অনেক বৈষ্ণবের বাস। এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ, তাহার লক্ষ্মীনারায়ণের সেবা আছে। প্রভু সেখানে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ অতি কাতর হইলেন। বলিলেন, "আমি দরিদ্র, আতিথ্য করিবার আমার শক্তি নাই।" প্রভু বলিলেন, "তাহাতে ব্যস্ত কি, যিনি জীব করিয়াছেন, তিনিই আহার দিবেন।" ব্রাহ্মণ ভাবিতেছেন, ইতিমধ্যে একজন বৈশ্য দুগ্ধ চিনি আটা আনিয়া উপস্থিত করিল। বলিতেছেন, "ব্রাহ্মণ ঠাকুর! তোমার যে লক্ষ্মীনারায়ণ ইনি বড় জাগ্রত। কল্য নিশিতে তিনি নররূপ ধরিয়া আমাকে স্বপ্নে দেখাইয়াছেন যে, তাঁহার বড় পায়স খাইতে সাধ গিয়াছে, তাই আমাকে দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া তোমার নিকট আনিতে বলিয়াছেন, এই আমি আনিয়াছি, গ্রহণ করিয়া পায়স রান্ধিয়া লক্ষ্মীনারায়ণকে দাও।" ব্রাহ্মণ কাঁদিয়া আকুল। প্রভুকে বলিতেছেন যে, বোধ হয় এ তোমার লাগিয়া, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তখন বৈশ্য প্রভুর পানে চাহিল, চাহিয়া

একেবারে অজ্ঞান মত হইয়া, প্রভুর পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, কিহে বণিক! তুমি কি দেখিতেছ? তখন বণিক্ গদ গদ হইয়া বলিলেন, কি আর বলিব, যিনি নররূপ হইয়া আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়াছিলেন, তিনি ঠিক ইঁহার মত, তিনিই এই। প্রভু ইহাতে বৈশ্যকে একটা তাড়া দিলেন, দিয়া বলিতেছেন, আচ্ছা লোক তুমি! আমি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া এই ব্রাহ্মণের বাড়া আসিয়াছি, ইহার মধ্যে তুমি আমাকে স্বপ্নে দেখিলে? বৈশ্য ভয়ে আর কিছু বলিল না। প্রভু দুগ্ধ পায়স রান্ধিলেন, সকলে প্রসাদ পাইলেন, প্রভু আপনি বৈশ্যকে ও আর সকলকে পরিবেশন করিলেন।

প্রাতে প্রভু যাইতেছেন, সেই বৈশ্য আসিয়া প্রভুর চরণতলে পড়িল, সে প্রভুকে পথে ধরিবে বলিয়া পথে লুকাইয়া ছিল। বলিতেছে, তুমি সেই তিনি, আমি চিনিয়াছি। নিতান্ত যাবে ত আমাকে কৃপা করিয়া যাও। প্রভু ঈষৎ হাসিয়া তাহাকে উঠাইলেন, কর্ণে হরিনাম দিলেন। বলিলেন, সর্ব্ব ত্যাগ করিয়া তুলসী কানন কর, করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর।

পরে আবার জঙ্গল সম্মুখে। দুদিন হাটিয়া গভীর জঙ্গল পার হইয়া সকলে আমকোড়া নগরে পঁহুছিলেন। সেখানে যে লীলা করিলেন, তাহা না লিখিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

ক্ষুধার জ্বালায় মোরা ছটফট করি।
নির্ব্বিকার প্রভু মোর বলে হরি হরি॥

পরে গোবিন্দ দুই সের আটা ভিক্ষা করিয়া আনিয়া ষোলখান রুটী করিলেন, সকলের চারিখানা করিয়া হইল। সেবা করিতে বসিয়াছেন।

হেনকালে এক নারী বালক লইয়া।
বলে কিছু দেহ মরি ক্ষুধায় জ্বলিয়া॥

শুনিয়া তাহার বাণী প্রভু দয়াময়।
আপনার ভাগ তুলি দিলেন তাহায়॥

দুঃখিনী খুসি হইয়া চলিয়া গেল, প্রভু এইস্থানে যে দয়া দেখাইলেন, তাহা আমার ভাল লাগিল না। দুঃখিনী খুসি হইলেন বটে, কিন্তু নিজজন যে ভক্ত সেখানে ছিলেন, তাহারা মরিয়া গেল। তাহাদের আহারীয় উচ্ছিষ্ট হইয়াছে, প্রভুকে আর দিতে পারেন না, রজনীতে প্রভু কিছু ফল আহার করিয়া রহিলেন।

পথে এক কুণ্ড পাইলেন। কথিত আছে, সীতা পিপাসাতুর হইলে লক্ষ্মণ বাণদ্বারা সেই কুণ্ড খনন করিয়া জল আহরণ করেন। সেই কুণ্ডে স্নান করিয়া সকলে তাহার পরে, বিন্ধ্যগিরি গেলেন। তাহার উপরে মন্দুরা নগরে যাইয়া এক যোগীর কথা শুনিলেন, তিনি গুহায় থাকিয়া তপস্যা করেন। দেখিতে সুন্দর কাঞ্চন বর্ণ। ইনি প্রকৃত একজন যোগসিদ্ধ।

মহাপ্রভু সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।
তপস্বী ভাঙ্গিয়া ধ্যান চাহিতে লাগিল॥
যেইক্ষণে চারিচক্ষে হইল মিলন।
অমনি তপস্বীবর হাসিল তখন॥

তপস্বীর সঙ্গে প্রভুর যে কি কথা হইল, তাহা গোবিন্দ বুঝিতে পারিলেন না। সেখান হইতে মণ্ডল নগরে গেলেন, ও তাহার পরে দেবা— নগরে আদিনারায়ণের কুষ্ঠ আরাম করিলেন। আদিনারায়ণ একজন ধনী বণিক, অথচ পরম বৈষ্ণব, কিন্তু কুষ্ঠরোগগ্রস্ত, সর্ব্বদা অসুখী। প্রভু গ্রামের বাহিরে এক বটতলায় বসিলেন। সেখানে ভোগকার্য্য সমাধা করিলেন। তাহার পরে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। কাজেই লোককলরব হইল, সেইসঙ্গে আদিনারায়ণ আইলেন। তিনি আসিয়া "নিস্তার কর

প্রভু” বলিয়া কান্দিতে লাগিলেন। প্রভু তাহাকে তাঁহার ভোগের কিঞ্চিৎ প্রসাদ ছিল, তাহা গ্রহণ করিতে বলিলেন।

ভক্তিসহ প্রসাদ করিয়া উপযোগ।
তখনি তাহার দূর হইল কুষ্ঠরোগ ॥

তখন বহু রোগী আসিবে ভয়ে প্রভু সেখান হইতে পলায়ন করিলেন। আদিনারায়ণ সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। প্রভু তাহাকে সংসার ত্যাগ আজ্ঞা দিয়া ফিরাইয়া দিলেন।

প্রভু তাহার পরে শিবানি (শিউনি) নগর, মালপর্ব্বত, চণ্ডিপুর, রায়পুর অতিক্রম করিয়া পরিশেষে বিদ্যানগরে আইলেন, কোথা, না রামানন্দের বাড়ী! এতদিন পরে প্রভু নিজ ভক্তগণের মধ্যে উপস্থিত। দুইজনে গলাগলি হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন, রামরায় আমার সঙ্গে চল। চল দুইজনে কৃষ্ণকথায় সুখে দিন কাটাইব। রামরায় একটি রাজ্যে রাজত্ব করিতেছেন, তিনি যখন স্নান করিতে যান, তখন বাদ্য বাজাইয়া সঙ্গে সহস্র লোক যায়। তিনি ইহা ফেলিয়া কুটীরে বসিয়া কৃষ্ণকথা কইতে কেন যাইবেন? কিন্তু রামরায় তাহা ভাবিলেন না। প্রভুর আজ্ঞায় আপনাকে কৃতকৃতার্থ মানিলেন।

তিনি উত্তরে বলিলেন, আপনাকে দর্শন হইতে এই রাজ্যশাসন বিষের ন্যায় বোধ হইতেছে। আমি রাজাকে লিখিলাম যে, আমা হইতে আর তাঁহার কাজ হইবে না, তিনি অন্য লোক নিযুক্ত করুন। রাজা, তোমার নিকট থাকিব, এই নিমিত্ত এই প্রার্থনা করিতেছি, তাহা জানিয়াছেন। তাই তিনি তদ্দণ্ডে ছুটি দিলেন, তিনি তোমাকে দর্শন করিবেন বলিয়া নিতান্ত ব্যাগ্র হইয়া আছেন। তুমি যাও, আমার সঙ্গে সৈন্য যাইবে। তোমার আমার একত্র যাওয়া সুবিধা হইবে না। তাই প্রভু রামানন্দকে ছাড়িয়া নীলাচলে চলিলেন। প্রভু নাম বিলাইতে বিলাইতে আসিতেছেন,

পুনরুক্তি ভয়ে সে সব কথা আর উল্লেখ করিব না। তবে এক মাড়ুয়া ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার যে যুদ্ধ হয়, সেটা বলিতে হইতেছে। সেরূপ কয়েকটী লীলাও পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। অর্থাৎ প্রভুর মারি খেয়ে দয়া করা। কিন্তু এ মাড়ুয়া সম্বন্ধে যে লীলা তাহাতে একটু বিশেষত্ব আছে। তাই উহা একটু বিবরিয়া বলিব। এই লীলা রসালকুণ্ডে হয়। সেখানে একটি মাড়ুয়া ব্রাহ্মণ কাহাকেও গ্রাহ্য করে না। আর মনেও খুব অভিমান আছে যে, আমি স্বাধীনপ্রকৃতির লোক কাহাকে ভয় করি না, ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ সে একটি বর্ব্বর, মনুষ্যের হৃদয়ে যে সমুদায় কমনীয় ভাব আছে, তাহা তাহার নাই। যাহা কিছু ছিল, তাহা উৎপাটন করিয়াছে, আর তাহার হৃদয়ে যে কোন কমনীয় ভাব নাই, তাহার নিমিত্ত আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করে।

এই ব্রাহ্মণের একটি প্রহ্লাদ জন্মিয়াছে। কাজেই সে প্রভুর চরণে আকৃষ্ট হইয়া বসিয়া আছে। সেখান হইতে নড়িতেছে না, কি নড়িতে পারিতেছে না। প্রভুও তাহার প্রতি স্নেহনয়নে দৃষ্টি করিতেছেন। ব্রাহ্মণ পুত্রকে না পাইয়া তল্লাস করিতে করিতে শুনিল যে, সে প্রভুর ওখানে। সুতরাং ক্রুদ্ধ হইয়া আইল, আসিয়া দেখিল যে প্রকৃতই তাহার পুত্র করযোড়ে প্রভুর সম্মুখে বসিয়া আছে। ইহা দেখিয়া একেবারে জ্বলিয়া গেল। বলিতেছে, তুই এখানে কি করিতেছিস? বালক বলিল যে, এই ঠাকুরের কাছে আছি, ইনি বড় দয়াময়। এইরূপ বালকের মুখে প্রভুর স্তুতিবাণী শুনিয়া, মাড়ুয়ার যে ক্রোধ পুত্রের প্রতি হইয়াছিল, তাহা সমুদায় প্রভুতে নিয়োজিত হইল। অবশ্য তাহার হাতে একখানা যষ্টি ছিল, আর উহা পুত্রের পৃষ্ঠে প্রয়োগ করিবে বলিয়া আনিয়াছিল। এখন উহা হস্তে করিয়া প্রভুকে মারিতে চলিল। ইহাও বলা বাহুল্য যে, মারিবার আগে গালি আরম্ভ করিল। একবারে গর্জ্জন মাত্র যাহারা প্রহার করে, তাহারা লোক

ভাল, তাহারা কিয়ৎ পরিমাণে পাগল, নিজ কার্য্যের নিমিত্ত সম্পূর্ণ দায়ী নহে। কিন্তু যাহারা কুটিল, তাহারা অগ্রে গালি দেয়, দিয়া ক্রোধ প্রজ্বলিত করিয়া লয়, ক্রোধ আইলে কুকর্ম্ম করিতে যে বাধা তাহা থাকে না। এই ব্রাহ্মণ অগ্রে গালি দিতে লাগিল। গালি কি দিল, তাহা অনুভব করা যায়। বলিতেছে, তুই ভণ্ড জুয়াচোর সন্ন্যাসী, আমার পুত্রকে নষ্ট করিলি, ইত্যাদি। অদ্য তোকে প্রহার করিয়া তোর ভণ্ডামি ঘুচাইব। ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইহাতে বালকের মনে কি ভাব হইল বুঝা যায়। তাহার পিতা পাষণ্ড, সে আপনি অতি স্নেহশীল, পিতাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে। সেই পিতা, তাহার বিবেচনায়, একেবারে তাহার আপনার সর্ব্বনাশ করিতেছে। অবশ্য পিতার চরণ ধরিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে পারিত, কিন্তু সে বেশ জানিত যে, তাহাতে কোন ফল হইবে না। সুতরাং সে পিতাকে ছাড়িয়া প্রভুকে অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল। যাহা বলিল তাহার ভাবার্থ এই। বলিতেছে, প্রভু, উনি আমার পিতা, আমার নিমিত্ত পিতার অপরাধ না লইয়া উহাকে মাপ কর। ইহাতে কি হইতেছে, না প্রভুর উপর পিতার ক্রোধ আরো বাড়িয়া উঠিতেছে। যদি পুত্র তাহার দিকে জুটিয়া প্রভুকে আক্রমণ করিত, তবে সে পুত্রকে হৃদয়ে ধরিয়া তাহার মুখচুম্বন করিত, কিন্তু পুত্র সন্ন্যাসীর দিকে যাইয়া প্রকারান্তরে বলিতে লাগিল যে, তাহার পিতা পাষণ্ড, প্রভুর দয়ার উপযুক্ত পাত্র, সুতরাং পুত্রের ব্যবহারে ব্রাহ্মণ জ্বলিয়া উঠিল।

আরো, পরে এককাণ্ড হইল, যাহাতে ব্রাহ্মণের ক্রোধাগ্নিতে ঘৃত ঢালিয়া দেওয়া হইল। সেখানে যাহারা উপস্থিত ছিল, তাহারা ব্রাহ্মণকে বেশ জানে, কাজেই তাহার দিকে না হইয়া, প্রভুর দিকে হইল, হইয়া ব্রাহ্মণকে কটু বলিতে লাগিল। প্রভু ব্যঙ্গ করিয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন, মারিবে, কিন্তু তাহার মূল্য চাই।

যতবার হরিনাম মুখে উচ্চারিবে।
ততবার যষ্টিঘাত করিতে পারিবে॥

প্রভুর এই ব্যাঙ্গুক্তিতে ব্রাহ্মণের ক্রোধ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন বালক, পিতার চরণ ধরিল, ধরিয়া বলিল, পিতঃ! দেখিতেছেন না, উনি স্বয়ং জগন্নাথ। তাহাতে পিতার পদাঘাত খাইল, তখন বালক প্রভুর চরণে পড়িল। এইরূপে একবার প্রভুকে একবার পিতাকে অনুনয় করিতে লাগিল। তখন প্রভু ব্রাহ্মণের দিকে অরুণ করুণ চক্ষে চাহিলেন, সে চাহনির তুলনা নাই। চাহিয়া বলিতেছেন, "তোমার যে কঠিন মরুভূমির প্রায় হৃদয়, তাহা কৃষ্ণের কৃপায় রসাল হউক।"

যে মাত্র প্রভু এই বর দিলেন, ব্রাহ্মণ অমনি কাঁপিতে লাগিলেন। পরে ভয়ে তাহার পরিধান বস্ত্র অপবিত্র করিল।

ভয়ে জড়সড় বিপ্র দেখিতে না পায়।
কাঁদিয়া আকুল হয়ে পড়িল ধরায়॥
প্রভুর প্রভাবে বিপ্র আকুল হইয়া।
দুইহাতে দুই পদ ধরিল জড়া'য়া॥
অপরাধ করে বড় পাইয়াছি ভয়।
কৃপা করে অপরাধ ক্ষম দয়াময়॥

প্রভু যখন ব্রাহ্মণকে বর দিলেন, তখন তাহার পুনর্জন্ম হইল। তাহার কি কৃষ্ণপ্রেম হইল? তাহার কি ভক্তির উদয় হইল? তাহার কিছুই নয়, তাহার হইল ভয়। ইহার নিগূঢ় পরিগ্রহ করুন। সকল আধার একরূপ নয়, সকলের পীড়া একরূপ নয়, ঔষধ একরূপ হইতে পারে না। তবে কিনা, বিষস্য বিষমৌষধি; যাহা হইতে যাহার পীড়া তাহাকে তাহাই দিয়া আরাম করিতে হইবে। সার্ব্বভৌমের পীড়ার কারণ বিদ্যা, তাহাকে বিদ্যাদ্বারা আরোগ্য করিতে হইবে। চাঁদকাজির পীড়া লোকবল,

তাহাকে লোকবল দিয়া সুস্থ করিতে হইবে। জগাই মাধাই নিঠুর অত্যাচারী, তাহার ঔষধ,—চক্র। সুতরাং ব্রাহ্মণ ভক্তি কি প্রেম পাইলেন না, পাইলেন ভয়, সে এত ভয় যে বস্ত্রখানি নষ্ট করিলেন, এবং পরিণামে ভয় হইতে তাহার ভক্তির উদয় হইল।

পুরীধামের নিকট আসিয়া প্রভু আগমন সংবাদ পাঠাইলেন। তখন নিতাই, সার্ব্বভৌম প্রভৃতি এক দৌড়ে আসিয়া, আলালনাথে প্রভুর লাগ পাইলেন। *

---

* গোবিন্দের কড়চা বলিয়া যে পুস্তক ছাপা হইয়াছে তাহার প্রথম ও শেষ কয়েক পত্র প্রক্ষিপ্ত। প্রভুর সঙ্গে রামানন্দের মিলনের পূর্ব্বে এই মুদ্রিত কড়চা গ্রন্থে যাহা আছে তাহা অলীক। আবার, প্রভু আলালনাথে আসিয়া যে বহু ভক্ত দেখিলেন, সেখান হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই কড়চার যাহা মুদ্রিত করা হইয়াছে তাহা সমস্তই অলীক। গ্রন্থখানি প্রামাণিক করিবার নিমিত্ত—গোবিন্দের দ্বারা লেখান হইয়াছে যে "আমি ও কালা কৃষ্ণদাস চলিলাম।" অথচ হস্তলিখিত কড়চায় কালা কৃষ্ণদাসের নাম গন্ধও নাই। যে কড়চা গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে তাহাতে রামানন্দ রায়ের মিলন হইতে আলালনাথে প্রভুর সহিত ভক্তদিগের মিলন পর্য্যন্ত প্রামাণিক। অবশিষ্ট সমস্তই প্রক্ষিপ্ত। প্রকাশক মহাশয় এইরূপ অন্যায় কার্য্য করিয়া পরে অত্যন্ত লজ্জিত হয়েন। তাহার পর তিনি তাঁহার দোষ অপনয়নের নিমিত্ত যতদূর সম্ভব শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখেন। সে পত্র আমাদের নিকট আছে। গোবিন্দ দাসের কড়চার একখানি বিশুদ্ধ সংস্করণ বাহির হওয়া কর্তব্য।

চতুর্থ অধ্যায়।

প্রভু দক্ষিণে যাইয়া কি কি কার্য্য সাধন করিলেন, তাহার অল্প কিছু বিচার করিব। জীবকে ভক্তিধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া এই অবতারের প্রধান উদ্দেশ্য, প্রভু একমুহূর্ত্তের নিমিত্ত সে উদ্দেশ্য ভুলিতেন না। অতএব প্রভুর ইচ্ছা যে, যতদূর সম্ভব এই ধর্ম্ম সমস্ত ভারতবর্ষে প্রচার করিবেন। দক্ষিণদেশে এই ধর্ম্ম প্রচার করা বড় প্রয়োজন ছিল। তাহার এক কারণ, তখন ভারতবর্ষের, দক্ষিণেই বিশুদ্ধ হিন্দুদেশ ছিল, অন্য স্থানের ন্যায় দক্ষিণে মুসলমান আধিপত্য প্রবেশ করিতে পারে নাই। আর এক কারণ, সে দেশে বৈষ্ণব ধর্ম্ম এক প্রকার ছিল না। বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইয়া দক্ষিণ অঞ্চলে আশ্রয় লইল। শঙ্করাচার্য্যের উৎপত্তি স্থান দক্ষিণে, সেখানে তাঁহার প্রবল প্রতাপ। উদাসীন, সাধু, সন্ন্যাসিগণ, ঐ রূপে মুসলমান উৎপাতে দেশে স্থান না পাইয়া, কতক হিমালয়ের গহ্বরে, অবশিষ্ট দক্ষিণ দেশে পলায়ন করিলেন। অনেকে আধ্যাত্মিক উন্নতি, অর্থাৎ প্রেম ও ভক্তির নিমিত্ত, যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া জঙ্গলে বাস করিতেছেন। কিন্তু তবু বৈষ্ণব ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত। আপনারা দেখিবেন যে; দক্ষিণে প্রভু সন্ন্যাসী ও যোগিগণকে যেন উল্লাস করিয়া কৃপা করিয়াছেন।

দক্ষিণে সাধারণ হিন্দুগণের মধ্যে অনেকেই শৈব ও শাক্ত ধর্ম্মাবলম্বী, এবং বৈষ্ণবের সংখ্যা অতি অল্প। তবে সেখানে অনেক রামায়ত অর্থাৎ রামোপাসক বাস করিতেন। অবশ্য ইহাদিগকেও এক শ্রেণীর বৈষ্ণব বলে। কিন্তু প্রকৃত বৈষ্ণব তাঁহারা নহেন। তবে রামানুজ, দক্ষিণে বৈষ্ণব ধর্ম্মের জয়পতাকা লইয়া ধর্ম্মপ্রচার করেন। কিন্তু তাঁহার

চারিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও শাক্ত ধর্ম্ম, বলিতে কি, প্রায় এক প্রকার। উভয়ের ধ্যে মুখ্য বিভিন্নতা এই যে, শাক্তগণের উপাস্য দেবতা শিব ও দুর্গা, ার রামানুজের উপাস্য দেবতা কৃষ্ণ, কিন্তু সে কৃষ্ণ ঐশ্বর্য্যবিবর্জ্জিত ভুজ মুরলীধর নহেন, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী নারায়ণ। সুতরাং দক্ষিণে কৃত বৈষ্ণবের সংখ্যা অতি অল্প ছিল।

প্রভু দক্ষিণে যাইবার আর এক কারণ, রামানন্দ রায়কে আনয়ন রা। প্রভু যে ব্রজের নিগূঢ় রস জীবকে শিক্ষা দেন, রামানন্দকে ধিকারী জানিয়া, তাঁহার হৃদয়ে, সেই রসের বীজ বপন করিলেন। এই গূঢ় রস কি, যদি প্রভু শক্তি দেন তবে পরে বিস্তার করিয়া লিখিব। হারা লীলার সহায় ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রভুর নিকট পনি আইসেন, কাহাকে আনিতে প্রভুর আপনার যাইতে হইয়াছিল। নাথ ভট্ট গোস্বামী, ছয় গোস্বামীর একজন, তপন মিশ্রের তনয়। ভু তপন মিশ্রকে কাশীতে পাঠাইয়া সেই রঘুনাথের সৃষ্টি করেন। অদ্বৈত প্রভুকে শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপ ডাকাইয়া আনিলেন। পরে বার, কেশে ধরিয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে আনিয়াছিলেন। হরিদাস আপনি ইলেন। আর যদিও নিত্যানন্দ, প্রভুর আকর্ষণে আপনি আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে নন্দন আচার্য্যের বাড়ী হইতে প্রভুর ধরিয়া আনিতে য়াছিল। উপরে যাহাদের নাম করিলাম, ইঁহারা সকলেই লীলার য়। অদ্বৈত বৈষ্ণব ধর্ম্মের জ্ঞানাংশ, নিতাই আনন্দাংশ, হরিদাস নাম র্ত্তনের প্রতিনিধি।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ যাহাদের ভজনীয় বস্তু, তাঁহাদের পীঠস্থান বৃন্দাবন। কিন্তু াবন কোথায়? বৃন্দাবন জঙ্গলময়। সেই জঙ্গলে, বৃন্দাবন সৃষ্টি াতে হইবে। সেই বৃন্দাবন গঠন করিবার নিমিত্ত উপযুক্ত পাত্র াহ করিতে হইবে। বড় বড় মন্দির করিতে হইবে। অথচ প্রভুর

এক কপর্দ্দকও নাই। কাহার সাধ্য এই বৃন্দাবন সৃষ্টি করে? তাহাতে উপযুক্ত পাত্রের প্রয়োজন।

আবার কোন নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিতে হইলে, তাহার একটি শাস্ত্র চাই; তাহা না হইলে সে ধর্ম্মের উপদেশ মুখে মুখে থাকে, আর মুখে মুখে থাকিলে সেই উপদেশগুলি অতি সত্বর কলঙ্কিত হয়। এই শাস্ত্র করে কে? প্রভু এই সমুদায় কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। যাহা তিনি করিলেন, অতি বড় যে সম্রাট, কি অতি বড় যে পণ্ডিত তিনি ও তাহা করিতে পারিতেন না; কিন্তু আমার কৌপীনধারী প্রভু, ধন জন সহায় শূন্য একক, সমুদায় করিয়াছিলেন। এই সমুদায় কার্য্য যাহারা করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে গোস্বামী বলে, এইরূপ বৃন্দাবনে ছয় গোস্বামী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি, সেখানে এই ছয় গোস্বামী সেনাপতিরূপে রহিলেন। অন্তর্যামী প্রভু দেখিলেন যে, গৌড়ীয় পাতসাহের পরম পণ্ডিত ও বিচক্ষণ মন্ত্রিদ্বয় রূপসনাতনই কেবল এই সমুদায় বৃহৎ কার্য্য করিতে সমর্থ। তাঁহারা গৌড়ে প্রভু নীলাচলে, প্রভু নীলাচল হইতে বৃন্দাবন যাইবেন উপলক্ষ করিয়া গৌড়ে যাইয়া তাঁহাদিগকে আনিলেন। যত পণ্ডিত যুদ্ধ করিতে আইসে তাঁহারা এই গোস্বামিগণের, বিশেষতঃ রূপসনাতনের, নিকট মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হইতেন।

দক্ষিণে যাইবার সুতরাং আর এক কারণ গোপালভট্টকে শক্তি সঞ্চার ও বৃন্দাবনে আনয়ন করা। ইনি ছয় গোস্বামীর একজন। আর গোপাল ভট্টকে না পাইলে আমরা প্রবোধানন্দ সরস্বতীকে পাইতাম না। সরস্বতীর বহু মূল্য গ্রন্থ চন্দ্রামৃত যিনি পাঠ না করিয়াছেন তিনি অতি হতভাগা। মহাপ্রভু যে কি তত্ত্ব তাহার অতি প্রধান সাক্ষী এই প্রবোধানন্দ, ইঁহার সাক্ষ্য অমান্য করিবার একেবারে যো নাই। যখন বৃন্দাবনের গোস্বামিগণের যশ ভারত ব্যাপিল, তখন পশ্চিম দেশীয় লোকের দীক্ষা রূপ সনাতন

়জীব, যে দিবেন এরূপ সময় তাঁহাদের রহিল না, সে কার্য্য সমাধা গোপাল ট করিতেন।

প্রভু দক্ষিণে ভ্রমণ করিতে করিতে যেখানে ফলবান্ বিষবৃক্ষ পাইতেছেন, তাহাকে ছেদন করিতেছেন। আবার স্থানে স্থানে ফলবান্ অমৃতবৃক্ষ রোপণ করিতেছেন। এইরূপে বেশ্যা দস্যু ও মায়াবাদী প্রভৃতি বিষবৃক্ষ ছ, তাহা নষ্ট করিলেন। তুকারামের ন্যায় ফলবান্ বৃক্ষ রোপণ করিলেন। ভু উন্মাদের মত যাইতেছেন, কিন্তু কাজের ভুল হইতেছে না। সমুদ্রধার য়া চলিয়াছেন, কিন্তু মাঝে মাঝে অভ্যন্তরে যাইতেছেন, কেন যাইতেছেন, হা তাঁহার কার্য্যের দ্বারা পরে প্রকাশ পাইতেছে। অর্থাৎ আচার্য্য সৃষ্টি করা।

কোন মহাপুরুষ কি অবতার যদি কোন নূতন ধর্ম্ম প্রচার করেন, তবে থমে কিছুকাল সেই অবতারের শক্তিতে উহা বৃদ্ধি পায়। পরে মনুষ্যের রতে আবার উহার শক্তির হ্রাস হইয়া পড়ে। এইরূপ ধর্ম্ম-গ্লানি লে, শ্রীভগবান্ সেখানে আবার অবতীর্ণ হইয়া, আবার সেই ভক্তি ধর্ম্ম পন করেন, ইহা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখের বাক্য। তাই প্রভু যখন । প্রচার করিলেন, তখন এই ধর্ম্ম ভারতবর্ষের সমুদায় ধর্ম্মকে দুর্ব্বল রিয়া ফেলিল। এই বাঙ্গলায়, শ্রীনিবাস আচার্য্য-প্রভুর সময়, শাক্ত । প্রায় যায় যায় হইয়াছিল। কিন্তু গৌড়ে আবার ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণের বিপত্য বাড়িয়া গেল, আর এখন বৈষ্ণব ধর্ম্মের ছায়ামাত্র আছে।

সেইরূপ প্রভু যদিও সমুদায় দক্ষিণদেশ উত্তেজিত করিয়া গেলেন, কিন্তু থানে ধর্ম্মের আবার নির্জীব ভাব উপস্থিত হইয়াছে। তবু দক্ষিণে, প্রায় দায় স্থানে, বৈষ্ণব ধর্ম্মের আর এক আকার হইয়াছে। তুকারামের কাগুলি ঠিক আমাদের গৌড়িয় বৈষ্ণবের মত। আমি বম্বে রে, আমাদের গৌড়িয় কীর্ত্তন শুনিয়াছি। বিখ্যাত ইতিহাস লেখক য়চরণ শাস্ত্রী বম্বে পরিভ্রমণকালীন সমুদ্র তীরে শ্রীবর্দ্ধন নামক স্থানে

একটী বৈষ্ণবের মঠ দেখিতে পাইয়াছিলেন। অনুসন্ধানে জানিলেন যে উহা বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী অবধুতের মঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ: শুনিলেন যে, খ্যাত নামা গৌরভক্ত পরম পণ্ডিত বিশ্বনাথ তাঁহার শেষ জীবন শ্রীবর্দ্ধনে যাপ করেন। হইতে পারে স্বয়ং বিশ্বনাথ সেখানে গমন করেন নাই, ঐ ম তাঁহার শিষ্য দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল। তত্রাচ, মহাপ্রভুর একজ *গৌড়ির ভৃত্য কর্ত্তৃক ঐ মঠ যে স্থাপিত হয়, সে বিষয়ে আর সন্দে* নাই। রামযাদব বাগচি ইলোরানগরে যাইয়া রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি দেখিলেন পূর্ব্বে বলিয়াছি, অগ্রে দক্ষিণে বৈষ্ণবগণ দ্বিভুজ মুরলীধর, কি রাধাকৃষ্ণে যুগল মূর্ত্তি ভজনা করিতেন না; তাঁহাদের সেবার বস্তু ছিলেন, লক্ষ্মী জনার্দ্দন। অর্থাৎ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী নারায়ণ আর লক্ষ্মী। শ্রীকৃষ্ণে অন্যান্য মূর্ত্তিও দক্ষিণে, পূজিত হইত, যেমন বিঠল দেব। দক্ষিণে বৈষ্ণবগণের সর্ব্বপ্রধান মন্দির, শ্রীরঙ্গ পত্তন। সেখানে ভজনীয় বস্তু লক্ষ্মী জনার্দ্দন। তবে দক্ষিণে যে একেবারে রাধাকৃষ্ণ ভজন ছিল না, তাহা বলা যা না। যদিও ছিল তবে অতি বিরল। মহাপ্রভু যাইয়া রাধাকৃষ্ণ ভজ প্রচলিত করিলেন। অতএব দক্ষিণে যেখানে রাধাকৃষ্ণের মন্দির দেখিবে তাহার প্রত্যক্ষ কি পরোক্ষ উৎপত্তির কারণ যে মহাপ্রভু, তাহার সন্দে নাই। রামযাদব শুনিলেন যে, সেই রাধাকৃষ্ণের মন্দিরের সম্মুখে প্রভ নৃত্য করিয়াছিলেন।

আপনারা অগ্রে পাঠ করিয়াছেন যে, মহাপ্রভু ত্রিপতি নগরে গম করেন। ইহা আরকট জেলায়, মান্দ্রাজ হইতে বহুদূরে নয়। সেখানে সাহিত্য সেবী শ্রীমান গোপাল শাস্ত্রী অল্প দিন হইল গিয়াছিলেন। সেখানে যাইয় একটী তৈলঙ্গিপদ শুনিলেন। যথা:—

চেয়ে দেখ তুলু গোসাঞি বাঙ্গালার বীর।
আর কোথায় কে দেখচ এমন খোলা শির?

অর্থাৎ ভারতবর্ষের সমস্ত স্থানে লোকে মাথায় আবরণ দিয়া থাকে, "লাঙ্গাশির" কেবল বাঙ্গালায়। সেই সব দেশের লোকের বিশ্বাস যে, স্ত্রীলোকের লাঙ্গাশির দেখিলে সে দিন তাহার উপবাস করিতে হয়। * ডুলু গোসাঞি বাঙ্গালী, অতএব তাহার মাথার কোন আবরণ ছিল না। তাহা হইতেই এই তৈলঙ্গি কবিতাটী হইয়াছে। সে যাহা হউক, ডুলু গোসাঞি কে? তিনি বাঙ্গালি, তাহা জানা গেল, তিনি একটি প্রধান লোক ছিলেন সন্দেহ নাই। অর্থাৎ তিনি ঐ ত্রিপতিতে অবশ্য খ্যাতাপন্ন ছিলেন, তাহা না হইলে গ্রাম্য কবি, তাহাকে একটী কবিতার নায়ক কেন করিবে? অতএব তিনি কে? অনুসন্ধানে শ্রীল গোপাল শাস্ত্রী জানিলেন যে, তিনি একজন বৈষ্ণব মহান্ত, এখানে ছিলেন, এবং তাহার সমাধি, সেখানে পর্ব্বতের উপরে আছে। এই কথা শুনিয়া গোপাল বাবু প্রভৃতি অনেকে পদব্রজে অতি উচ্চ যে গোকর্ণ গিরি, তাহার উপরে উঠিলেন। দেখেন যে, পর্ব্বত নিবীড় জঙ্গলে পূর্ণ। পর্ব্বতে বহুতর গুহা আছে, তাহার মধ্যে সাধু বাস করিয়া ভজন করিতেন, হয় ত এখনও করিতেছেন। তাহারা একটী গুহায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, তাহার অভ্যন্তরে মন্দির, মনোহর কূপ, পুষ্পোদ্যান ও বাসের নিমিত্ত ছোট ছোট কুটীর। এই ত্রিপতিতে এখনও গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্য্য আছেন। এই গোকর্ণগিরি বৈষ্ণবগণের একটী মহাপীঠ

---

* পুনা নগরে শ্রীযুক্ত মহাদেব রাণাডে আর আমি একখানা অনাবৃত গাড়িতে অর্থাৎ ফেটিনে বেড়াইতেছিলাম। আমার মাথা খোলা। মহারাষ্ট্রী রমণীগণ কূপে জল তুলিতেছিলেন। এমন সময় রাণাডে আমাকে বলিলেন, তোমার রুমাল দিয়া তোমার মস্তক আবরণ কর, ঐ দেখ ঐ সব স্ত্রীলোকে তোমাকে গালি দিতেছে, যে হেতু অদ্য তাঁহাদের উপবাসী থাকিতে হইবে। আমি কাজেই তাহাই করিলাম।

বলিয়া বিখ্যাত। দুলু গোসাঞির নাম দুর্ল্লভচন্দ্র সেন, পরে ভেক লইয়া দুলু গোসাঞি হইলেন। তাহার সমাধি অদ্যাপি সেখানে পূজিত হইতেছে। দুর্ল্লভ গোসাঞির আশ্রমে মহাপ্রভু পূজিত হইতেন, গোসাঞির অন্তর্দ্ধানের পর সেই বিগ্রহ কম্বোকাননের একজন বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ লইয়া গিয়াছেন। ও সেই শ্রীবিগ্রহ এখনও সেখানে পূজিত হইতেছেন। কম্বোকানন কুম্ভকর্ণের সরোবর বলিয়া বিখ্যাত ছিল। দুর্ল্লভ গোস্বামীর পাঠ্য গ্রন্থের মধ্যে চৈতন্য চরিতের কয়েক পৃষ্ঠা এখনও ওখানকার বৈষ্ণব-গণের মধ্যে রক্ষিত আছে।

মনে করুন, এই ত্রিপতি নগরে, প্রভুর সেখানে যাইবার পূর্ব্বে, একটীও বৈষ্ণব ছিলেন না। ছিলেন কেবল রামায়তগণ। তাহারা শ্রীরামের উপাসক। তাঁহাদের মধ্যে, প্রধান মথুরা স্বামী প্রভুর সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়া, পরে তাহার চরণে আশ্রয় লইলেন।

প্রভুর ধর্ম্ম কিরূপে উত্তর পশ্চিমে প্রচারিত হইয়াছেন, তাহা উল্লেখ করিতে গুঞ্জমালী, চক্রপাণি প্রভৃতি প্রচারকের নাম করিয়াছি। এইরূপে সুরাটে, গুজরাটে, মালবারে, লাহোরে ও সিন্ধুদেশে, প্রভুর ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। পণ্ডিত অম্বিকা দত্ত ব্যাস ধর্ম্ম প্রচারার্থ দেরাগাজিখায় গিয়াছিলেন। তিনি সিন্ধু নদী পার হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের মন্দির দেখিলেন ও দেখিলেন যে উহাতে বিগ্রহ আছেন। আর দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন যে, মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ের ৫০।৬০ জন বৈষ্ণব সেখানে আছেন।

মহাপ্রভুর লীলাকথা এখনও বাহিরে প্রকাশ হয় নাই। যত প্রকাশ পাইবে ততই তাঁহার নূতন নূতন কীর্ত্তি জানা যাইবে। প্রভুর লীলা যখন তেলুগু, তৈলাঙ্গ ও মহারাঠী ভাষায় প্রকাশ হইবে, তখন উহা সর্ব্বসাধারণে জানিবেন। আমার বিশ্বাস যে, অনুসন্ধান করিলে ভারতবর্ষের অনেক স্থানে প্রভুর অসংখ্য কীর্ত্তি পাওয়া

যাইবে. কিন্তু সে সমুদায় ক্রমে প্রকাশ হইবে, আমাদ্বারা অবশ্য হইবে না। পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে, সম্রাট আকবর তানসেনকে সঙ্গে করিয়া সনাতন গোস্বামীকে দর্শন করিতে আইসেন। এ কথা কোন গ্রন্থে পাই নাই, তবে একটী পদে পাইয়াছি; যথা :—

জিউজিউ মেরে মনচোরা গোরা।
আগোইলা চেত রসে ভোরা॥
খোল করতাল বাজে ঝিকি ঝিকিয়া।
ভজন আনন্দে নাচে লিকিলিকিয়া॥
পদ দুই চারি চলু নট নটনটিয়া।
থির নাহি হোয়ত আনন্দে লিখিয়া॥
ঐছন পঁহুকে যাও বলিহারি।
সাহ আকবর তেরি প্রেম ভিকারী॥

তাহার পুত্র জাহাঙ্গির যে বৃন্দাবনে গোস্বামী দর্শন করিতে আইসেন আর তাঁহাকে দেখিয়া স্তম্ভিত হয়েন, তাহা তিনি তাঁহার জীবনী গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন।

প্রভু দক্ষিণে আর এক মহৎ কার্য্য করেন। সেখানে বিল্বমঙ্গলকৃত কৃষ্ণ কর্ণামৃত, ও ব্রহ্ম সংহিতা এই দুইখানি পুস্তক সংগ্রহ করেন। যদিও ব্রহ্ম সংহিতা অমূল্য গ্রন্থ, তবে সেরূপ গ্রন্থ লেখা একেবারে অসম্ভব নয়, কিন্তু কর্ণামৃত লিখে কাহার সাধ্য? কেবল তাহারি সাধ্য যিনি কৃষ্ণের পূর্ণ কৃপা পাত্র। শ্রীকৃষ্ণের তাঁহার প্রতি এত কৃপা কেন হইল? তাঁহার নয়ন রমণীর রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল, তাহাই বেলের কাটা দিয়া সে দুটী নয়ন ধ্বংশ করেন। কাজেই কৃষ্ণের কৃপাপাত্র হইলেন।

প্রভুর প্রকাশের পূর্ব্বে মাধুর্য্য ভজন যাহা কিছু ছিল, তাহা বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, জয়দেব, রামরায়, বিল্বমঙ্গল জগতে দিয়াছিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

প্রভু ২৪ বৎসর বয়সে অবতাররূপে প্রকাশিত হয়েন। সেই অবধি তাঁহার প্রকৃত কার্য্য আরম্ভ। তবু তাহার চারি বৎসর পূর্ব্বে, পূর্ব্ববঙ্গে নাম প্রচার করেন। তাঁহার প্রকৃত কার্য্য কি বলিতেছি। তাঁহার এক কার্য্য অন্তরঙ্গের সহিত, ও আর এক কার্য্য বহিরঙ্গের সহিত। অন্তরঙ্গের সহিত তাহার যে কার্য্য সে কথা পরে বলিব। বহিরঙ্গ সঙ্গে তাঁহার এই কার্য্য যে, শ্রীভগবানের প্রকৃতি ও ভজন কিরূপ, তাহা শিক্ষা দেওয়া। যে অবধি মনুষ্য সৃষ্টি হইয়াছে, সেই অবধি জীবে শ্রীভগবানকে একটী অসুর সাজাইয়া তাঁহাকে ভজনা করিতে গিয়া কেবল তাঁহার গ্লানি করিয়াছে। প্রভু শিক্ষা দিলেন যে, শ্রীভগবানের প্রকৃতি কিরূপ, ও তাঁহার ভজন কিরূপ।

ধর্ম্ম প্রচার কার্য্য অন্যান্য মহাপুরুষে পূর্ব্বে করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের পদ্ধতি ও প্রভুর পদ্ধতি স্বতন্ত্র। যীশুখৃষ্ট চারি বৎসর পরিশ্রম করিয়া ক্ষুদ্র লোকের মধ্যে মোটে দ্বাদশটি শিষ্য পাইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে একজন তাঁহার সহিত ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল। মহম্মদ মদিনা সহর হইতে অনুগত সংগ্রহ করিয়া মক্কা আক্রমণ করিয়া জয় করিলেন, করিয়া এক দিনে নগরের সমুদায় লোককে তাঁহার মতে আনিলেন। কারণ তিনি এই নিয়ম করিলেন যে, যে ব্যক্তি তাঁহাকে ঈশ্বর প্রেরিত বলিতে অস্বীকার করিবে, তাহাকে তিনি প্রাণে বধ করিবেন। কাজেই এক মুহূর্ত্তে নগর সমেত লোক তাহার অনুগত হইল।

কিন্তু প্রভুর প্রচার পদ্ধতি স্বতন্ত্র। তিনি প্রায় সমুদায় ভারতবর্ষ

ভ্রমণ করিলেন, করিয়া তাঁহার অনুমোদিত যে ধর্ম্ম, তাহা প্রচার করিলেন। জীবকে বুঝাইলেন কিরূপে? বক্তৃতা করিয়া, কি তর্ক করিয়া নয়, তবে আপনি আচরিয়া। সহস্র লোকের মধ্যে তিনি আপনি কৃষ্ণ-প্রেম দ্বারা অভিভূত হইয়া দেখাইলেন যে, কৃষ্ণপ্রেম কি। আর তাহা দেখিয়া তাহাদের প্রায় সকলেরই সেই পরমধন লাভ করিতে প্রগাঢ় লোভ হইল। এইরূপে তিনি ৪।৫ বৎসরকাল প্রচার করিয়া দেশের শীর্ষ স্থানীয় লক্ষ লক্ষ লোককে বৈষ্ণব ধর্ম্মে আনয়ন করিলেন। এইরূপে নবদ্বীপের প্রধান অধ্যাপক সার্ব্বভৌম, সন্ন্যাসীর প্রধান প্রকাশানন্দ, বৈষ্ণবগণের প্রধান আচার্য্য শ্রীঅদ্বৈত, স্বাধীন ভূপতির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী সম্রাট প্রতাপরুদ্র, গৌড়ের রাজার মন্ত্রী প্রভৃতিকে আপনার মতে আনিয়া নিজ ধর্ম্ম প্রচারের সুবিধা করিলেন। অন্যান্য ধর্ম্ম প্রচারকগণ আপনারা বড় অধিক প্রচার করিতে পারেন নাই। প্রকৃত প্রচার তাহাদের শিষ্য দ্বারা হইয়াছিল। যীশু যখন প্রাণ ত্যাগ করেন তখন তাহার একাদশটী শিষ্য মাত্র ছিল। প্রভু কিন্তু স্বয়ং যত প্রচার কার্য্য করেন, ভক্তগণ দ্বারা তাহার শতাংশের একাংশ ও হয় নাই। এই শিষ্যগণের মধ্যে প্রধান নিতাই, অদ্বৈত, শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি প্রভুর ধর্ম্ম দৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর স্থাপিত করিতে হইলে একটি শাস্ত্রের প্রয়োজন। যদি খৃষ্টীয়ানদের ম্যাথিউ প্রভৃতি ৩।৪ খানা খৃষ্টের লীলা গ্রন্থ না থাকিত, তবে তাহাদের ধর্ম্ম অতি অল্প দিনের মধ্যে লোপ হইয়া যাইত। মুসলমানদের কোরাণ না থাকিলে তাহাদের ধর্ম্মেরও সেই অবস্থা হইত। বৈষ্ণবদের সেই নিমিত্ত একটী শাস্ত্রের প্রয়োজন। প্রভু তাহা করাইলেন।

রূপ ও সনাতনকে আপন কাছে বসাইয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন। রূপকে প্রয়াগে, সনাতনকে কাশীতে, এইরূপে রূপকে দশ দিবস, ও

সনাতকে দুই মাস শিক্ষা দিলেন। প্রভু আমাদের সমুদায় শাস্ত্র ফেলিয়া দিয়া, নূতন একটি করিতে পারিতেন। একেবারে চুরমার করিয়া সেই দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া পুনর্ব্বার গ্রন্থন করা পদ্ধতি প্রভুর অনুমোদনীয় নহে। তিনি সমুদায় শাস্ত্র রাখিলেন। এমন কি, তিনি তেত্রিশ কোটী দেবতা রাখিলেন, জ্ঞানবাদীদিগের তত্ত্ব কথা রাখিলেন। সে সমুদায় রাখিয়া বৈষ্ণব শাস্ত্রের ভিত্তিভূমি করা প্রভুর মনের ইচ্ছা। মনে ভাবুন এ অতি অসম্ভব ব্যাপার। শিব থাকিবেন, কালী দুর্গা থাকিবেন, অথচ শ্রীরাধাকৃষ্ণের রাস রাখিবেন। এই সমুদায় দেব দেবী উপাসনা, আর ব্রজের নিগূঢ় রস, ইহাদের সামঞ্জস্য করা ত বহুদূরের কথা, বিচার করিলে ইহারা পরস্পরের ধ্বংসকারী। রস বিচারের সময় পাঠক দেখিবেন, কালী পূজা ও রাধাকৃষ্ণ ভজন পরস্পর ঘোর বিরোধী। দ্বৈতবাদে ও অদ্বৈতবাদে সেইরূপে অহিনকুলতা সম্বন্ধ, কিন্তু প্রভু এইরূপ সকল বিবাদ মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন।

আবার, বেদ হিন্দুদিগের সর্ব্বপ্রধান সম্মানের বস্তু। এই বেদে কি বৈষ্ণব ধর্ম্মের পোষকতা করে? তাহা যদি না করে তবে হিন্দুরা এই ধর্ম্ম লইবে না। যদি পোষকতা করে, তবে বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভিত্তি ভূমি দৃঢ়তর হইবে। অতএব এই অসম্ভব কার্য্য, বেদের দ্বারা বৈষ্ণব ধর্ম্মের পোষকতা করা, তাহাও প্রভু করিলেন।

দ্বিতীয় কার্য্য ন্যায় শাস্ত্র অর্থাৎ শুদ্ধ বিচার দ্বারা বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপন করা। বিচারে এরূপ দেখাইতে হইবে যে, শ্রীভগবান আছেন, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যময়, আর তাঁহার ভজন করিতে হইলে, তাঁহার ঐশ্বর্য্য অংশ বর্জ্জন না করিলে উহা সম্ভব হয় না। ইহার মধ্যে শেষ তত্ত্বটী কেবল বৈষ্ণবগণ মান্য করেন, আর কেহ করেন না।

আর এক কাজ রস বিস্তার। বৈষ্ণবদিগের সর্ব্বপ্রধান ভজন ব্রজের

রস লইয়া। সে রস কি তাহার একটি নূতন শাস্ত্র করা। এই রস পূর্ব্বে জগতে ভজনের নিমিত্ত কদাচিৎ ব্যবহৃত হইত। এরূপ ব্যবহার পূর্ব্বে ছিল না।

চতুর্থ বৈষ্ণবদিগের স্মৃতি করা। ইহারা সমাজ বদ্ধ হইয়া থাকিবে, অতএব নিয়ম চাই। আবার, নিয়মগুলি এরূপ হওয়া চাই যাহা বৈষ্ণব মাত্রই মান্য করিতে বাধ্য হইবে। এই সমস্ত শাস্ত্র কিরূপে লিখিতে হইবে, ইহার বিন্দু বিসর্গ কেহ জানিতেন না। প্রভুর এই সমুদায় অমানুষিক কার্য্য করিতে হইবে। আর তিনি করিয়াছিলেন কিরূপে, বলিতেছি। নূতন বৃন্দাবন সৃষ্টি ও বৈষ্ণব শাস্ত্র সৃষ্টি এ উভয় কার্য্য তিনি সমাধা করিয়া গিয়াছেন। প্রভু প্রধানতঃ উপরি উক্ত দুই ভাই রূপ সনাতন দ্বারা এই দুই কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন।

বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালীন প্রয়াগে, রূপ ও অনুপমের সহিত প্রভুর দেখা হইল। অমনি প্রভু সেখানে রহিয়া গেলেন, কেননা, রূপকে শিক্ষা দিবার জন্য। দশ দিবস শ্রীরূপকে শিক্ষা দিয়া বৃন্দাবনে পাঠাইলেন। বলিলেন সেখানে যাও যাইয়া কার্য্য উদ্ধার কর।

পরে সেখান হইতে কাশীতে আগমন করিলেন, সেখানে সনাতনের সহিত সাক্ষাৎ হইল, এবং তাহাকে দুই মাস শিক্ষা দিলেন। অতএব যদিও প্রভু প্রেমে সর্ব্বদা উন্মত্ত, তবু জীবের মঙ্গল কামনা সর্ব্বদা মনে জাগরুক রাখিতেন। প্রভু জননী, স্ত্রী, বন্ধুগণ ত্যাগ করিয়া নীলাচলে রহিয়াছেন, সেখানে অনেকের সহিত প্রীতি হইয়াছে। এখন আবার তাহাদের ত্যাগ করিয়া কাশীতে কি প্রয়োগে নির্জ্জন কুটীরে বসিয়া, সনাতনকে ও রূপকে তত্ত্ব কথা শিক্ষা দিলেন। এইরূপে প্রায় আড়াই মাস কাটাইলেন। ইহাদের কি শিক্ষা দিয়াছিলেন, ইহার আভাষ পূর্ব্বে বলিয়াছি, অর্থাৎ যে সমুদায় লোক তাঁহার ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে, তাহাদের নিমিত্ত শাস্ত্রের প্রয়োজন তাই সে সমুদায় শাস্ত্র কি এবং তাহাতে কি কি সন্নিবেশিত থাকিবে তাই

শিখাইলেন। সমুদায় শাস্ত্র পরিশেষে গোস্বামিগণ প্রকাশ করেন, কিন্তু তাহারা কি লিখিবেন কিছুই জানিতেন না। সে সমুদায় প্রভুর নিকট শিক্ষা করিলেন, করিয়া, যথা চরিতামৃতে ঃ—

তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।
নিবেদন করে দন্তে তৃণগুচ্ছ লইয়া॥
নীচ জাতি নীচ সেবী মুঞিত পামর।
সিদ্ধান্ত শিখাইলে এই ব্রহ্মার অগোচর॥
মোর তুচ্ছমন এই সিদ্ধান্তামৃত সিন্ধু।
মোর মন ছুঁতে নারে ইহার এক বিন্দু॥
পঙ্গু নাচাইতে যদি হয় তোমার মন।
বর দেহ মোর মাথে ধরিয়া চরণ॥
মুই যে শিখাইনু তোরে স্ফুরুক সকল।
এই তোমার বল হইতে হবে মোর বল॥
তবে মহাপ্রভু তাঁর শিরে ধরি করে।
বর দিল এই সব স্ফুরুক তোমারে॥

পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রেম ভক্তির মত, বেদ সম্মত না, ইহা না দেখাইলে হিন্দুগণ উহা লইবে না। কিন্তু জগতে সকলে এরূপ জানিত যে ; বেদ, প্রেম ভক্তি ধর্ম্মের বিরোধি। তাই সার্ব্বভৌম, প্রভুকে, তাঁহার নাচন গায়ন ছাড়াইবার নিমিত্ত বেদ পড়াইতে চাহেন। প্রভু প্রথম সার্ব্বভৌমের সহিত বিচারে দেখাইলেন যে, বেদ প্রেমভক্তি ধর্ম্মের বিরোধী নয়, বরং পক্ষপাতী। তাই সার্ব্বভৌম বলিলেন যে, প্রভু, তুমি স্বয়ং বেদ। ঠিক এই লীলা কাশীতে হয়, তখনকার সন্ন্যাসীর স্থান কাশী, আর কাশীর প্রধান সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ সরস্বতী। প্রভু বেদের প্রকৃত অর্থ কি, তাহাকে বুঝাইলেন, অর্থাৎ দেখাইলেন যে, বেদ প্রেমভক্তি

শ্ম অনুমোদন করিয়াছেন। পূর্ব্বে যে সরস্বতী ঠাকুর, প্রভুর ভাব-গুলিকে দুষিয়াছিলেন, প্রভুর কৃপা পাইলে তাঁহার মত কিরূপ পরিবর্ত্তিত হয়, তাঁহার শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত গ্রন্থে দেখা যাইবে।

এই প্রথম প্রভু দেখাইলেন যে, বেদ তাঁহার ধর্ম্মের পক্ষপাতী। তাহার পরে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এ সম্বন্ধে বৃহৎ গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। • কিরূপে, তাঁহার সে কাহিনী অতি অদ্ভুত! তাহার পরে শ্রীভগবানের প্রকৃতি কিরূপ, ভজন সাধন কিরূপ, প্রেমভক্তি কিরূপ ইত্যাদি সমুদায় বিস্তার করিয়া শিক্ষা দিলেন। আর শিক্ষা দিলেন যে, প্রেম ভক্তি-রস দিয়া যে ভজন করিতে হইবে, সে সমুদায় রস কি।

তাহার পরে কিরূপে বৈষ্ণব স্মৃতি করিতে হইবে তাহাও শিখাইলেন। যেমন রঘুনন্দনের স্মৃতি শাক্তদের নিমিত্ত, সেইরূপ বৈষ্ণবদের স্মৃতি হরি-ভক্তি বিলাস। গোস্বামী গোপাল ভট্ট, গোস্বামী সনাতনের নিকট এই সমস্ত তত্ত্ব শিক্ষা করিয়া এই বৈষ্ণব স্মৃতি প্রকাশ করেন। এইরূপে বৈষ্ণব শাস্ত্রের সৃষ্টি হইল। এই সমুদায় বৈষ্ণব গ্রন্থের তালিকা দিতে অনেক স্থান লাগিবে, তবে প্রধান কয়েকটীর নাম ক্রমে করিতেছি। প্রভুর লীলা লেখক শ্রীকবিরাজ গোস্বামী মোটামুটী বলিয়াছেন যে, তাঁহারা লক্ষ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

এখন বৃন্দাবন গঠন করিতে হইবে। যখন প্রভু প্রথমে লোকনাথ ও ভুগর্ভকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন, তখন তাঁহারা যাইয়া দেখিলেন যে, বৃন্দাবনে কিছু নাই, কেবল আছেন যমুনা ও গোবর্দ্ধন। তাহার পরে প্রভু গেলেন। সেখানে যাইয়া শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড প্রভৃতি কয়েকটী লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করিলেন। তাহার পরে রূপ সনাতনকে বৃন্দাবনে পাঠাইলেন।

সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রবোধানন্দ সরস্বতীকেও সেখানে প্রেরণ করিলেন। ইহারা কেহই প্রভুকে ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে যাইতে চাহেন নাই, কিন্তু

প্রভু তাঁহাদিগকে আপনার নিকটে থাকিতে দিলেন না। বলিলেন, বৃন্দাবনে সত্বর যাইয়া আমার কার্য্য উদ্ধার কর। অতএব এই করঙ্গ, কৌপীন এবং কাঁথাধারী দুই চারিটী বস্তু বৃন্দাবন স্থাপন করিতে প্রেরিত হইলেন, তাঁহারা প্রভুর শক্তিতে বলীয়ান।

তখন মিশ্রের আলয়ে তাঁহার পুত্র রঘুনাথ ভট্টকে বলিলেন, পিতামাতার সেবা কর, তাঁহাদের অন্তর্ধানে আমার এখানে আসিও, বিবাহ করিও না। রঘুনাথ ভট্ট তাহাই করিলেন। তখন প্রভু তাঁহাকে কিছুদিন সঙ্গে রাখিয়া তাহাকে শক্তি সঞ্চার করিয়া বলিলেন, যাও বৃন্দাবনে যাও। রঘুনাথ কান্দিলেন, যাইতে চাহিলেন না, তাহা হইল না, যাইতে হইল।

শ্রীরঙ্গপত্তনে বালক গোপালকে, রঘুনাথকে যে আজ্ঞা করেন, ঠিক তাহাই করেন। গোপাল, পিতামাতা গোলকগত হইলে, আজ্ঞা নাই বলিয়া নীলাচলে যাইতে পারিলেন না, একেবারে বৃন্দাবনে গেলেন। জীব এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামী সর্ব্বশেষে বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু বৃন্দাবন গঠনের ভার, প্রধানতঃ রূপসনাতন ও প্রবোধানন্দের উপর হইল। প্রবোধানন্দের তত নাম নাই, তাহার কারণ রূপসনাতনের তাঁহার সহিত একটু মতের পার্থক্য ছিল। সে আর কিছু নয়, রূপসনাতনের কার্য্য রাধাকৃষ্ণের ভজন প্রচলন করা, আর প্রবোধানন্দের ভজনীয় শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণ নহেন।

প্রবোধানন্দের শ্রীনবদ্বীপে আসা উচিত ছিল। বোধ হয় তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া, প্রভু তাঁহাকে বৃন্দাবনে শঙ্করীয় মায়াবাদিগণ হইতে ভক্তিধর্ম্ম রক্ষা করার নিমিত্ত বৃন্দাবনে রাখেন। শ্রীজীব গোস্বামী রূপ এবং সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র ও রূপের শিষ্য। তিনি রূপসনাতনের ছোট ভাই অনুপমের পুত্র। অনুপম অদর্শন হইলেন, রূপসনাতন উদাসীন হইলেন। রূপ বাড়ী আসিয়া অতুল সম্পত্তি নানা ভাল ভাল

কার্য্যে নিয়োগ করিয়া, তাঁহাদের রাজসিংহাসনে শ্রীজীবকে বসাইলেন। তখন নিঃসম্বল হইয়া একেবারে বৃন্দাবনে গমন করিলেন।

শ্রীজীব কিছুকাল রাজত্ব করিলেন, কিন্তু উহা ভাল লাগিল না, তিনি শ্রীনবদ্বীপে গমন করিলেন, করিয়া নিতাইর স্মরণ লইলেন। বলিলেন, আমি সংসারে থাকিতে পারিতেছি না, অথচ পিতৃব্যের ইচ্ছায় আমি রাজত্ব করি। নিতাই বলিলেন, প্রভু শ্রীবৃন্দাবন তোমাদের গোষ্ঠিকে দিয়াছেন। তোমার পিতৃব্যদ্বয় বৃদ্ধ হইলে তখন বৃন্দাবন কে রক্ষা করিবে? তুমি বৃন্দাবন যাও। এই আজ্ঞা পাইয়া শ্রীজীব বৃন্দাবন যাইয়া উপস্থিত। নিতাইর আজ্ঞা লইয়া আসিয়াছেন, কাজেই পিতৃব্যদ্বয় তাঁহাকে রাখিলেন।

শেষে রঘুনাথ দাস, (প্রভু ইঁহাকে গোস্বামী পদ দিয়া কাছে রাখেন), প্রভুর অন্তর্দ্ধানে বৃন্দাবনে গমন করিয়া সেখানে রহিলেন, এই হইল ছয় গোস্বামী।

নূতন যে বৈষ্ণব সাহিত্য হইল, তাহাতে বেদের আকার পরিবর্ত্তিত হইল। সে হিসাবে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীকে একজন ব্যাস বলা যায়; বৈষ্ণব স্মৃতি যেরূপ সংস্কৃত ও পূর্ণ, এরূপ রঘুনন্দনের স্মৃতি নয়।

ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে জীব গোস্বামী যেরূপ সন্দর্ভ লিখিয়াছেন, এরূপ গ্রন্থ জগতে নাই। ইহা অনুবাদ করিলে পশ্চিমদেশীয় পণ্ডিতগণ দেখিবেন যে, ঐ গোস্বামিগণ আধ্যাত্মিকজগতের কত অভ্যন্তরে গিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের সৃষ্টি এক প্রকার বৈষ্ণব ধর্ম্ম হইতে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

প্রভুর শেষ লীলা।

হৃদয়েরি রাজা প্রাণারাম! অনাথিনী করি,
কোথা গেলে প্রাণনাথ।
তোমা বিনা ভুবন আন্ধার ॥ ধ্রু
কবে তোমায় পাব চাঁদ, আমার চাঁদ চাঁদ।
আমি তোমার চিরদিনের, হে পরাণের ফাঁদ ॥
গৌরচন্দ্র নাম আমার কর্ণে প্রবেশিল।
সেই হতে মতি গতি সব ফিরি গেল ॥
অলক্ষিতে তুমি আমার হিয়ায় প্রবেশিলে।
কিছু নাহি জানি আমার কাছে কেন এলে ॥
বড় বড় কত লোক ছিল এ জগতে।
তাহা সব ছাড়ি কৃপা করিলে আমাতে ॥
তুমি জান তোমার মন আমি কিবা জানি।
প্রাণে মেরনা মোরে শুন গুণমনি ॥
তুমি ছাড়া মোর আর আশা কোথা নাই।
তুমি তেয়াগিলে বল যাব কার ঠাঁই ॥
আমি তোমায় খুঁজে বেড়াই হতভাগা অন্ধ।
দরশন দিয়ে আমার ঘুচাও মনের ধন্দ ॥
দেখা দিয়ে প্রাণ জুড়াও কোথায় মোর যাদু।
মধুময় তুমি নাথ মধু মধু মধু ॥

অনন্ত ভকত তোমায় ঘিরিয়া রয়েছে।
অতি ক্ষুদ্র বলরামে মনেতে কি আছে ?
আমি চাতকিনী তুমি নব জলধর।
তুমি পূর্ণচন্দ্র আমি চকোর কাতর ॥
আগে আসি বসো প্রভু মুখখানি দেখি।
এ দুঃখি দীন বালাই কর নাথ সুখী ॥

প্রভু দক্ষিণ হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন শুনিয়া নদিয়া হইতে দুই শত ভক্ত নীলাচলে দৌড়িলেন। হাটিয়া যাইতে অন্ততঃ তিন চারি সপ্তাহের পথ, আবার সেখানে রাসের দিন পর্য্যন্ত থাকিবেন। অতএব ৪।৫ মাসের সম্বল লইয়া, ৪।৫ মাসের নিমিত্ত সম্বল রাখিয়া, বাড়ী ত্যাগ করিয়া ভক্তগণ চলিলেন। যখন প্রভু দক্ষিণে, তখন নদিয়ার কি অবস্থা তাহা বাসুঘোষ এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন :—

গোরাবিনা প্রাণ কান্দে কি বুদ্ধি করিব।
সে হেন গুণের নিধি কি সাধনে পাবো ॥
কে আর করিবে দয়া পতিত দেখিয়া।
পতিত দেখিয়া কেবা উঠিবে কান্দিয়া ॥
গোরা বিনা শূন্য ভেল নদিয়া নগরী ইত্যাদি।

এই দুই বৎসর নদীয়া, শান্তিপুর, শ্রীখণ্ড, প্রভৃতি স্থানের ভক্তগণ রোদন করিয়া কাটাইয়াছিলেন। প্রভুর যেরূপ আকর্ষণ এরূপ জীবে সম্ভবে না।

তাঁহারা প্রভুকে দেখিতে যাইতেছেন। এদিকে প্রভু তাঁহার নিজের কার্য্য উদ্ধারের পথ পরিষ্কার করিতেছেন। নীলাচলে থাকিবেন, কেন না উহা হিন্দু রাজ্য। কিন্তু সে রাজ্যের রাজা যদি পাষণ্ড হয়েন, তবে সেখানে কিরূপে ধর্ম্ম প্রচার করিবেন? অতএব অগ্রে তাহাকে ভক্তি ধর্ম্ম অর্পণ প্রয়োজন। তুমি আমি হইলে ইহাতে কৃতকার্য্য হওয়া অসম্ভব ভাবিতাম।

প্রতাপরুদ্র বস্তুটি কি একবার দেখুন, তিনি এক বৃহৎ সাম্রাজ্যের যথেচ্ছাচারি সম্রাট। তাহার রাজ্য এক সময় ত্রিবেণী হইতে গোদাবরীর ওপারে পর্য্যন্ত হইয়াছিল। একবার ভারতবর্ষের মানচিত্র খুলিয়া দেখিবেন সে রাজ্য কত বড়। এইরূপ রাজাকে করায়ত্তে আনিতে হইবে, নতুবা সব কার্য্য পণ্ড হইবে।

প্রভু রাজাকে কিরূপে চরণানুগত করিলেন তাহা আপনারা জানেন। রথাগ্রে প্রভু মূর্চ্ছা গিয়াছিলেন, রথ আসিতেছে, তাঁহার শ্রীঅঙ্গে আঘাত লাগিবে সকলের এরূপ ভয় হইল। রাজা সেখানে দাঁড়াইয়া। তাই তিনি প্রভুকে ধরিলেন, অভিপ্রায় স্থানান্তরিত করিবেন, কিন্তু রাজার স্পর্শ মাত্র প্রভুর চেতন হইল, অমনি সেই লক্ষ লোকের সম্মুখে তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি অপমান করিলেন। বলিলেন, ছি! বিষয়ী লোকে আমায় স্পর্শ করিল? রাজা তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রভু লক্ষ লোকের সম্মুখে বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। সে বেচারী কি অস্পৃশ্য হাড়ি কি চামার? তা নয়, ক্ষত্রিয়; জগন্নাথের সেবক ও সাম্রাজ্যের অধিপতি, ভারতবর্ষের মধ্যে ঐশ্বর্য্যে হিন্দুগণের সর্ব্বপ্রধান। তাঁহাকে এইরূপ অপমান, আর অহেতুক অপমান! তাহাও নয়, তিনি প্রভুকে বাঁচাইতে গিয়াছিলেন, আর তাঁহাকে অপমান!

প্রতাপরুদ্রের সহিত এইরূপ ব্যবহার করিলেন, অথচ ত্রিবাঙ্কুরের ও বরদার রাজার সহিত বিনা আপত্তিতে ইষ্ট গোষ্ঠি করিলেন। তাহার প্রধান কার্য্য পতিত ও অস্পৃশ্য পামরকে আলিঙ্গন দান করা, অতএব প্রতাপরুদ্র তাঁহাকে স্পর্শ করায় দোষ কি হইল? প্রভুর নিগূঢ় অভিপ্রায় কি শ্রবণ করুন। তিনি যথেচ্ছাচারী সম্রাটকে চরণতলে আনিবেন, তাই তাহাকে প্রথমে দেখাইলেন যে, যদিও তিনি রাজা তবু পাষণ্ড অতএব অস্পৃশ্য। বস্তুতঃ রাজা অপমানিত হইয়া প্রভুর কৃপা আহরণের নিমিত্ত প্রাণপণ করিলেন।

তাহার পরে প্রভু উদ্যানে অচেতন হইয়া পড়িয়া আছেন, রাম রায়ের পরামর্শ অনুসারে রাজা তাঁহার পদতলে বসিয়া সেবা করিতে করিতে রাসের শ্লোক পড়িতে লাগিলেন। প্রভু চেতন পাইয়া উঠিয়া ইহাই বলিয়া রাজাকে আলিঙ্গন করিলেন—"কেগা তুমি আমাকে সুধা পিয়াইলে", ইহা বলিয়া চলিয়া গেলেন। রাজা ছিন্নমূল দ্রুমের ন্যায় পড়িয়া গেলেন। সেই আলিঙ্গনের দ্বারা প্রভু রাজার শরীরে প্রবেশ করিলেন, আর তখন প্রতাপরুদ্র চারিদিকে গৌরময় দেখিতে লাগিলেন। সেখানে ভক্তগণ বসিয়াছিলেন রাজা তাহাদের মধ্যে দিয়া যাইবার সময় সকলকে প্রণাম করিতে করিতে চলিলেন। এই প্রভুর সহিত রাজার গোপনে মিলন হইল।

তাহার কিছুকাল পরে প্রভু যখন গৌড়ে আগমন করেন তখন কটক অর্থাৎ প্রতাপরুদ্রের রাজধানী হইয়া আইলেন। সেই সময় প্রকাশ্যে প্রভুতে ও রাজাতে মিলন হইল। প্রভু বকুল তলায় বসিয়া, রামরায় প্রভুকে রাখিয়া রাজাকে আনিতে গিয়াছেন। রসিক রাম রায় রাজাকে এবার সাজাইয়া আনিলেন। রাজা আসিতেছেন, আসিতেছেন কিনা রাজবেশে, রাজ সজ্জায়। রাজা হস্তীর উপরে। মন্ত্রিগণ হস্তীর উপরে, সহস্র সহস্র অশ্বারোহী ও পদাতিক সমভিব্যাহারে ও রণবাদ্যের সহিত প্রতাপরুদ্র আইলেন।

দূর হইতে হস্তী হইতে অবতরণ করিয়া রাজা জোড় করে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়াছেন, প্রভু উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুই বাহু পসারিয়া রাজাকে আলিঙ্গন দিবেন, এই ভাব করিলেন, কিন্তু তাহা হইল না। রাজা দীঘল হইয়া সেই চরণে মস্তক দিয়া পড়িয়া গেলেন, সেই মণিমুক্তা খচিত মকুট শ্রীপদ স্পর্শ করিল।

রামরায় রসিক লোক, তিনি এইরূপ মিলনে আর কি দেখাইলেন, না, যে—

প্রতাপরুদ্র শ্রীভগবানকে জয় করিয়াছেন। আর যিনি শ্রীগৌরাঙ্গ, তিনি প্রতাপরুদ্র রাজার রাজা।

যুদ্ধের নিমিত্ত পথ বন্ধ ছিল, অথচ ভক্তগণ আসিতেছেন। প্রভুর ইচ্ছায় অনায়াসে পথ পরিষ্কার হইয়া গেল। আর পথের ভয় রহিল না। ভক্তগণ পুরীধামে আসিয়া দেখিলেন যে, রাজা, প্রজা ও মন্দিরের সেবক, অর্থাৎ সমগ্র পুরী প্রভুর চরণে আশ্রয় করিলেন।

প্রভু নিত্যানন্দকে দ্বাদশ জন ভক্ত সঙ্গে দিয়া গৌড়দেশে প্রচার করিতে পাঠাইলেন। নিতাই গৌড়ে কি করিলেন, তাহা একটু পরে বলিতেছি।

প্রভু স্বয়ং বৃন্দাবনে গমন করিলেন, আর সেই জঙ্গলময় স্থানে কয়েকদিন মাত্র ছিলেন। ইহার মধ্যে প্রধান প্রধান যে লুপ্ত তীর্থ তাহা উদ্ধার করিলেন, আর প্রত্যাবর্ত্তন সময় প্রবোধানন্দ ও রূপসনাতনকে শক্তি সঞ্চার করিয়া উজাড় বৃন্দাবন ও ভক্তিশাস্ত্র গঠন করিতে পাঠাইলেন। এইরূপে প্রভুর জগতের সমুদায় বাহিরের কার্য্য হইয়া গেল। আর তখনি শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর নিকট "বাউলকে কহিও বাউল" তর্জ্জা পাঠাইলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

মূলঘটনার মূলোৎপাটন।

এই প্রস্তাবে জীবের, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের, দুর্দ্দশার কথা কিছু বলিব। ১৪০৭ শকে শ্রীভগবান্ ধরাধামে আইলেন, তাহার পরে লক্ষ লক্ষ ভক্ত তাঁহার আশ্রয় লইলেন। তাহার পরে শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থান বৃন্দাবন সৃষ্টি হইল, বৈষ্ণবশাস্ত্র হইল, বড় বড় গ্রন্থ হইল, বেদ সংস্কৃত হইল, গোপী অনুগা ভজন প্রচলিত হইল, ইত্যাদি ইত্যাদি। ইহার মধ্যে মূল ঘটনা কি?

ইহার মধ্যে মূল ঘটনা প্রভুর অবতার অর্থাৎ শ্রীভগবানের মনুষ্যসমাজে উদয় হওয়া। আর অন্যান্য ঘটনা সেই মূল ঘটনার ফল বই নয়। ষট্‌সন্দর্ভ বড় গ্রন্থ সন্দেহ নাই, তবু সে মূল ঘটনা নয়, মূল ঘটনার ফল মাত্র। মূল ঘটনা **শ্রীভগবানের মনুষ্যের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করা।**

এই মূল ঘটনা কি প্রকাণ্ড ব্যাপার, আরো বিস্তার করিয়া বলিতেছি। সেটী এই যে, সেই মায়াতীত জ্ঞানাতীত অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর, যাঁহার নখচ্ছটা সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া যোগিগণ দেখিতে পান না, তাঁহার মনুষ্য-সমাজে উদয় হওয়া। শুধু উদয় হওয়া নয়, পঞ্চবিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত মনুষ্যের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করা, তাহাদের সহিত হাস্য ক্রন্দন, শয়ন, ভোজন ইত্যাদি করা। এরূপ ঘটনা জগতে কখন হয় নাই। যদি বল শ্রীকৃষ্ণ কি শ্রীরামচন্দ্র উদয় হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের কার্য্য ও উপদেশ কুজ্ঝটিকায় আবৃত। তাহাদের লীলা যে সত্য তাহার প্রমাণ নাই। শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা যে সত্য, তাহার অকাট্য প্রমাণ আছে, যিনি তল্লাস করিবেন তিনিই দেখিবেন। তিনি কি বলিয়াছেন, কি করিয়াছেন,

তাহা সমুদয় পাথরে খোদিতের ন্যায় জাজ্জ্বল্যমান মনুষ্যের চক্ষের উপরে তিনি রাখিয়া গিয়াছেন।

আমি একজন ক্ষুদ্র লোক, শুনিলাম (সে ত্রিশ বৎসরের কথা) যে, শ্রীগৌরাঙ্গ যখন জগতে বিচরণ করেন, তখন বহুতর শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি তাহাকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া মানিয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া আমি অতিশয় আগ্রহের সহিত তাঁহার লীলা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। হইয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে ক্লেশে মরিয়া গেলাম। কেন, বলিতেছি। আচার্য্যগণের নিকট গেলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম যে তাঁহারা তাঁহাদের প্রভুর কথা আমাকে বলুন। দেখিলাম, তাঁহারা প্রভুকে ভগবান্ বলিয়া মানেন, অথচ তাঁহার কথা কিছু জানেন না। তাঁহারা আমার নিকট বড় বড় শ্লোক আওড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু আমি শ্লোক লইয়া কি করিব? আমার পিপাসায় প্রাণ যাইতেছিল, আমাকে এক অঞ্জলী মোহরে কেন শান্তি দিবে?

কেহ কেহ বলিলেন, তুমি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পড়। তাই সেই গ্রন্থ পড়িতে গেলাম। দেখি, সেই গ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গের কথা, সেই অবতারের কথা, সেই মনুষ্য-দেহ-ধারী ভগবানের কথা অতি অল্প আছে, তবে আছে কি না সাত শত সংস্কৃত শ্লোক। একজন অতি পণ্ডিত গোস্বামী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বিষ্ণুপ্রিয়া তিনি কে? তিনি তাহাও জানেন না। আমার নিকট প্রথম জানিলেন তিনি কে।

অনেক তল্লাস করিতে করিতে শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থ পাইলাম। কোথা? না বটতলায়। বহুদিন, কদর্য্য রূপে ছাপা হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, কেহ কিনে না। যাঁহারা ক্রয় করেন, তাঁহারা শ্রীচরিতামৃত লয়েন, চৈতন্যভাগবতের সংবাদও রাখেন না। সেই পুস্তক পাইবা মাত্র আমি ভাল করিয়া উহা ছাপাইলাম। সেই প্রথমে, সেই পুস্তকখানি ভদ্রলোকের হাতে গেলেন।

দেখিলাম যে, তাহাতে সেই মূল ঘটনাটীর কথা অর্থাৎ প্রভুর লীলা-কথা আছে! কাজেই সে গ্রন্থ কেহ ক্রয় করে না, কেহ পড়ে না, কেহ জানে না!

পরে মুরারির কড়চার কথা জানিলাম, সেই প্রভুর লীলার আদিগ্রন্থ। মুরারি চক্ষে দেখিয়া প্রভুর সব লীলা লিখিয়াছেন। সে গ্রন্থ তখন একখানাও পাইলাম না। ভাবিলাম, প্রভুর ভক্তগণ বোধ হয় উহা পুড়াইয়া ফেলিয়াছেন কি জলে ভাসাইয়া দিয়াছেন। এই যে শ্রীভগবান্ ২৫ বৎসর মনুষ্য-সমাজে বিচরণ করিলেন, তাহার নিদর্শন কি ছিল? কিছুই না। তবে ছিল হরিভক্তিবিলাস, প্রমেয় রত্নাবলী, ষট্‌সন্দর্ভ। দশসহস্র উত্তম উত্তম দুর্ব্বোধ্য শ্লোক। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া কি বস্তু ইত্যাদি সংবাদ তাহাতে ছিল না। যাহা কিছু ছিল, চৈতন্যভাগবতে। অর্থাৎ শ্রীভগবান্ আমাদিগের এখানে আইলেন, তাঁহাকে লোকে টানিয়া ফেলিয়া দিল, তবে তাঁহার পরিবর্ত্তে বুকের মধ্যে গোটাকয়েক তত্ত্ব-কথা যত্ন করিয়া রাখিল। যদি বটতলায় দৈবাৎ একখণ্ড চৈতন্যভাগবত না পাওয়া যাইত, যদি উহা ভাল করিয়া ছাপা না হইত, যদি বাঙ্গালায় আধুনিক পদ্ধতি অনুসারে, প্রভুর লীলা ধারাবাহিক না লেখা হইত, তবে এত দিন প্রভুর নিদর্শন পাওয়া দুর্ঘট হইত। প্রভু জগত হইতে "এবলিস" হইয়া যাইতেন।

আমাদের ঐ দুর্দ্দশার কারণ শ্রবণ করুন। প্রভু যখন প্রকাশ হইলেন, তখন ভক্তগণ বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণ ভুলিয়া গৌর-নদিয়া নাগরীর ভজন আরম্ভ করিলেন। ইহা পূর্ব্বে বিস্তার করিয়া দেখাইয়াছি। তাহার পরে গোস্বামিগণ বৃন্দাবনে যাইয়া মন্দিরগঠন, বিগ্রহস্থাপন ও শাস্ত্রলিখন কার্য্য সমাধা করিলেন। তাহাদের প্রধান শত্রু পড়ুয়া পণ্ডিত; তাঁহারা ভাবিলেন এই পড়ুয়া পণ্ডিত নিরস্ত করা তাঁহাদের প্রধান কার্য্য। পড়ুয়া পণ্ডিতকে নিরস্ত করিতে হইলে পাণ্ডিত্যের সাহায্য চাই। ইহা ভাবিয়া

তাঁহারা লীলাকথা ত্যাগ করিয়া তত্বের জটিল রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। তাই বড় বড় গ্রন্থ লিখিতে বসিয়া মূল ঘটনা অর্থাৎ ভগবানের অবতার ও লীলা—মনুষ্যের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করা—ভুলিয়া গেলেন।

তাহার পরে, তাঁহাদের, এই মূল ঘটনা বিবর্জ্জিত যে বৈষ্ণবশাস্ত্র, তাহা শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দের সঙ্গে গৌড়ে পাঠাইয়া দিলেন। এখানে বৈষ্ণবশাস্ত্র আইল, শ্লোকপূর্ণ শাস্ত্র, কিন্তু প্রধান ঘটনাশূন্য। কাজেই যে বাঙ্গলায় প্রভুর ভক্তগণ রাধাকৃষ্ণ ভজনের পরিবর্ত্তে গৌর-নদিয়া নাগরীর ভজন করিতেছিলেন, তাঁহারা আবার উহা ত্যাগ করিয়া রাধাকৃষ্ণের ভজন আরম্ভ করিলেন। তাই গৌর-কথা উঠিয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে যাইতে যাইতে আমি যখন অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, তখন দেখিলাম যে, একজন, অতি পণ্ডিত বৈষ্ণব আচার্য্য, জানেন না, যে বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী কে? প্রধান আচার্য্যগণ বৈষ্ণবশাস্ত্রের সমুদায় জানেন, কেবল জানেন না প্রভুর কথা, মূলঘটনার কথা।

প্রভু নীলাচলে গমন করিলে সেই স্থান এই প্রধান ঘটনার কেন্দ্র হইল। প্রভুর অদর্শনে এই কেন্দ্র বৃন্দাবনে সরিয়া গেল, আর বৃন্দাবন হইতে এই মূল ঘটনা উৎপাটিত হইতে আরম্ভ হইল। যখন শ্রীনিত্যানন্দ গৌড়ে প্রচারের নিমিত্ত আইলেন, তখন গোস্বামীগণ তাঁহাদের আসনে উপবেশন করেন নাই। তখনকার এই যে মূলঘটনা উহা জাজ্জল্যরূপে সমাজের চক্ষের উপরে ছিল।

নিতাইকে, আমার দয়াময় প্রভু কি বলিয়া গৌড়ে পাঠাইলেন, তাহা স্মরণ করুন। যথা—শ্রীপাদ আমার প্রাণ সর্ব্বদা কান্দিতেছে। জীবকে হরিনাম দিতেছিলাম, কিন্তু কৃষ্ণনামের শক্তিতে আমি পাগল হয়েছি, আমাদ্বারা আর উহা হইবে না। জীবগণের নিকট আমি ঋণি, আমি সেই দায়ে বিকাইয়া যাইতেছি। যে সম্বল ছিল, তাহা ফুরাইয়াছে,

ুমি আমার ব্যথায় ব্যথিত, তোমা ছাড়া আমার হৃদয়ের ব্যথা কাহাকে লিব? তুমি আমাকে জীবের নিকট ঋণ হইতে মুক্ত কর। গৌড়দেশে মন কর, ছোট বড় ভাল মন্দ, সকলকে উদ্ধার কর। তোমার বিশেষ পার পাত্র হইতেছে পড়ুয়া পণ্ডিতগণ, দেখিও যেন কেহ বাদ না যায়।*

নিতাই যাইয়া গৌড়ে কি ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন, তাহা বহুতর দে বিবর্ণিত আছে। আমরা সেই সমুদায় পদ হইতে প্রধানতঃ এই ববরণ লিখিতেছি, ইহাতে আমাদের মনগড়া কথা একটীও নাই। যথা, কটী পদ:—

গজেন্দ্র গমনে নিতাই যায়।
যারে দেখে তারে প্রেমে ভাসায়॥
অধম পতিত পাপীর ঘরে গিয়া।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম দিচ্ছে যাচিয়া॥
যেনা লয় তারে কয় দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লও ভজ গৌরহরি॥
তো সবার লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
শুন নাই গৌরাঙ্গসুন্দর নদিয়ার?

নিতাই আপনার পার্ষদ সঙ্গে, পায়ে নূপুর দিয়া, গ্রামে গ্রামে, নগরে গরে, ঘরে ঘরে কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেছেন। বলিতে বলিতে াইতেছেন—

ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গোরাঙ্গ নাম।
যে ভজে গৌরাঙ্গচাঁদ সেই আমার প্রাণ॥

---

* এই যে কথাগুলি হইতেছে এ সমুদায় প্রভুর নিজ মুখের কথা, ল্পিত একটাও নয়।

কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু অবতার।
খেলা কৈলেন জীবসনে গোলকের ঈশ্বর ॥
গোলকের যে সম্পত্তি যতনে আনিয়া।
ঘরে ঘরে বিলাতেছেন আপনি যাচিয়া ॥ ইত্যাদি

এই গেল নিত্যানন্দের প্রচার-পদ্ধতি। অনেক লোক সমবেত হয়েছে, নিতাই তাহাদিগকে বলিতেছেন—"ভাই, তোমরা কি নদিয়ার অবতারের কথা শুন নাই? তোমরা কি শুন নাই যে সেই গোলকের পতি, জীবের দুঃখে ব্যথিত হইয়া, ধরাধামে, আপনি ভক্ত হইয়া, জীবগণকে উদ্ধার করিতেছেন। তিনি কেবল তোমাদের জন্য আসিয়াছেন। আর ভয় কি? তিনি তোমাদিগকে কোলে করিয়া গোলকে লইয়া যাইবেন।" বলিতে বলিতে :—

গোরপ্রেমের ভরে মাতিল নিতাই।
জোরে জোরে লম্ফ দেয় ধরা নাহি যায় ॥

আর বক্তৃতা চলিল না, নিতাই উন্মাদ হইলেন, কাজেই সেই সঙ্গে শ্রোতা ও দর্শকগণ উন্মাদ হইলেন। নিতাই সম্মুখস্থ গণকে ডাকিতেছেন, বলিতেছেন ভাই এসো তোমাদের জনা জনা কোলে করি। তোমরা আমার কোলে বসিয়া গৌর গৌর বল। ভাই তোমাদের আর কিছু করিতে হইবে না। দেখিতেছ না তিনি দাঁড়াইয়া আছেন, তোমাদের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছেন, তোমাদের গোলকধামে লইয়া যাইবেন, ঐ দাঁড়াইয়া আছেন!

নিতাই বড় পাষণ্ডের দলে পড়িয়া গিয়াছেন, তাহারা কোনক্রমেই দ্রব হইতেছে না, তাঁহাকে ঠাট্টা করিতেছে। তিনি তখন দুই হস্তে তৃণ ও মুখে তৃণ করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, ভাই আমাকে কিনিয়া লও, আমি তোমাদের দাসের দাস, হইলাম, মুখে একবার গৌর গৌর বল।

হয়ত ইহাতেও হইল না, কঠিন হিয়া গলিল না। তখন "ভাই" "ভাই"

লিয়া নিতাই চিৎকার করিয়া কান্দিতে লাগিলেন বা বৃশ্চিক দষ্ট ব্যক্তির ন্যায় ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। এমন হইল যেন তাহারা নাম না হইলে নিতাই প্রাণে মরিবেন। তখন একজন দ্রবীভূত হইয়া পদতলে বসিয়া লিতেছেন, "ঠাকুর শান্ত হও, আমি বলিতেছি। কি দয়া! কি দয়া" গ বলিয়া সেও মুখে নাম বলিল, আর নাম মুখে লাগিয়া গেল, সে আর ইহা ছাড়িতে পারে না, আর সে নাচিতে লাগিল। তাহার বায়ু অন্যের ঙ্গে লাগিল, সেও দ্রবীভূত হইল।

গোস্বামিগণের পদ্ধতি ও নিতাইর পদ্ধতি কত বিভিন্ন দেখ। গোস্বামী র্ক করিয়া বুঝাইতে গেলেন, নিতাই কান্দিয়া কান্দাইলেন। কাজেই গাস্বামিগণ কতকগুলি নিরস কঠিন পণ্ডিত বৈষ্ণব, আর নিতাই কতকগুলি ল প্রেমিক বৈষ্ণব করিলেন। গোস্বামী অকাট্য তর্কের দ্বারা বুঝাইলেন ভগবান্ আছেন, নিতাই অঙ্গুলি দিয়া দেখাইতেছেন আর বলিতেছেন, দেখ তিনি! গোস্বামী বিচার করিয়া সাব্যস্ত করিতেছেন যে, ভগবান মময়। কিন্তু নিতাই আপনার প্রেম দেখাইয়া ভগবানের প্রেম খাইতেছেন, শ্রীগৌরাঙ্গের নয়ন জল দেখাইয়া ভগবানের কত প্রেম হার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতেছেন।

গোস্বামিগণ সমুদায় শাস্ত্র মন্থন করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের আধিপত্য স্থাপন রলেন, অতি সূক্ষ্ম তত্ত্বক কোটী ভাগে বিভাগ করিয়া তাহাদের সতেজ ি ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। যাঁহারা পাঠ করেন তাহারা স্তুত হয়েন। আর নিতাই ইহা বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন:—

"তোদের, সম্মুখে দাঁড়ায়ে দেখ পূর্ণব্রহ্মসনাতন।
তোদের, গোলকধামে লয়ে যেতে এসেছেন পতিতপাবন॥"

শিক্ষার শক্তি অধিক গোস্বামিগণের না নিতাইর? আমরা শতবার ব যে, নিতাইর যে শিক্ষা ইহা অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ। নিতাই শিক্ষা দিলেন

যে শ্রীভগবান জীবের দুঃখে গোলকে রইতে না পারিয়া, ধরাধামে আসিয়া মনুষ্যের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করিয়াছেন, কেন না, তাহারা অনায়াসে তাঁহাকে লাভ করিতে পারে। অগ্রে শ্রীভগবান সম্বন্ধে যাহা কিছু তত্ত্ব তাহা লোকে বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু এখন তাঁহার অভ্যুদয়ে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক বিষয় 'জানিলেন'। এতএব নিতাইর শিক্ষায় জীবগণ জানিলেন যে—

(১) আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর যে ব্রহ্মাণ্ড, ইহার কেহ স্রষ্টা আছেন কি না ইহা জানিবার নিমিত্ত জীবগণ তাহাদের জন্মাবধি চেষ্টা করিয়া জানিতে পারে নাই, এখন নিতাই তাহাদিগকে সেই শ্রীভগবানকে দেখাইয়া দিতেছেন।

(২) যাঁহারা মনে আশা করেন যে ভগবান থাকিলেও থাকিতে পারেন, তাঁহাদের মধ্যে তাঁহারা প্রকৃতি লইয়া চিরদিন বিবাদ চলিতেছে। কেহ তাঁহার গলায় মুণ্ডমালা দিয়াছেন। কেহ তাঁহার হস্তে বাঁশী দিয়াছেন। সে বিবাদ আর রহিল না।

(৩) তিনি মনুষ্যকে কি রূপ চক্ষে দেখেন, ইহা লইয়াও চিরদিন বিবাদ চলিয়াছে। কেহ বলেন যে জীব আপনার কর্ম্মের ফল ভোগ করে, ভগবানের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। কেহ বলেন, ভগবান বিচারক, অপরাধ হইলে তিনি দণ্ড করেন, আর সে দণ্ড এমন যে পাপীকে চিরদিন নরকের অগ্নিকুণ্ডে রাখেন। নিতাই দেখাইয়া দিলেন যে এই অসীম শক্তিসম্পন্ন বস্তু, যিনি এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন "তিনি তোমার" আর "তুমি তাঁহার", বলিতে কি, তাঁহাতে ও তোমাতে যেরূপ গাঢ় সম্বন্ধ, এরূপ তোমাতে আর তোমার স্ত্রীর সঙ্গেও নাই। অর্থাৎ জীবের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়জন শ্রীভগবান। নিতাই এই সমুদায় দেখাইয়া দিলেন, অথচ আগম পুরাণ বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রের নাম পর্য্যন্ত করিলেন না।

আচার্য্যগণের এখন শিক্ষা দেখুন। তাঁহারা শিক্ষা দিলেন যে, শ্রীভগবান অবশ্য আছেন কারণ এই, এই, এই। তাঁহাকে এইরূপে ভজনা করিতে হয়, যেহেতু বিচারে দেখি এই গোপী অনুগা ভজন সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। তিনি আমাদের, আর আমরা তাঁহার, সে বিষয় সন্দেহ নাই, যে হেতু প্রথমতঃ এই—দ্বিতীয়তঃ এই—ইত্যাদি। নিতাইর শিক্ষায় জীব জানিলেন, যে ্গবান আছেন, আর তিনি তোমার আর তুমি তাঁহার। বৈষ্ণবশাস্ত্রের শিক্ষায় জীবকে বুঝাইতে চেষ্টা হইয়াছে যে, ভগবান বড় ভাল ইত্যাদি। নিতাই দেখাইয়া দিলেন, শাস্ত্রে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কাজেই াস্ত্রের উপদেশে জীব কতকগুলি উপদেশ পাইলেন, কিন্তু তিনি যেমন তমনি থাকিলেন। নিতাইর শিক্ষায় জীবের পুনর্জ্জন্ম হইল। তাঁহার ্রকৃতি পরিবর্ত্তন হইল, অর্থাৎ তিনি কৃষ্ণপ্রেম পাইলেন। মোটামুটী ই—

শাস্ত্রের শিক্ষায় জীবগণ জ্ঞান পাইলেন, আর নিতাইর শিক্ষায় প্রেম াইলেন। কাজেই এই পদ হইল—

ধর লও সে কিশোরীর প্রেম নিতাই ডাকে আয়।
প্রেমে শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে বায়॥

অতএব যাঁহারা নিতাইর শিক্ষা পাইলেন তাঁহাদের শাস্ত্রের শিক্ষার ্ছু প্রয়োজন রহিল না। আর যাঁহারা শাস্ত্রের শিক্ষা পাইলেন, অথচ ্তাইর শিক্ষা হইতে বঞ্চিত, তাঁহাদের বিশেষ কিছুই হইল না।

কথা উঠে যে, বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত পাশ্চাত্যদেশে বৈষ্ণব-প্রচারক ঠাইতে হইবে। এমন কথাও হয় যে গৌর-গত প্রাণ, পরম পণ্ডিত, াবনের রাধারমণ সেবাইত শ্রীল মধুসূদন গোস্বামী যাইবেন। তখন াই সাব্যস্ত হয় যে যিনি যাইবেন তাঁহার নিতাইর প্রচার-পদ্ধতি অবলম্বন ্রতে হইবে। অর্থাৎ—

"কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু অবতার।
খেলা কৈলেন জীবের সনে গোলকের ঈশ্বর॥"

প্রচার করিতে হইবে।

জীব গৌরাঙ্গ গ্রহণ করিলে, শাস্ত্র আপনি আসিবেন, রাধাকৃষ্ণ আপনি আসিবেন, অর্থাৎ গোস্বামিগণ যাহা যাহা শিক্ষা দিয়াছেন সব আপনি আসিবেন। আর তাহা না করিয়া যদি ইহার উলটা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, তবে আর কেহ আসুন না আসুন প্রভু আসিবেন না।

অতএব বাসুঘোষ, নরহরি প্রভৃতির নদিয়া নাগরী অনুগা ভজন, আর নিতাইর "ভজ গৌরাঙ্গ" প্রচার পদ্ধতি উঠাইয়া দেওয়াতে জীবের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, আগে গৌর—আগে মূল ঘটনা—পরে সমুদায় আপনি আসিবে।

অতএব হে জীবের দুঃখে কাতর ভক্তগণ! জীবকে শ্রীগৌরাঙ্গ শিখাও, সর্ব্বদেশে ইহা প্রচার কর যে, ১৪০৭ শকে এই দেশে শ্রীভগবান আসিয়া ৪৮ বৎসর মনুষ্যের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করেন। আর জানাও যে এ কথা যে সত্য তাহা যিনি অনুসন্ধান করিবেন তিনিই জানিতে পারিবেন। ইহা যদি কর, তবে নিতাই যেমন ভগবানকে ক্রয় করিয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ করিবে।

অষ্টম অধ্যায়।

প্রভুর দৌর্ব্বল্যের কথা কয়েক বার বলিয়াছি। শুধু যে আহার অল্প হওয়াতে এই প্রকাণ্ড শরীর দুর্ব্বল হইয়াছিল তাহা নহে, সাধন ভজনে এইরূপ শরীর ক্ষীণ হয়। কিন্তু যদিও শরীর বাহ্যিক ক্ষীণ হয়, তত্রাচ আভ্যন্তরিক তেজ বাড়িতে থাকে। প্রভুর কোন দ্রব্য কেহ স্পর্শ করিলে তাহার হৃদয়ে ভক্তির উদয় হইত। এমন কি, তাঁহার বায়ু গাত্রে লাগিলে হৃদয়ে ঐরূপ ভক্তিভাব উদয় হইত। প্রভু নৃত্য করিতেছেন, মুখ দিয়া লালা পড়িতেছে, ভাগ্যবান শুভানন্দ সেই মৃত্তিকায় পতিত ফেণের এক বিন্দু লইয়া পান করিলেন, করিয়া তদ্দণ্ডে প্রেমে উন্মত্ত হইলেন। প্রভুর দেহের অলৌকিক তেজের কথা আর অধিক কি কহিব, ধীবর তাঁহার প্রায় মৃতদেহ সমুদ্র হইতে উঠাইতে উহা স্পর্শ করিয়া উন্মত্ত হইল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নাচিতে নাচিতে গৃহে চলিল। তাহার ভাব দেখিয়া সরূপ জানিতে পারিলেন যে, এ প্রভুকে স্পর্শ করিয়াছে, আর প্রকৃত সেই প্রভুর ঠিকানা বলিয়া দিয়াছিল।

বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ও মহাপ্রসাদ এই নিমিত্ত ভক্তদিগের নিকট এত বহু মূল্য দ্রব্য। রঘুনাথ দাস গোঁসাঞির খুড়া কালীনাথ দাসের প্রধান ভজন উচ্ছিষ্ট সেবন করা। তাই তিনি বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট সেবন করিয়া দেশে দেশে বেড়াইতেন। কোন বৈষ্ণবের বাড়ী গমন করিয়া প্রসাদ চাহিতেন, অবশ্য প্রথমে পাইতেন না। তখন ধন্না দিতেন, প্রসাদ সেবন না করিয়া আসিতেন না। যেখানে কোন ক্রমে কৃতকার্য্য হইতে না পারেন, সেখানে আঁস্তাকুঁড় হইতে পরিত্যক্ত পাত্র চাটিতেন। এ কাহিনী সংক্ষেপে পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি।

এইরূপে কালিদাস ঝড়ু ঠাকুরের কাছে প্রসাদ ভিক্ষা করিলেন। ঝড় ঠাকুর জাতীতে ভুইমালী, অতএব অতি নীচ, কিন্তু বৈষ্ণবগণের এ মহিমা বড় যে, তাঁহারা ভক্তি দেখিয়া ছোট বড় বিচার করেন, জাতি দেখিয়া নয়। ঝড়ু যদিও ভুইমালী, তবু তিনি বৈষ্ণবদের মধ্যে ঠাকুর হইলেন। কালিদাস পাতার দোনা করিয়া পাকা আম আনিয়া ঝড়ুকে দিলেন, ঝড়ু আম লইলেন, কিন্তু প্রসাদ দিতে চাহিলেন না। পরে যখন ঝড়ু সেই আমের আঁটি চুষিয়া ফেলিয়া দিতে লাগিলেন, কালিদাস গোপনে তাহা কুড়াইয়া লইয়া পুনরায় চুষিলেন। এই তাঁহার ভজন।

নীলাচলে গিয়াছেন, এখন চিরদিনের সাধ মিটাইবেন, অর্থাৎ প্রভুর প্রসাদ গ্রহণ করিবেন। বৈষ্ণব কাহাকেও ইচ্ছা করিয়া প্রসাদ দেন না, তাহা কালিদাসের কাহিনীতে বুঝা যায়। কোন বৈষ্ণবের নিকট প্রসাদ চাহিলে তিনি দৈন্য করিয়া দিতে অস্বীকার করিবেন। আর এক কথা, প্রসাদ তাহাকেও দিতে নাই যাহার উহাতে নিতান্ত বিশ্বাস বা ভক্তি নাই। সেই নিমিত্ত স্বয়ং প্রভু উপযুক্ত লোক ব্যতীত কাহাকেও প্রসাদ দিতেন না। প্রভু অন্তর্যামী, জানিতেন কে উপযুক্ত কে অনুপযুক্ত। কালিদাস যে উপযুক্ত পাত্র তাহা অবশ্য প্রভু জানিতেন। কালিদাস প্রভুর প্রসাদ আহরণ করিতে নীলাচলে গিয়াছেন। প্রভুর পশ্চাতে পশ্চাতে আছেন, প্রভু মন্দির দর্শনে গমন করিতেছেন, কালিদাস পশ্চাতে পশ্চাতে চলিয়াছেন। প্রভুর নিয়ম আছে তিনি পাদপ্রক্ষালন না করিয়া ঠাকুর দর্শন করেন না। সিংহদ্বারের উত্তর দিকে, কপাটের আড়ে, বাইশ পশারের তলে, একটী গর্ত্ত আছে, প্রভু প্রত্যহ সেখানে পদধৌত করেন। প্রভুর আজ্ঞায় কেহ সেই জল লইতে পারেন না। প্রভু পদ বাড়াইয়া দিয়া থাকেন, গোবিন্দ জল দ্বারা প্রক্ষালন করেন। প্রভু তাহাই করিলেন, আর কালিদাস অগ্রবর্ত্তী

হইয়া তাহার নীচে অঞ্জলি করিয়া হাত পাতিলেন। মহাপ্রভু দেখিলেন, দেখিয়া কিছু বলিলেন না। তাহা দেখিয়া গোবিন্দও কিছু বলিলেন না। এইরূপে কালিদাস অঞ্জলি অঞ্জলি শ্রীপদ ধৌত জল পান করিতে লাগিলেন। তিনবার এইরূপ পান করিলে প্রভু নিষেধ করিলেন, বলিলেন, আর নয়, ঢের হয়েছে।

পরে কালিদাস প্রভুর বাসায় আসিয়াছেন, প্রসাদ চাহিতে সাহস হয় না, বসিয়া আছেন। প্রভু সেবা করিতেছেন, অন্তর্যামি প্রভু আপনার সেবা হইলে, গোবিন্দকে ইঙ্গিত করিলেন, আর সেই প্রসাদ তিনি লইয়া কালিদাসকে দিয়া তাহার জন্ম সার্থক করিলেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রসাদের মাহাত্ম্য বড়। মহাপ্রসাদ মানে এই, শ্রীভগবানের ভুক্তাবশিষ্ট। অতএব ভক্তের প্রসাদে যদি ভক্তি উদ্দীপন করে, তবে শ্রীভগবানের প্রসাদ উহা আরও ভাল করিয়া করিবে। কিন্তু কথা এই, ভগবানকে অর্পণ করিলেই তিনি তাহা ভোগ করেন না, আর যদি ঠিক ভক্তি পূর্ব্বক দেওয়া হয়, তবে তিনি তাহা উপেক্ষাও করিতে পারেন না।

মনে ভাবুন ভক্তের ইচ্ছা ভগবানকে সেবা করিবে, শ্রীভগবান সে ইচ্ছা পুরণ করিতে বাধ্য, নতুবা তাঁহার ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু নাম বৃথা হয়। ভক্ত পায়স রন্ধন করিয়া একটী অতি পরিস্কার পাত্রে রাখিয়া করযোড়ে বলিতেছেন, শ্রীভগবান এই পায়সের গন্ধে আমার প্রাণ মাতিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু আমি উহা মুখে কিরূপে দিব? তুমি যদি একটু মুখে দাও ত তবেই আমার পায়স সুস্বাদ হবে। ইহাই বলিয়া প্রাণের সহিত "খাও, খাও" বলিয়া ভগবানকে মিনতি করিতে লাগিলেন। পরে বলিতেছেন, আমার সম্মুখে সেবা করিবে না? আচ্ছা আমি এই প্রসাদ আবরণ করিতেছি, ইহাই বলিয়া বস্ত্র দ্বারা উহা আবরণ করিলেন, করিয়া তিনি করযোড়ে বসিয়া থাকিলেন। যদি কেহ এরূপ একান্ত মনে ইচ্ছা করেন, তবে নিশ্চয়ই

সেই মহাপ্রসাদ শ্রীভগবানের অধরামৃত দ্বারা পবিত্রীকৃত হয়। শ্রীখণ্ডের মুকুন্দের তনয়, নরহরির ভ্রাতষ্পুত্র, রঘুনন্দের ঠাকুরকে নাড়ু খাওয়াইবার কথা, বৈষ্ণব মাত্রে জানেন। মুকুন্দ স্থানান্তরে যাইবেন, তাই তাহার পুত্র রঘুকে বলিয়া গেলেন যে, সে যেন ঠাকুরের সেবা করে। রঘু সেই পিতৃ আজ্ঞা পালন করিতে ঠাকুরের কাছে সেবা দ্রব্য লইয়া যাইয়া বলিলেন, "ধর খাও"। বালকের মনে বিশ্বাস ঠাকুরকে দিলে তিনি খাইবেন, কিন্তু তাহাত নয়। ঠাকুর খাইবেন না, রঘু ছাড়েন না, রঘু কান্দিয়া আকুল। বলিতেছেন, তুমি খাবেনা বাবা আমাকে মারিবেন, বলিবেন, তুই দিস নাই, তুই আপনি খাইয়া ফেলিয়াছিস। ইহা বলিয়া অতিবালক রঘু ভূমে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। ঠাকুর করেন কি, দস্যু হস্তে পতিত, রঘুর সম্মুখে খাইলেন। মুকুন্দ বাড়ী আসিয়া শুনিয়া অবাক হইলেন, কারণ রঘু বলিলেন প্রসাদ সমুদায় ঠাকুর আপনি খাইয়া ফেলিয়াছেন। রঘুর মুখ দেখিয়া মুকুন্দ বুঝিলেন, সে মিথ্যা বলিতেছে না। পরে ঠিক হইল রঘু, আবার খাওয়াইবে। রঘু তাই করিল, আর ঠাকুর, হাতে নাড়ু লইয়া নিতান্ত লোভীর ন্যায় খাইতে লাগিলেন। তখনি চেঁচাইয়া রঘু বলিতেছেন, "বাবা দেখে যাও ঠাকুর খাইতেছেন।" মুকুন্দ দৌড়িয়া আইলেন, আর অমনি খাওয়া বন্ধ হইল। তবে মুখে দিতে যাইতেছিলেন যে নাড়ুটী, সেইটি ঠাকুরের হাতে রহিল। অদ্যাপি সেই নাড়ু হাতে ঠাকুর, শ্রীখণ্ডে ভক্তের সুখ দিতেছেন।

প্রভু মহাপ্রসাদকে কিরূপ ভক্তি করিতেন শ্রবণ করুন। পানা নরসিংহে প্রভু গমন করিলে, অধিকারী মাধবভুজা কিছু প্রসাদ আনিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিলেন—

পূজারি প্রসাদ কিছু আনিল ত্বরিতে।
কণামাত্র প্রসাদ লইল প্রভু হাতে॥

হাতে করি প্রসাদের বহু স্তব করে।
প্রসাদ পাইতে দুই চক্ষে জল ঝরে।

প্রভু জগন্নাথ দর্শন করিতেছেন, এমন সময় গোপাল বল্লভ ভোগ আরম্ভ হইল, দ্বারে কপাট পড়িল, শঙ্খ ঘণ্টা বাজিতে লাগিল, ভোগ সমাপ্ত হইলে, সেবকগণ প্রভুর নিকট প্রসাদ লইয়া আইল। প্রভুকে দিলে তিনি এক কণা জিহ্বাগ্রে দিলেন, দিয়া বলিতেছেন "সুকৃতি লভ্য ফেলা লব" ইহা বলিয়া আনন্দে পুলকাবৃত হইলেন, নয়নজলে ভাসিলেন। ভক্তগণ প্রভুকে ইহার তথ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, জিজ্ঞাসিলেন প্রভু আপনি বারে বারে "সুকৃতি লভ্য ফেলা" কেন বলিতেছেন? প্রভু বলিলেন, "কৃষ্ণের যে ভুক্তাবশেষ তাহাকে 'ফেলা' বলে, লব মানে অল্প অংশ, অর্থ এই যে, যিনি সুকৃতি তিনি এইরূপ মহামূল্য দ্রব্য লাভ করেন। এই যে ভোগ উহাতে কৃষ্ণের অধরামৃত স্পর্শ করিয়াছে। দেখ ইহার গন্ধে মন মোহিতেছে। আশ্চর্য্য দেখ, যদিও এ সামান্য ও প্রাকৃত, দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত, কিন্তু আস্বাদ ইহার অপ্রাকৃত। জগতে এইরূপ আস্বাদ মিলে না।"

প্রকৃতই ভক্তগণ উহা আস্বাদ করিয়া আনন্দে উন্মত্ত হইলেন। প্রভুর সারাদিন ঐ ভাবেই গেল, পরে সন্ধ্যাকৃত্য করিয়া ভক্তগণ লইয়া আবার বসিলেন, আবার প্রসাদ আস্বাদ করিলেন, আর পুরী ভারতীকে কিছু পাঠাইয়া দিলেন।

পুরীধামে প্রভুর অসীম শক্তিতে প্রসাদ অতি পবিত্র বস্তু, উহা অপবিত্র হয় না। উহা যিনি স্পর্শ করেন, তিনিই পবিত্র হয়েন, আর সেখানে অন্নে দোষ নাই। কিন্তু বাহিরে উহা কেন অপবিত্র আছে? কারণ বেদ বিধির শাসন। বহুদিন হইল আমার দেওঘর বাটীতে প্রায় পঞ্চাশ মূর্ত্তি বৈষ্ণব শুভাগমন করিয়া আমার স্থান পবিত্র করিলেন। সে বাসা-বাড়ী বলিয়াছি, তাহাদের সেবার নিমিত্ত কিছু ব্যস্ত হইলাম। এমন

সময় সর্দ্দার পাণ্ডা এই সংবাদ পাইয়া আপনি আতিথ্যের ভার লইলেন। তাঁহার শ্রীরাধাকৃষ্ণের যে সেবা আছে তাঁহার প্রসাদ পাঠাইয়া দিবেন, এই কথা সাব্যস্ত হইল, এবং প্রকৃতই মধ্যাহ্নে ব্রাহ্মণগণ ভারে ভারে প্রসাদ আনিয়া আমার ঘর পুরিয়া ফেলিলেন। সকলে আনন্দে উন্মত্ত, বৈষ্ণবগণ সেবায় বসিলে, আমার পরিবেশন করিতে ইচ্ছা হইল, তাহাই মনন করিয়া আমি প্রসাদ স্পর্শ করিতে হস্ত বাড়াইলাম। এমন সময় আমার মনে পড়িল আমি শূদ্রাধম, আর ভক্তগণ প্রায় সকলেই ব্রাহ্মণ ঠাকুর, তখনই স্তম্ভিত হইলাম, হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "প্রভু সন্তান ও ভক্ত মহাশয়গণ! আমি পরিবেশন করিতে যাইতেছিলাম কিন্তু আপনাদের অনুমতি না পাইলে করিতে পারি না। কারণ আমি শূদ্রাধম। এই মহাপ্রসাদ অতি পবিত্র বস্তু, ইহা আমি স্পর্শ করিলে উহা অপবিত্র হইবে না, বরং আমি পবিত্র হইব। আপনারা বলেন কি?" দেখিলাম সকলে চিন্তাকুল হইলেন, কারণ 'হাঁ' বলিতে পারেন না, আবার 'না' ও বলিতে পারেন না। এই তাহাদের অবস্থা, কাজেই আমি ক্ষান্ত হইলাম। যখন সার্ব্বভৌম, প্রাতে মুখ ধৌত না করিয়া প্রথমে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিলেন তখন প্রভু বলিলেন ঃ—

আইজ নিষ্কপটে তুমি হইলে কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ নিষ্কপটে হইলা তোমারে সদয়॥
আজি ছিন্ন কৈলে তুমি মায়ার বন্ধন।
আজি কৃষ্ণ প্রাপ্তি যোগ্য হইল তোমার মন॥
বেদ ধর্ম্ম লঙ্ঘি কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ॥

কথা এই, কুল ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের আশ্রয় না লইলে কৃষ্ণ তাহাকে গ্রহণ করেন না, বেদ ধর্ম্ম মানিয়া বৈষ্ণব হওয়া যায় না, প্রভুর শ্রীমুখের এই বাক্য। তাহার প্রমাণ উপরে শ্রীমুখের আদেশ।

অগ্রে বলিয়াছি যে, যদিও শ্রীঅদ্বৈত মহাপ্রভুকে বিদায় দিলেন, তবু সে বিদায়ের পরে আর দ্বাদশ বৎসর তিনি ধরাধামে ছিলেন। অদ্বৈত ভাবিলেন, প্রভু যে জন্য আসিয়াছেন সে কার্য্য হইয়া গিয়াছে। অতএব আর তিনি কেন এই মলিন জগতে থাকিবেন, তাঁহার যাওয়াই উচিত। কিন্তু প্রভুর কিছু কাজ বাকি ছিল; তাহা শ্রীঅদ্বৈতও জানিতেন না। সে কাজ কি না আপনি আচরিয়া জীবকে সর্ব্বোত্তম ভজন শিক্ষা দেওয়া। সে ব্রজের নিগূঢ় রস।

এই ভজন ব্রজের নিগূঢ় রস দিয়া করিতে হয়। অতএব সে রস কি, আর রসদ্বারা কিরূপ ভজন করিতে হয়, তাহা জগতে অনর্পিত ছিল, তাহা তিনি আপনি আচরিয়া জগতকে শিখাইলেন। রস, বস্তু কি তাহার একটু আভাস এখানে দিব। শাস্ত্রে দেখিতে পাই, রস একাদশ প্রকার, তাহার মধ্যে সাতটি গৌণ ও চারিটী মুখ্য। গৌণরস কিনা হাস্য অদ্ভুত, ইত্যাদি সাত প্রকার। মুখ্যরস কিনা, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। গৌণরসের ভজন কিরূপ তাহার বিচার এখন থাকুক।

তবে গৌণ ও মুখ্যরসের বিভিন্নতা বলিতেছি। ভগবানকে নিজজন বলিয়া ভজন করিতে হইলে যে রস প্রয়োজন তাহাকে বলে মুখ্য। নিজজন কাহারা? নিজজন হইতেছেন মাতা, পিতা, স্বামী, পুত্র, ভ্রাতা, সখা, ইত্যাদি। অতএব ভগবানকে ইহার একস্থানে বসাইয়া ভজনা, যেমন "পিতা" কি "মাতা" কি "নাথ" বলিয়া ভজনা, সে মুখ্য রসদ্বারা হয়।

আবার যে রসে শ্রীভগবানকে স্পষ্টরূপে নিজজন বুঝায় না, তাঁহাকে বলে গৌণরস। যেমন মনে ভাব শ্রীভগবানকে "শক্তিধর", বা "করুণাময়", বলিয়া ভজনা করা। কোন বস্তু নিজজন না হইলেও তাঁহাকে "শক্তিধর" বা "করুণাময়" বলিয়া ভজনা করা যায়। যেমন শুম্ভ নিশুম্ভ বধ করিয়াছেন বলিয়া কালীকে ভজনা করা। এ ভজনা "বীররস" দ্বারা, আর বীররস গৌণ মধ্যে গণনীয়।

মুখ্য যে চারিটি রস তাহাও এখন অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিব। শ্রীভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক পাতাইয়া চারি ভাবে ভজনা করা যায়। যথা, কর্ত্তা বা পিতা ভাবে, সখা বা ভ্রাতা ভাবে, বাৎসল্য বা সন্তান ভাবে, আর কান্তা বা পতি কি উপপতি ভাবে। শ্রীদাম সুবলের ভজন সখাভাবে, যশোমতীর ভজন বাৎসল্য ভাবে, ও গোপীগণের ভজন কান্তাভাবে। জগতে শেষের তিনটা রসের কথা কেহ স্পষ্ট জানিতেন না, তাঁহাদের ভজন কেবল দাস্য ভক্তি লইয়াই ছিল। তাঁহারা এ পর্য্যন্ত ভগবানকে পিতা বা প্রভু বলিয়া ভজনা করিয়া আসিয়াছেন কিন্তু এরূপ ভজন অতি স্থূল। এরূপ ভজনে হৃদয়ের ধনকে দূরে রাখিতে হয়। সর্ব্বোচ্চ ভজন কান্তাভাবে।

কান্তাভাবে শ্রীভগবানকে কি রূপে ভজনা করিতে হয় তাহার এখন সংক্ষেপে আভাস দিতেছি। অবশ্য এই রসের ভজনের কথা শ্রীভাগবতগ্রন্থে আছে। কিন্তু প্রভু উহা আপনি আচরিয়া জগতে দেখাইলেন। অর্থাৎ উহা প্রথমে শ্রীভাগবত গ্রন্থে ভাষায় ছিল। এখন কার্য্যে দেখান হইল। কান্তভাবে শ্রীভগবানকে ভজনা মানে এই যে, যেমন স্ত্রীলোকে পতির কি উপপতির প্রতি প্রীতি আরোপ করে, সেইরূপে আপনাকে স্ত্রীলোক অর্থাৎ প্রকৃতি ভাবিয়া ভগবানকে পতি বা উপপতি ভাব আরোপ করা।

এই কান্তাভাবে ভজন দুই প্রকারে হয়, প্রত্যক্ষ ও অনুগা। প্রত্যক্ষ ভজন এই যে, আপনাকে গোপী ভাবিয়া শ্রীভগবানের সহিত প্রীতিসংস্থাপন করা। আর অনুগা ভজন মানে আপনি মধ্যস্থ হইয়া, গোপীর সহিত শ্রীভগবানের প্রীতি সম্পাদন করিয়া, আপনার ভগবৎ প্রেম বৃদ্ধি করা। একটি প্রত্যক্ষ ভজনের নিবেদন শ্রবণ করুন।

নিশিদিন তোমার বিরহে ব্যাকুল প্রাণ।
হে মোর হরি, তৃষিত চাতকী সমান॥

এই গীতে সাধক তান্‌সেন বলিতেছেন যে, "হে ভগবান! যেমন চাতকিনী দিবানিশি জল জল করে, তেমনি আমার প্রাণ দিবানিশি তোমার লাগি ব্যাকুল।" ভগবানে এত পিপাসা অবশ্য গাঢ় প্রেম হইতে হয়, আর যাঁহার এরূপ পিপাসা আছে, তিনি তাহা শ্রীভগবানকে নিবেদন করিতে পারেন, অর্থাৎ তিনি প্রত্যক্ষ ভজনের অধিকারী। কিন্তু এতখানি পিপাসা যাঁহার নাই, তিনি যদি ঐরূপ বলেন, তবে তাঁহার ভজন হয় না, ভণ্ডামি হয়। সেই জন্য কান্তাভাবে প্রত্যক্ষ ভজন, বলিতে কি, একবারে উঠিয়া গিয়াছে। এই প্রত্যক্ষ ভজন করিতে গিয়া আউল বাউলের কদর্য্য পদ্ধতি ক্রমে ক্রমে কোন কোন বৈষ্ণব শ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তাঁহারা গোপীর প্রেম পাইলেন না, সুতরাং গোপীর দেহ অবলম্বন করিলেন। তাঁহারা কৃষ্ণ লীলার রস প্রত্যক্ষ রূপে আস্বাদ করিতে গিয়া আপনারা রাধা কৃষ্ণ সাজিলেন, সাজিয়া আপনারা রাস লীলা আরম্ভ করিলেন, ইহাতেই ভাগবত সেবা স্থানে ইন্দ্রিয় সেবা প্রবেশ করিল।

প্রত্যক্ষ ভজনের পরিবর্ত্তে গোপী অনুগা ভজন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। গোপী অনুগা ভজন কিরূপ বলিতেছি। কৃষ্ণ মথুরায় যাইতেছেন, গোপীরা রথচক্র ধরিয়া, যাইতে দিবেন না, কেহ অশ্বের সম্মুখে শয়ন করিয়া আছেন। বলিতেছেন, নাথ! যাবে ত আমার বুকের উপর দিয়া যাও। এইরূপে গোপীগণ প্রাণপণ করিয়া কৃষ্ণকে যাইতে দিতেছেন না। এই যে একটি চিত্র তোমার হৃদয় পটে অঙ্কিত করিলে, ইহাতে তুমি কেহ নহ, একজন দর্শক মাত্র। কিন্তু তবু তুমি সম্যক রূপে সেই গোপীদের যে প্রেম তাহার আস্বাদ পাইতেছ। এ চিত্র হৃদয়ে দেখিলে তুমি বিগলিত হইবে। মনে ভাব তুমি মাথুরের গীত শুনিতেছ, ইহাতে শ্রীমতীর শ্রীকৃষ্ণ বিরহ বেদনা বর্ণিত আছে। তোমার তাহা শুনিয়া নয়নে জল আসিবে, কেন? তুমি ত রাধা নহ, তুমি ত আর কৃষ্ণ-বিরহে প্রপীড়িত নও, তবু তুমি বিগলিত

হইবে, কেন? মনে ভাব প্রভাসের গীত শুনিতেছ, আর যশোমতী বলিতেছেন, "আয় গোপাল দেখা দিয়ে প্রাণে বাঁচা" তাহা শুনিয়া তোমার চক্ষে জল আসিবে কেন? তুমি ত যশোমতী নও। ইহাকে বলে গোপী অনুগা ভজন। তুমি রাধার কান্ত ভাবে ভজন ধ্যান করিতে করিতে সেই কান্ত ভাবের আস্বাদ পাইবে। তুমি যশোদার বাৎসল্য প্রেমের চিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া, সেই বাৎসল্য প্রেমের কিছু আহরণ করিবে, এই রূপে গোপী ভাবে শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি আহরণ করাকে গোপী অনুগা ভজন বলে। বৈষ্ণবগণ এইরূপে গোপী অনুগা ভজন করিয়া তাঁহাদের প্রেম ও ভক্তি অর্জ্জন করিয়া থাকেন। ইহা আর কোন ধর্ম্মে নাই।

মনে ভাব অতি রসাল একটি প্রেম ঘটিত গল্প যোজনা করিতে হইবে। তাহা হইলে তাহার কি কি প্রকরণ প্রয়োজন?

ইহার প্রকরণ, একটি সুন্দর নাগর ও সুন্দরী নাগরী। একটি সঙ্কেত স্থান, একটি মিলন স্থান, ইত্যাদি। একটি নাগর ও নাগরী হঠাৎ এক স্থানে দেখা হইল, হইয়া উভয়ের হৃদয়ে প্রেমের অঙ্কুর হইল। পরে দূতী যাইয়া মধ্যস্থ করিলেন, না পরে তাঁহারি সাহায্যে উভয়ের মিলন হইল। হয়ত আর একটি প্রতিদ্বন্দ্বী উপস্থিত হইলেন। তাহাতে ঈর্ষার সৃষ্টি হইল, পরে মান হইল, মানের পরে কলহ, কলহের পরে অনুতাপ ও আবার মিলন। এইরূপে সেই গল্প নানা রস দ্বারা সুস্বাদ করা যায়।

আরো শুনুন। তাহার পরে বিচ্ছেদ ঘটিল। পরস্পরে দেখা সাক্ষাৎ স্থগিত হইল, নাগর ক্রন্দন করেন, নাগরী ক্রন্দন করেন, পরে আবার মিলন হইল।

মনে করুন শকুন্তলার কাহিনী। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার দেখা সাক্ষাৎ হইল, সখীগণ দৌত্য করিলেন, মিলন হইল, বিচ্ছেদ হইল, ঘোর বিরহ উপস্থিত হইল, পরে মিলন হইল। এই কাহিনী পড়িতে পড়িতে পাঠক, নাগর ও

রীর সহিত সহানুভূতি করিয়া কান্দিবেন, হাসিবেন ইত্যাদি। পাঠকের র ও নাগরীর প্রতি অনিবার্য্য আকর্ষণ হইবে, অনেক দিন তাঁহাদিগকে াতে পারিবেন না। ইরূপে যদি শকুন্তলার কাহিনী লইয়া চর্চ্চা াতে থাকো, তবে ক্রমে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা তোমার হৃদয় কিয়ৎ পরিমাণে রকার করিবেন।

দুষ্মন্ত রাজার স্থানে শ্রীকৃষ্ণ ও শকুন্তলার স্থানে রাধাকে স্থাপিত কর, া হইলে কৃষ্ণলীলা হইল। এই লীলা আস্বাদন করিতে করিতে ক কৃষ্ণপ্রেম আহরণ করিবেন, তাঁহার রাধা কৃষ্ণের প্রতি অনিবার্য্য কর্ষণ হইবে। এইরূপ করিতে করিতে রাধাকৃষ্ণের প্রতি প্রেমের রি হইবে। মহাজনগণ জীবের নিমিত্ত বহুতর শ্রীকৃষ্ণ লীলা রাখিয়া াছেন। তুমি ইচ্ছা কর তবে কল্পনার দ্বারা ইহা পরিবর্দ্ধন করিতে রো, কি কল্পনার দ্বারা নূতন কৃষ্ণলীলা গঠন করিতে পারো। তুমি ও কল্পনা করিয়া লীলা সাজাইবে, কিন্তু তুমি উহা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভোগী হইবে। যেমন, যদিও শকুন্তলার কাহিনী কল্পনার সৃষ্টি, তবু ার আলোচনায় উহার নাগর নাগরীর প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। কালাচাঁদ গীতায় শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে বলিতেছেন ঃ—

তথাস্তু তথাস্তু বলিলেন মাধবে।
যে খেলা খেলিবে মোদের পাইবে॥
খেলিবে তোমরা যাহা লয় মনে।
নিশ্চয় তাহাতে রব দুই জনে॥
কল্পনা করিয়া খেলা সাজাইবে।
আমার বরেতে সব সত্য হবে॥

অর্থাৎ শ্রীকালাচাঁদ ভক্তগণকে এই বর দিতেছেন যথা—"তোমরা ামাকে ও শ্রীমতী রাধাকে লইয়া খেলা করিও। এই খেলা তোমরা

কল্পনা বলে প্রস্তুত করিও, কিন্তু যদিও তোমরা কল্পনা দ্বারা খেলা সাজাইবে তবু আমি আর শ্রীমতী সেই খেলায় থাকিব।" মনে ভাব তুমি গ্রীষ্মকালে মনে মনে শ্রীকৃষ্ণকে কুসুমাসনে বসাইলে, বামে শ্রীমতীকে বসাইলে, সম্মুখে নৃত্যকারী ময়ূর রাখিলে, রাখিয়া উভয়কে বায়ু ব্যজন করিতে লাগিলে। কালাচাঁদ বলিতেছেন, এরূপ যদি তোমরা কর, তবে এই ছবিটি আমি সত্য করিব। অর্থাৎ আমরা প্রকৃতই সাধকের সম্মুখে কুসুমাসনে বসিয়া তাহার বায়ু ব্যজনরূপ উপহার গ্রহণ করিব। এই যে কালাচাঁদ গীতায় শ্রীকৃষ্ণের বর, ইহার ভিত্তিভুমি, গীতা। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন আমাকে যে, যেরূপ ভজনা করে আমি তাহাকে সেইরূপ ভজনা করিয়া থাকি। যদি শ্রীভগবান থাকেন, আর ভজন থাকে, তবে এ তত্ত্বটি সত্য। যদি শ্রীদুর্গা বলিয়া শ্রীভগবানকে ভজনা কর, তবে তিনি তোমার নিকট দুর্গা হইবেন। তুমি নিরাকার উপাসনা কর, তবে তোমার নিকট তিনি নিরাকার, তুমি নাস্তিক তোমার কাছে তিনি নাই। তুমি রাধাকৃষ্ণের যুগল উপাসনা কর, তিনি তোমার কাছে রাধাকৃষ্ণ হইয়া তোমাকে ভজনা করিবেন। গীতার বাক্যের তাৎপর্য্য এই।

এইরূপে ভক্তগণ এই যে বিশ্বস্রষ্টা ভগবান, যিনি অপরিমেয়, তাঁহার সঙ্গ করিয়া থাকেন ও ক্রমে ক্রমে শ্রীকৃষ্ণে লোভের সৃষ্টি ও পরিশেষে কৃষ্ণপ্রেম আহরণ করেন। যখন আমরা ব্রাহ্ম ছিলাম, তখন আমরা ঈশ্বরকে ইহা বলিয়া নিবেদন করিতাম, "হে ঈশ্বর আমি পাপী তুমি দয়াময় তুমি আমার পাপ মার্জ্জনা কর।" এইরূপ প্রার্থনা প্রত্যহ করিতাম, কারণ আমাদের আর কোন কথা কহিবার ছিল না। খৃষ্টীয়ান প্রভৃতি ধর্ম্ম যাচকগণ এই এক রূপ প্রার্থনা চিরদিন করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের মুখে ঐ এক কথা, কারণ মায়াতীত জ্ঞানাতীত, নিরাকার ঈশ্বরের সহিত আর কোন কথা হইতে পারে না। কিন্তু যিনি প্রকৃত সাধক, তিনি ভগবানের

; কিছু প্রার্থনা করেন না, তিনি তাঁহাকে চান। শ্রীকালাচাঁদ গীতায় গোপী শ্রীভগবানকে বলিতেছেন :—

মোদের সবারে পুতুল গড়িয়া।
খেলা কর তুমি যা তোমার হিয়া॥
কখন ভাঙ্গিছ কখন গড়িছ।
এই মত দিবা রজনী খেলিছ॥
এই মত মোরা তু দুহারে লয়ে।
খেলিব সকলে যাহা চাহে হিয়ে॥
কখন মিলাব কখন ছাড়াব।
কখন দুজনে কলহ করাব॥ ইত্যাদি।

অর্থাৎ ভক্তের প্রার্থনা এই যে আমরা তোমাকে দেখিব, দিবা নিশি ার সঙ্গে থাকিব, তোমার সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী করিব, তোমার কাছে ব, তোমার সহিত কথা কহিব, আমোদ করিব, কলহ করিব ইত্যাদি . তোমাকে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা আস্বাদ করিব, আর তাহা হইলেই দের অনিবার্য্য পিপাসা মিটিবে। তাই ভগবান উত্তরে বলিলেন, আমাকে যেরূপ ভজনা করিবে আমিও তোমাকে সেইরূপ করিব। তুমি আমার সঙ্গে সর্ব্বদা থাকিতে চাও, আমিও ার সঙ্গে সর্ব্বদা থাকিব। তুমি ইষ্টগোষ্ঠী করিবে আমিও করিব াদি।

এইরূপ ভজনে ভক্তগণ সেই মাধুর্য্যময় শ্রীভগবান, সেই শ্যামসুন্দর, বনমালী, সেই নটবর, সেই রসরাজকে খেলার সঙ্গী করিতে ন। যাঁহারা ওতপ্রোত জগতব্যাপী নিরাকার পরমেশ্বরকে ভজনা , তাঁহারা বড়লোক, তাঁহাদের স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু মূর্খ গোপিনীগণ যে—

হৃদ্ সিংহাসনে রসের বালিস।
শুয়ে তাহে নাথ ঘুচাও আলিস॥

অর্থাৎ তোমাকে হৃদয়ে করিয়া শয়ন করিব, যেমন স্ত্রীলোকে পতিে কি উপপতিকে লইয়া করিয়া থাকে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, রস, গৌণ সাত ও মুখ্য চারি প্রকার। গৌণ সা যথা হাস্য প্রভৃতি। এই সমুদায় রস দ্বারা কিরূপে ভজনা করা যায় পরে বলিতেছি। মুখ্য যে চারি রস অর্থাৎ দাস্য সখ্য ইত্যাদি ইহা আভাস দিয়াছি। আর বোধ হয় ইহার তথ্য, ভক্তগণ বেশ বুঝিয়াছেন।

রস উদ্দীপনের নিমিত্ত দুই বস্তুর প্রয়োজন, যথা—নায়ক ও নায়িকা ব ভগবান ও ভক্ত। আপনারা জানেন নায়ক ও নায়িকা কত প্রকারে আছেন। নায়ক সুন্দর আছেন, কি ধীর আছেন, কি পণ্ডিত আছে ইত্যাদি। কেহ নায়িকার বশ, কেহ স্বাধীন প্রকৃতির ইত্যাদি। এখ শ্রীকৃষ্ণকে ইহার একটি নায়ক করিয়া বিচার করা যাউক।

যদি শ্রীকৃষ্ণ নায়ক হইলেন, তবে আদৌ আমরা তিন প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ পাইতেছি, যথা—প্রথম বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ, ইনি কি রূপ, না বনমালী সরল, প্রেমভিখারী, প্রেমিক ইত্যাদি। দ্বিতীয় মথুরার শ্রীকৃষ্ণ। ইনি মহাজ্ঞানী, ক্ষমতাশালী, দণ্ডধারী শাসন কর্ত্তা রাজা। তৃতীয় দ্বারকা কৃষ্ণ। ইনি মহা সংসারী, স্ত্রী, পুত্র, পৌত্র, পিতা, মাতা, ভগিনী প্রভৃতি পরি বেষ্টিত। যদিও তিন জনেই শ্রীকৃষ্ণ, তথাচ তাঁহাদের প্রকৃতি অনে বিভিন্ন। কাজেই ইঁহাদের ভজন সেইরূপ পৃথক পৃথক। শ্রীরাধিকার ভজনী যে ব্রজের কৃষ্ণ, তাঁহার যে ভজন, তাহা মথুরায় কৃষ্ণের হইতে পারে না শ্রীমতী রাধিকা তাঁহার শ্রীকৃষ্ণকে প্রেম দিয়া প্রেমভিক্ষা করেন। ইঁহার আর কোন সাধ নাই, ভজন নাই। তিনি কৃষ্ণকে কি বলিয়া নিবেদন করিতেছেন শ্রবণ কর—

দণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে, চাঁদ মুখ না দেখিলে,
মরমে মরিয়া আমি থাকি।
দুই বাহু পশারিয়া, হৃদি মাঝে আকর্ষিয়া,
নয়নে নয়নে তোমায় রাখি॥

শ্রীমতী রাধা যেরূপ নায়ক প্রার্থনা করেন, বনমালী কি কালাচাঁদ ক তাই। ইঁহার হাতে দণ্ড নাই, বাঁশী; মাথায় পাগ নাই, চূড়া। র্থাৎ বনমালী, শাসন কি দণ্ড করেন না, মুগ্ধ করেন; আর কোন কাজ ই, কেবল গোপীগণ লইয়া প্রেমানন্দে ভোগ করা।

শ্রীমতীর মনে বিশ্বাস হয়েছে যে শ্রীকৃষ্ণ আসিবেন, এই ভাব মনে দয় হওয়ায় উল্লাসে বলিতেছেন:—

আমার আঙ্গিনায় আওবে যবে ও রসিয়া।
পালটি চলব হাম ঈষৎ হসিয়া॥

অর্থাৎ শ্রীমতী, শ্রীকৃষ্ণ আসিবেন এই আনন্দে সখীকে বলিতেছেন, খ! কৃষ্ণ যখন আমার আঙ্গিনায় আসিবেন, তখন আমি কি করিব বল খি? "আমি একবার তাহার প্রতি চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া লিয়া যাইব।" এখন পরাৎপর পরমেশ্বর সম্বন্ধে কি ঐরূপ ভজনা করা য় যে, সেই নিরাকার পরম ঈশ্বর যখন আমার বাড়ী আসিবেন, খন আমি ঈষৎ হাসিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া চলিয়া যাইব? তা হইবে না, সে কবারে বাতুলের কার্য্য হইবে। আমরা এখনি দেখাইব যে, এরূপ বোল্লাস কুব্জার সম্ভবে না, রুক্মিণীরও সম্ভবে না, এই রস দ্বারা কেবল জের কৃষ্ণকে ভজনা করা যায়। অতএব যেরূপ নায়ক, ভজন প্রণালীও হার উপযোগী হওয়া চাই, নতুবা সে ভণ্ডামী হইবে। যাঁহারা পরাৎপর মেশ্বরকে নিবেদন করিবেন, তাঁহাদের উহা আর এক রসের সাহায্যে রিতে হইবে। মথুরায় কি দ্বারকায় শ্রীমতী নাই।

তাহার পরে মথুরার শ্রীকৃষ্ণ। ইনি রাজ্যেশ্বর, ইঁহার ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই। ইঁহার নিকট যদি কিছু চাহিতে হয়, তবে মথুরাবাসিগণ ঐশ্বর্য্য চাহিবেন, প্রেম নহে; ঐশ্বর্য্যই তিনি দিয়া থাকেন। মথুরাবাসিগণ প্রেমের ধার ধারেন না। আর কিনা তিনি অপরাধীকে দণ্ড ও মার্জ্জনা করিতে পারেন। ব্রজের গোপীর প্রার্থনা বা নিবেদন উপরে দিয়াছি। এখন মথুরাবাসীর প্রার্থনা শ্রবণ করুন। এটি বিদ্যাপতির গীত ঃ—

"মাধব হে, বহুত মিনতি করি তোমায়।"
আমি, দিয়ে তুলসী তিল, এদেহ সমর্পিল,
দয়া করি না ছাড়িবে আমায়॥
গণইতে দোষগুণ, গুণলেশ না পাওবি,
যবে তুমি করিবে বিচার।
তুমি জগন্নাথ, জগতে বলাইয়াছ,
জগ ছাড়া নহি মুই ছার॥

বিদ্যাপতি বলিতেছেন, "শ্রীকৃষ্ণ! আমি তুলসী তিল দিয়া আমার এই দেহ তোমার পাদ পদ্মে একবারে সমর্পণ করিলাম, আমাকে ত্যাগ করিও না। অবশ্য যখন তুমি দোষ গুণ বিচার করিবে, তখন তুমি আমার কোন গুণ পাইবে না। কিন্তু তুমি জগতের নাথ, আমি তোমার সেই জগতে বাস করি, আমাকে তুমি একবারে ত্যাগ করিতে পার না।"

উপরে দুই প্রকার কৃষ্ণ দেখাইলাম, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কৃষ্ণ দুই প্রকার নহেন। শ্রীকৃষ্ণ মোটে এক প্রকার, তবে সাধক ভেদে তিনি পৃথক হয়েন। যিনি বলেন, হে কৃষ্ণ আমার পাপ মার্জ্জনা কর, তাহার কৃষ্ণ দণ্ডধারী, তিনি বংশীধারী হইলে চলিবে না। আর যিনি বলেন, তোমাকে হৃদয়ে ধরিয়া নয়নে নয়নে রাখি, তাহার কৃষ্ণ আর ঐশ্বর্য্যশালী পাগবান্ধা হইতে পারেন না, তাহার কৃষ্ণ রাখাল রাজা ইত্যাদি।

যাঁহারা শ্রীভগবানের নিকট কেবল প্রেম-ভক্তি ভিক্ষা করেন, তাঁহারা ব্রজবাসী। তাঁহাদের লীলাময় সুন্দর ঠাকুরের প্রয়োজন। যাঁহারা শ্রীভগবানের নিকট পাপ মার্জ্জনা, মুক্তি প্রভৃতি, কি কোন আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্য যথা, অষ্টসিদ্ধি প্রভৃতি কামনা করেন, তাঁহারা মথুরার লোক, তাঁহাদের ঠাকুর সুন্দর হউন, কি কুৎসিত হউন, নিরাকার হউন, কি তেজোময় হউন, ইহাতে আইসে যায় না। যাঁহারা শুদ্ধ সাংসারিক উন্নতি কি বিপদ হইতে উদ্ধার কামনা করেন, তাঁহারা দ্বারকার লোক। তাঁহাদের ঠাকুরও যেরূপই হউন, তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

শাক্ত মহাশয়গণের শ্রীদুর্গা যেরূপ বৈষ্ণবগণের দ্বারকার কৃষ্ণ সেইরূপ। দুর্গা পূজাতে সাধক প্রার্থনা করেন, ধনং দেহী, পুত্রং দেহী ইত্যাদি। দ্বারকার কৃষ্ণও সেইরূপ, ধনবর, পুত্রবর ইত্যাদি দিয়া থাকেন। অতএব যাঁহারা নিরাকারবাদী, অথচ বলেন ঈশ্বরের প্রেম সর্ব্বোচ্চ সাধনা, তাঁহাদের কথায় মিল নাই। কারণ ঠাকুর লীলাময় বিগ্রহ না হইলে, সাধকের প্রেম হইতে পারে না ও ভগবানের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী চলে না। অনেকে এই শেষের তত্ত্ব না মানিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের সহিত তর্ক করিতে আমাদের প্রবৃত্তি নাই। তবে এই মাত্র বলি যে, কোনও সময়ে আমরা সরল ভাবে নিরাকার ঈশ্বরকে ভজনা করিয়াছিলাম। তাহাতে তাঁহার নিকটে ঘেঁসিতে পারি নাই, তিনি চিরদিন সমান দূরে ছিলেন।

আবার নাগর উপরি উক্ত তিন প্রকার কেন, বহু প্রকারের হইতে পারেন। এমন কি, ব্রজের, কি মথুরার, কি দ্বারকার কৃষ্ণেরও নানারূপ আছে, ইহা ক্রমে দেখাইতেছি।

সাতটী গৌণ রস যথা—হাস্য, বীর, করুণ, অদ্ভুত, বিভৎস, রৌদ্র ও ভয়ানক।

১। হাস্য। ইহার অবলম্বন শ্রীকৃষ্ণ; উদ্দীপক কৃষ্ণের বিদূষক।

ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করেন, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকে মধুমঙ্গল নামক একটী বিদুষক দিয়াছেন। ইনি একটী ব্রাহ্মণ যুবক, অত্যন্ত পেটুক, দিবানিশি শ্রীকৃষ্ণকে ক্ষুধার যন্ত্রণার কথা বলেন। বড়াইকে দেখিয়া ডাকিনী ভাবিয়া ভয়ে মূর্চ্ছিত হয়েন। কখন বা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বিদুষক হয়েন। এইরূপ শ্রীকৃষ্ণকে বিদুষক সাজাইয়া তাঁহার ভক্তগণ আনন্দে আকুল হয়েন।

২। বীর। বৈষ্ণবগণের মধ্যে যাঁহারা বীর রস দ্বারা ভজনা করেন, তাঁহাদের ঠাকুর সাধারণতঃ নৃসিংহ বা রামচন্দ্র। শ্রীকৃষ্ণ অবলম্বন করিয়া কখন কখন ভক্তগণ বীররসে মোহিত হয়েন, কিন্তু যাঁহারা শক্তি উপাসক তাঁহাদের বীররসই প্রধান অবলম্বন। যেমন শুম্ভ, নিশুম্ভ কাহিনী ইত্যাদি।

৩। করুণরস। ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণকে কান্দাইয়া থাকেন, কখন দয়াতে আর্দ্র করিয়া থাকেন। দুই একটি উদাহরণ শ্রবণ করুন। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় যাইবেন, আর বৃন্দাবনে আসিবেন না। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলেই যশোমতী নানা কুচিন্তায় ব্যাকুলিত হইতে লাগিলেন। ধনিষ্ঠা সখীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন; যথা—পদ

দুদিনের তরে, যাবে মথুরানগরে,
যাবার বেলা কেন কান্দিল ?

বলিতেছেন, "সখি! মথুরায় কৃষ্ণ গেল, কালি আসিবে বলিয়া গেল, তবে যখন আমাকে প্রণাম করিয়া বিদায় হয়, তখন কান্দিল কেন?" কথা এই শ্রীকৃষ্ণ জানেন যে, তিনি আর আসিবেন না। আর এই কথা জননীর নিকট গোপন রাখিয়াছেন। কিন্তু যখন জননীর নিকট বিদায় হয়েন, তখন ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না, কান্দিয়া ফেলিলেন। অবশ্য ভক্তগণ এই লীলা মনে করিয়া দ্রবীভূত হয়েন।

শ্রীভগবান্ কিরূপ স্নেহশীল, প্রেমকাঙ্গাল, তাহার আর একটি কাহিনী শ্রবণ করুন। ভক্তেরা এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের করুণ হৃদয় বর্ণনা করিয়া ভক্তিতে

গদগদ হয়েন। দেবকী কৃষ্ণকে বাড়ীর ভিতর ডাকাইয়া আনিয়াছেন। কৃষ্ণ অন্তঃপুরে আসিয়া একটি আসনে বসিলেন। তাঁহার সম্মুখে, পাত্রে যথেষ্ট ননী আছে। দেবকী তাহার একটু ননী হাতে লইয়া বলিতেছেন, "কৃষ্ণ! আমি শুনিয়াছি যে সেই গোয়ালা মাগী যশোদা নাকি তোমাকে ননী খাওয়াইত। আর তুমি নাকি তাহা বড় ভালবাসিতে। আজ আমি তোমাকে সেইরূপ ননী খাওয়াইব।" এই কথা বলিয়া ননী লইয়া, কৃষ্ণের মুখে দিতে গেলেন, আর শ্রীভগবানের বদন একবারে আন্ধার হইয়া গেল। কারণ তখন তাহার দুঃখিনী জননীর ও তাঁহার প্রেমের কথা মনে পড়িল। শ্রীকৃষ্ণের কোমল হৃদয় ও ঔদার্য্য দেখাইবার আর একটী মাত্র কাহিনী বলিব।

মুনিগণের মধ্যে বিচার হইতেছে, কে বড়, মহাদেব, ব্রহ্মা, না কৃষ্ণ? ইহার সাব্যস্ত করার ভার পাইলেন ভৃগুমুনি। তিনি অগ্রে ব্রহ্মার ওখানে গেলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে আদর করিলেন, আর ভৃগু তাঁহাকে গালি দিতে লাগিলেন। ইহাতে ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বধ করিতে আইলেন, পরে নারদের অনুরোধে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন। ভৃগু পরে মহাদেবের ওখানে গমন করিলেন, যাইয়া "তুমি ভাঙ্গ খোর উলঙ্গ কাণ্ডজ্ঞানশূন্য" ইত্যাদি বচনে তাহাকে অভিবাদন করিলেন। মহাদেব ত্রিশূল লইয়া ভৃগুকে বধ করিতে আইলেন। আর ভগবতী তাঁহার হাত ধরিলেন।

পরে শ্রীকৃষ্ণের ওখানে আইলেন। আসিয়াই তাঁহার হৃদয়ে পদাঘাত করিলেন। অমনি শ্রীকৃষ্ণ অতি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া ভৃগুর হাত দুখানি ধরিয়া অতি নম্র হইয়া বলিতে লাগিলেন, "মুনিবর! আমার অপরাধ ক্ষমা কর, অবশ্য তোমাকে আমি উপযুক্ত সমাদর করি নাই। আমার কঠিন হৃদয়ে তোমার কোমল পদ অতিশয় ব্যথা পাইয়াছে।" ইহা বলিয়া তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইয়া লক্ষ্মীর সঙ্গে সেবা করিতে লাগিলেন, সেই

নবম অধ্যায়।

মান।

এইরূপ মানের পালা আলোচনা করিলে নানা রসের আস্বাদ পাওয়া যায়। উহা এখন বর্ণনা করিব। শ্রীকৃষ্ণ বহুবল্লভ, তাঁহার অনুগত নাগরী অগণন। আর তাঁহাদের সকলের সর্ব্বস্ব তিনি, কাজেই মান হইবার কথা। মনে ভাবুন, শ্রীকৃষ্ণের উপর মান করায় গোপীগণকে তত অপরাধ দেওয়া যায়না। কারণ, মানের ভিত্তিভূমি প্রেম। যেখানে প্রেম সেখানে মান। না, ভাল বলিলাম না, যেখানে মান, সেখানে প্রেম জানিবেন। যে নায়িকা কৃষ্ণের উপর ক্রোধ করিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিতে চাহেন, কি তাঁহাকে কটু বলেন, তাঁহার এইরূপ ব্যবহারে প্রমাণ করে যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিতান্ত অনুগত। কি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রাণ।

গম্ভীরায় প্রভু বসিয়া আছেন, বদন অতি প্রফুল্ল। স্বরূপ, রাম রায় মনে মনে ভাবিতেছেন যে, প্রভু, না জানি কি ভাবে বিভাবিত। এমন সময় প্রভু রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া বলিলেন, "সখি! বড় শুভ সংবাদ, অদ্য শ্রীকৃষ্ণ আসিবেন, শীঘ্র তাঁহার আয়োজন কর।" এখন, 'প্রিয়তম', রজনীতে নায়িকার মন্দিরে আসিতেছেন, তাঁহার অভ্যর্থনার আয়োজন কি? তাহার আয়োজন শয্যা প্রভৃতি। প্রভু বলিতেছেন, "শীঘ্র কুসুমচয়ন কর, চন্দন চুয়া সংগ্রহ কর। মালতীর মালা গাঁথ। দেখ সখি! শ্রীকৃষ্ণ বড় পাখীর গীত ভাল বাসেন, বৃন্দাবনে শুক সারিকে সংবাদ দাও তাহারা এই কুঞ্জ ঘিরিয়া বসুক।

বন্ধু আইলে তাহারাই অগ্রে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিবে। আর ময়ূর ময়ূরীর নৃত্য নিতান্ত প্রয়োজন।" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া প্রভু আবার বলিতেছেন, "আমি আর তোমাদিগকে কি বলিব, তোমরাত জানো। কৃষ্ণ আসিতেছেন তাঁহার উপযুক্ত বাসক শয্যা কর।" ইহাকে বলে বাসক শয্যা। ইহার একটি গীত শ্রবন করুন।

শ্রীমতী বলিতেছেন ঃ—

সুখের রাতি, জ্বালহে বাতি,
মন্দির কর আলা।
কুসুম তুলিয়া, বোটা ফেলি দিয়া,
গাঁথহে মালতী মালা॥
অগুরু চন্দন, কুসুম আসন,
সপুষ্প লবঙ্গ ডাল।
শুভ আলিপনা, কুসুম বিছানা,
গাঁথহে কদম্ব মাল।
যমুনার বারি, পূরি হেম ঝারি,
রাখহে শীতল করি।
পিক শুক সারী, ডাক ত্বরা করি,
নিকুঞ্জে বসুক ঘেরি॥

হে কৃষ্ণ-প্রাণ গোপীভাবে অভিভূত পাঠক! এইরূপ হৃদয় মাঝারে বাসক সজ্জা করিয়া, বন্ধুর নিমিত্ত বসিয়া থাকিও। তিনি আইলেও পারেন, না আইলেও পারেন। কিন্তু আসুন আর না আসুন উভয়েতেই তুমি আনন্দ পাইবে, এবং কিছু প্রেমের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে।

সন্ধপ, প্রভুর ভাবের সহানুভূতি করিয়া বলিতেছেন, বেশ! আমরা

বাঁশার সুর বান্ধি। কিন্তু শ্রীমতি! সর্ব্বাগ্রে তোমার বেশভূষা করা উচিত। তোমাকে এমন ভুবনমোহিনী সাজাইব যে, বন্ধু একবারে মোহিত হইবেন। প্রভু (রাধাভাবে), "না না আমাকে সাজাইতে হইবে না। আমার ত সর্ব্বাঙ্গে ভূষণ রহিয়াছে। আর ভূষণের স্থান কোথা? ভূষণে আদৌ আমার প্রয়োজন নাই। যথা পদ—

শ্যাম পরশ মণি সখি তাকি জান না।
সে অঙ্গ পরশে আমার এ অঙ্গ সোণা॥

প্রভু বলিতেছেন "যাহার পরশ মণির পরশ হয়েছে, তাহার আবার ভূষণের কি প্রয়োজন? তোরা ত জানিস্ আমি ছিলাম লোহা, আর তিনি পরশ করিয়া আমাকে সোণা করিয়াছেন।" সরূপ বলিলেন, "তবু নয়নে, হস্তে, কর্ণে, বদনে, সকল স্থানে ভূষণ দিয়া তোমাকে সাজাইব।" প্রভু বলিতেছেন, "আমার গলার ভূষণ ত আছে, সে শ্যাম নামের হার।" যথা পদ—

আমি পরেছি শ্যাম নামের হার।
হস্তের ভূষণ আমার চরণ সেবন।
বদনের ভূষণ আমার শ্যাম গুণ গান॥
কর্ণের ভূষণ আমার নাম শ্রবণ।
নয়নের ভূষণ আমার রূপ দরশন॥
যদি তোরা সাজাবি মোরে।
কৃষ্ণ নাম লেখ আমার অঙ্গ ভরে॥ *

প্রভুর মুখে একটু দুঃখের ছায়া দেখিয়া সরূপ বুঝিলেন যে, কৃষ্ণের আসিতে বিলম্ব হওয়া তাঁহার সহিতেছে না। তাই সে ভাব ফিরাইবার নিমিত্ত এই গীতটি গাইলেন।

---

* এই পদটী প্রভুর নিজের বলিয়া খ্যাত।

অতি দুরবল দেহ ধরা নাহি যায়।
আছাড়িয়া পড়ে অঙ্গ ভূমে গড়ি যায়॥
দীঘল শরীরে গোরা পড়ে মুরছায়।
উত্তান নয়ন মুখে ফেণ বহি যায়॥
চৌদিকে ভকতগণ কান্দিয়া ভাসায়।
বাসুদেব ঘোষের হিয়া বিদরিয়া যায়॥

এই একটী পদ বিচার করিয়া দেখুন, তাহা হইলে ভগবৎ প্রেম কাহাকে বলে, তাহা কতক বুঝা যাইবে। মন্দিরের সিংহদ্বার ছাড়িয়া প্রভু সমুদ্র পথে চলিলেন। যাইতে সম্মুখে একজনকে দেখিলেন। দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাই কৃষ্ণ কোথা বলিতে পার? সে প্রথমে অবাক্, পরে কান্দিয়া ফেলিল। কান্দিল কেন বলিতেছি। প্রভুর মুখের ভাব দেখিয়া তাহার একটী অবস্থার কথা মনে পড়িল। পুত্র এই মাত্র মরিয়াছে, জননী পাগলিনী হইয়া ছুটাছুটি করিতেছেন, আর যাঁহাকে পাইতেছেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আমার অমুক কোথা দেখিয়াছ, বলিতে পারো? তাহার মুখে যেরূপ অবর্ণনীয় দুঃখের চিহ্ন দেখা যায়, প্রভুর মুখেও সেইরূপ দুঃখের ছায়াবৃত। সেই পুত্রশোকাকুলি মাতার প্রশ্নে লোকে যেরূপ কান্দিবে, এ সেইরূপ, সেই লোকটি প্রভুর প্রশ্নে কান্দিল। প্রভু দেখেন সম্মুখে আর একজন, আবার তাহাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সেও কান্দিল। প্রভু এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতে করিতে লোককে কান্দাইতে কান্দাইতে চলিয়াছেন, প্রভুর বদনে ঘোর বিয়োগের রেখা পড়িয়াছে। গলা শুষ্ক হইয়াছে, কথা বলিতে পারিতেছেন না।

এদিকে শরীর অতিশয় দুর্ব্বল, এমন দুর্ব্বল যে তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতে হয়। অতি দীর্ঘ, তাহাতে অতি দুর্ব্বল, হাটিতে কাঁপিতেছেন। হৃদয়ে বিষের ন্যায় জ্বালা, কাজেই দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না, কাজেই

অভিভূত পাঠক মহাশয়! কৃষ্ণের আসিতে বিলম্ব হইলে ঐরূপ অধৈর্য্য হইও, তাহা হইলে তিনি আর বিলম্ব করিবেন না। ইহাকে বলে উৎকণ্ঠিতা। প্রভুর তখন কি দশা হয়েছে, না,—

"পড়ে পাতের উপরে পাত,
ঐ এল প্রাননাথ"

বলিয়া চমকাইয়া উঠিতেছেন। কোন একটি শব্দ হইলেই অমনি ঐ বঁধু এলেন, বলিতে লাগিলেন। পরে কৃষ্ণ আসিবার ভরসা গেল, তখন, যথা চণ্ডীদাসের পদ:—

দুকান পাতিয়া, ছিল এতক্ষণ,
বঁধু পথ পানে চাই।
পরভাত নিশি, দেখিয়া অমনি,
চমকি উঠিল রাই॥
পাতায় পাতায়, পড়িছে শিশির,
সখিরে কহিছে ধনি।
বাহির হইয়া, দেখলো সজনী,
বঁধুর শবদ শুনি॥
পুন কহে রাই, না আসিল বঁধু,
মরমে রহিল ব্যথা।
কি বুদ্ধি করিব, পাষানে ধরিয়া,
ভাঙ্গিব আপন মাথা॥
ফুলের এ ডালা, ফুলের এ মালা,
সেয বিছাইনু ফুলে।
সব হইল বাসি, আর কেন সই,
ভাসাগে যমুনা জলে॥

তুমি শ্রীকৃষ্ণকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত, আয়োজন করিয়া পরে যখন তিনি আইলেন না, দেখিয়া রাগ করিয়া বাসি ফুল ফেলিয়া দিতে পারিবে, তখন রসিক শেখর শ্রীমতীকে যাহা করিয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহাকে স্তুতি বাক্য বলিয়াছিলেন, তোমাকে ততদূর না করুন সেইরূপ কিছু করিবেন।

হে পাঠক! রসের ভজন-শিক্ষা কিরূপ তাহা প্রভু আপনি আচরিয়া দেখাইয়াছেন। ক্ষুদ্র জীব শ্রীভগবানকে "রক্ষমাং পাহিমাং" বলিয়া ভজন করিয়া থাকে। এখন দেখুন সেই জীব আপন ভাবিয়া তাঁহার প্রতি ক্রোধ করিয়া তাঁহাকে কিরূপ ভজন করিতেছেন। প্রভু তখন সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিলেন, দেখিয়া বলিতেছেন "ঐ দেখ আসিতেছেন" অমনি বদন প্রফুল্ল হইল। মনে ক্রোধ ছিল, আনন্দে উহা ভাসিয়া গেল। তখন চুপে চুপে সরূপকে বলিতেছেন, "ঐ দেখ বন্ধু বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া ভয়ে ভয়ে আসিতেছেন। আসিতে সাহস হইতেছে না।" তখন শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "এসো বন্ধু তুমি সচ্ছন্দে এসো, আমি রাগ করিব না। যে দুঃখে রজনী কাটাইয়াছি তাহা আমার প্রাণ জানে। বল দেখি রজনী কোথা বঞ্চিলে?" আবার বলিতেছেন, "একি! তোমার বদনে তাম্বুলের দাগ কেন? ওমা, এ আবার কি ভয়ানক! তোমার বদনে দংশনের দাগ কেন? বুঝেছি, তুমি আমাকে বঞ্চিয়া আর কোথায় ছিলে। আর সেই পাপিয়সী আপনার সুখের নিমিত্ত তোমার বদনে দন্তাঘাত করিয়াছে। ছি! ইহা বলিয়া প্রভু মুখ ফিরাইয়া বসিলেন, অর্থাৎ রাধা মান করিলেন।

এখানে চণ্ডীদাসের যে পদ আছে, তাহা দিতে ইচ্ছা করিতেছে। ইহাতে সখীগণ শ্রীভগবানকে, কিরূপ বিদ্রূপ করিতেছেন তাহা বর্ণিত আছে। এই রসকে খণ্ডিতা বলে।

ছাড়হে চাতুরী ও নাগর রতি চোর।
জানি জানি জানি তুমি মদনে বিভোর।
কোন ধনি উঠাইল নব অনুরাগ।
চুম্বনে দেওল (চাঁদ বদনে) তাম্বুল দাগ।

তাহার পরে বিদ্রুপের ছটা দেখুন। তাই চণ্ডীদাস প্রভুর এত প্রিয়, তাই অনেকে বলেন, জগতে চণ্ডীদাসের ন্যায় কবি আর জন্ম গ্রহণ করেন নাই।

শুন শুন বঁধু তোমায়, বলিহারি যাই।
ফিরিয়া দাঁড়াও, তোমার চাঁদমুখ চাই॥
আই আই পড়েছে মুখে, কাজলের শোভা।
ভালে সে সিন্দুর বিন্দু মুনি মনলোভা॥
হাদে হে নিলাজ বঁধু, লাজ নাহি বাস।
বিহানে পরের বাড়ী, কোন লাজে এস॥
সাধিলে মনের সাধ, যে ছিল তোমারি।
দূরে রহ দূর রহ প্রণাম হামারি॥
কেমন পাষাণী যার দেখি হেন রীতি।
কে কোথা শিখালে তারে, এ হেন পিরীতি॥
বড় দুঃখ পাইয়াছ, যামিনী জাগিয়া।
চণ্ডীদাস কহে শোও হিয়ায় আসিয়া॥

দেখুন, পরাৎপর-পরমেশ্বর, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অদ্বিতীয়-অধীশ্বরের, লাঞ্ছনা দেখুন। ভাল, তিনি কি এইরূপ বিদ্রুপে রাগ করেন? আপনি বলেন কি? চণ্ডীদাস শেষে এই অতুল কবিতার অতুলন সমাপ্তি করিয়াছেন। যথা :—

বড় দুঃখ পাইয়াছ রজনী জাগিয়া।
চণ্ডীদাসের হিয়ায় শোও হে আসিয়া॥

চণ্ডীদাস বড় চতুর, এই উদ্‌যোগে শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে পুরিবেন। প্রভু বলিতেছেন, সখি, উঁহাকে যেতে বল ! আমি উঁহাকে চাহি না। প্রভু, রাধাভাবে মান করিয়া ক্রোধে কৃষ্ণের কথা বন্ধ করিয়া সখীকে বলিতেছেন, আমি উঁহাকে চাহি না। আমি তাহা হইলে মরিব, বলিতেছ ? বেশ, তা মরি মরিব, সেও ভাল ; এরূপ নাগর আমি চাই না। প্রভু তখন দেখিতেছেন, যেন কৃষ্ণ জয়দেবের শ্লোক, অর্থাৎ মুক্তময়ীমানমনিদানং, পড়িয়া তাঁহাকে তুষিতেছেন। তখন কৃষ্ণকে বলিতেছেন, তুমি এই জয়দেবের শ্লোক যেখানে রজনী বঞ্চিয়াছ সেখানে যাইয়া পড়, এখানে কেন ?

পরে কৃষ্ণ, কোন ক্রমে শ্রীমতীর ক্রোধ শান্তি করিতে না পারিয়া কান্দিতে কান্দিতে চলিয়া গেলেন, তখন "কলহান্তরিতা" রসের সৃষ্টি হইল। কৃষ্ণ গেলে, তখন শ্রীমতী অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ধুলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন, যথা—

"সখি, যাবার বেলা কেন্দে গেল।
আরত ফিরে নাহি এলো॥"

পূর্ব্বে মাথুর লীলার কথা বলিয়াছি। এখন মান লীলার কথা বলিলাম। ইহা ব্যতীত অন্যান্য লীলার আভাস দিতেছি যথা, আপনি কাণ্ডারী হইয়া ব্রজগোপীকে পার করিতেছেন। গোপীগণ কুলে দাঁড়াইয়া কাণ্ডারীকে বলিতেছেন :—

আমাদিগে পার করে দে।
ও সুন্দর নেয়ে হে। ধ্রু।
আমাদের, বেলা গেল সন্ধ্যা হলো।
আমাদের কিকি কিনি সারা হলো।
আমরা বাড়ী যাব নিয়ে চল।

মোদের পারের কড়ি দিবার নাই।
পার কর বাড়ী যাই। ইত্যাদি ইত্যাদি।

শ্রীনিতাই যখন গৌড়ে প্রচার করেন, তখন বলিয়া বেড়াইতেন. "আমাদের, গৌরাঙ্গের ঘাটে অদান খেওয়া বয়।"

অর্থাৎ হে জীব! আমাদের প্রভুর ঘাটে দান অর্থাৎ পারের কড়ি লাগে না।

পরে আর একটি লীলা, দানখণ্ড। গোপীগণ বৃন্দাবনে যাইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ পথ আগুলিয়া দাঁড়াইলেন। বলিতেছেন. তোমরা বৃন্দাবনে

শ্রীকৃষ্ণ। তবে তোমরা আপনাকে সমর্পণ কর।

শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন যে, বৃন্দাবনে যাইতে হইলে অগ্রে তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। এইরূপে কীর্ত্তন করিয়া, ভক্তগণ নানা রসে শ্রীভগবানের সঙ্গ করিয়া থাকেন। কখন কাণ্ডারী ভাবে, কখন মহাদানী ভাবে, কখন নানাবিধ নাগর ভাবে তাঁহাকে ভজন করেন। ভক্ত, সঙ্গীতজ্ঞ-কবিগণ এই সমুদয় চিত্তহর কীর্ত্তন সৃষ্টি করিয়াছেন। তাই বলরাম দাস শ্রীগৌরাঙ্গকে বলিয়াছেন :—

সাধন কণ্টকীপথে ফুল ছড়াইল।

অর্থাৎ মহাপ্রভু ভজন সাধন অতি সুখকর করিয়া দিয়াছেন।

কৃষ্ণলীলার কথা আর বলিবার প্রয়োজন নাই। এ সব কি সত্য হইয়াছিল, না কল্পনার সৃষ্টি? যে ভাগবতাদি শাস্ত্র মানেন, তাঁহারা বলেন, সব সত্য হইয়াছিল। যাঁহারা না মানেন, তাঁহারা বলেন এ সমুদয় কল্পনার সৃষ্টি। কিন্তু পূর্ব্বের কথা স্মরণ করুন। এই সমুদায় লীলা শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের নিমিত্ত, তাঁহার সহিত সঙ্গ করিবার নিমিত্ত। অতএব

ইহা সত্য কি কল্পিত তাহাতে আইসে যায় না। বিবেচনা কর, মান লীলা। ইহা আলোচনা করিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে নানা ভাবে সাজাইয়া তাঁহার সহিত বহুক্ষণ ইষ্টগোষ্ঠী করা যায়। আর ওরূপ ইষ্টগোষ্ঠী করার ফল, কৃষ্ণপ্রেম যাহা জীবের পরমপুরুষার্থ। সব লীলার উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করা, আর ভগবান্ লীলাময় না হইলে তাঁহার সহিত এরূপ ইষ্টগোষ্ঠী করা যায় না।

কিন্তু যদি প্রকৃতই এই সমুদায় লীলা ভক্তগণের সৃষ্ট হয়, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। কারণ, প্রভু সমুদায় কৃষ্ণলীলা সাক্ষী দিয়া উহা [illegible] করিয়াছেন।

ভৃগুপদচিহ্ন শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে একটি অতি সুন্দর শোভা হইল। ভক্তগণ গদগদ হইয়া বলিয়া থাকেন যে, শ্রীকৃষ্ণের যত ভূষণ আছে তাহার মধ্যে ভৃগুপদচিহ্ন সর্ব্বপ্রধান।

৪ অদ্ভুত। এই রসের দ্বারা প্রধানতঃ নিরাকারবাদিগণ ভগবানের ভজনা করিয়া থাকেন। যাঁহারা নিরাকারবাদী তাঁহারা নাস্তিক হইতে এক সিঁড়ি উপরে। তাঁহাদের ভগবানের সহিত যে ইষ্টগোষ্ঠি, তাহা কেবল তাঁহার সৃষ্টিপ্রক্রিয়া লইয়া, সুতরাং তাঁহারা অদ্ভুতরসের সাহায্যে ভগবানকে উপাসনা করিয়া থাকেন। একটী কীট এত ক্ষুদ্র যে, চক্ষে দেখা যায় না, কিন্তু যন্ত্রে দেখা গেল যে, যদিও এত ক্ষুদ্র, তবু তাহার জীবনযাত্রা দিব্য চলিতেছে। অমনি ভক্ত বলিবেন, অদ্ভুত! অদ্ভুত! বিজ্ঞানবিৎ বলিলেন, এক সেকেণ্ডে একটী ধূমকেতু সহস্র সহস্র ক্রোশ ভ্রমণ করে। অমনি ক্ষুদ্র জীব একবারে শ্রীভগবানের শক্তি দেখিয়া মোহিত হইলেন।

গৌণ রসের মধ্যে বীর, রৌদ্র, বীভৎস, অদ্ভুত, দ্বারা শক্তি উপাসকগণ (যাঁহারা কালী, তারা, ছিন্নমস্তা প্রভৃতি শক্তির উপাসনা করেন) এইরূপে শ্রীভগবানের ভজনা করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবগণ শ্রীভগবানের মাধুর্য্য উপাসক, সুতরাং তাঁহাদের গৌণরসের মধ্যে হাস্য আর করুণ ব্যতীত অন্য রসের সাহায্য প্রয়োজন হয় না। শক্তি উপাসকগণ শ্রীভগবানকে ভজনা করিতে এ সমুদায় অভদ্র রসের কেন আশ্রয় লয়েন, তাহা ঠিক আমরা বলিতে পারি না।*

* শক্তি উপাসকগণ সাধন দ্বারা কুলকুণ্ডলিনী, যিনি নিদ্রিত আছেন, তাঁহাকে জাগরূক করেন। বৈষ্ণবগণ ইহাকে বলেন শ্রীমতীর কৃপা লাভ করা, কি প্রেমলাভ করা। যাঁহারা কুলকুণ্ডলিনী জাগরূক করেন, তাঁহারা অষ্টসিদ্ধি পায়েন। যাঁহারা শ্রীমতীর কৃপালাভ করেন, তাঁহারা কৃষ্ণপ্রেম পায়েন।

দশম অধ্যায়।

প্রভুর অবস্থা।

গম্ভীরা ভিতরে গোরা রায়, জাগিয়া রজনী পোহায়।
খেনে, খেনে করয়ে বিলাপ, খেনে রোয়ত খেনে খেনে কাঁপ।
খেনে ভিতে মুখ শির ঘসে, কই নাহি রহু পহু পাশে।
খেনে কান্দে তুলি দুই হাত, কোথায় আমার প্রাণনাথ।
নরহরি কহে মোর গোরা, রাইপ্রেমে হলো মাতোয়ারা॥

শ্রীভগবানের প্রেম জীবের সর্ব্বাপেক্ষা বহু মূল্য ধন। শাস্ত্রে দেখি যে, সে প্রেম কেবল শ্রীমতী রাধার আছে, আর শ্রীগৌরাঙ্গ আপনি আচরিয়া জীবকে দেখাইয়া গিয়াছেন। যখন সার্ব্বভৌম প্রথমে প্রেমে অচেতন প্রভুকে দেখিলেন, তখন মনে এইরূপ বিচার করিতে লাগিলেন। শাস্ত্রে যে ভগবৎপ্রেমের কথা শুনিয়াছি, তাহা তবে সত্য। প্রভু এ পর্য্যন্ত যে কঠোর জীবনযাপন করিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার শরীর দুর্ব্বল হইয়াছিল, কিন্তু তিনি নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে আর তাহা রহিল না। যখন প্রভু দক্ষিণ হইতে নীলাচলে আইলেন, তখনও তাঁহার পদতল পদ্ম ফুলের মত, আর তাঁহার অঙ্গ দিয়া চিরদিন যেমন হইত সেইরূপ পদ্মগন্ধ বাহির হইতেছিল। রামচন্দ্র পুরী আসিয়া প্রভুর ভোজন কমাইয়া দিলেন। প্রভু অগ্রে একপ্রকার উপবাস করিতেছিলেন, ভক্তগণের অনুরোধে তাহা ছাড়িয়া অর্দ্ধভোজন আরম্ভ করিলেন। প্রভু অর্দ্ধ ভোজন করিয়া প্রাণ রাখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অতিশয় দুর্ব্বল হইলেন। বাসুদেবের পদ এই :—

সিংহদ্বার ছাড়ি গোরা সমুদ্র পথে ধায়।
কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ সবারে সুধায়॥

আমার আঙ্গিনায় আওবে যবে রসিয়া।
পালটি চলব হাম ঈষত হাসিয়া॥

প্রভুকে বলিতেছেন, "কেমন সখি তাহাই করিতে পারিবে তো?"

প্রভু প্রকৃতই একটু মধুর হাসিলেন! বলিতেছেন, "ভাই! ও সব তোমাদের কাজ, আমায় ওসব চপলতা ভাল আইসে না। তবে আমি—

গাঢ় আলিঙ্গনে, ঘন ঘন চুম্বনে,
ঘুচাইব হৃদয়ের তাপ।"

"কৃষ্ণ, এখনি আসিবেন ব্যস্ত হইও না" এই যে সখীর আশ্বাস বাক্য, ইহাকে বলে বিপ্রলব্ধা। কিন্তু প্রভুর মুখে আবার দুঃখের ছায়া দেখা দিল। শ্রীকৃষ্ণ আসিতেছেন না। প্রভু ক্রমে ক্রমে উদ্বিগ্ন হইতেছেন। শেষে, মৃদু স্বরে উহু উহু আরম্ভ করিলেন। এই "উহু উহু" ক্রমেই ফুটিতে লাগিল। শেষে নানা প্রকারে আপনার ক্লেশ ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। প্রভু উঠিয়া দাড়াইলেন, সরূপ ধরিয়া বসাইলেন। বলিতেছেন, "সখি! কই, কই তিনি?" সরূপ বলিতেছেন, "ধৈর্য্য ধর, এই এলেন বলে।"

প্রভু বলিলেন, "তবে আমি একটু নিদ্রা যাই", ইহা বলিয়া সরূপের জানুতে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিলেন, কিন্তু আবার তখনি উঠিলেন, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। বলিতেছেন,—"সখি! কই? কই, তিনি কই। তিনি কি আসিবেন না? সখি! আমার সেই চন্দ্রবদন কোথা, সখি! কোথা আমার চিত্তচোর, কোথা আমার রাসবেহারি, কোথা আমার নৃত্যকারী।" ইহাই বলিতে বলিতে রোদন করিতে লাগিলেন। সরূপ নানারূপে প্রবোধ দিতেছেন। প্রভু একবার উঠিতেছেন, একবার বসিতেছেন, একবার শয়ন করিতেছেন, একবার উকি মারিতেছেন। একবার বাহিরে যাইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছেন। পরিশেষে সহস্র সহস্র বৃশ্চিক কর্ত্তৃক দষ্ট ব্যক্তির ন্যায় ধুলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। হে গোপীভাবে

কমনীয় ভাব প্রকাশ পাইতেছে যে, উহা দেখিলে ভুবন মোহিত হয়। এইরূপে নিশি যখন দ্বিপ্রহর হইল তখন নানা উপায়ে প্রভুকে শয়ন করাইয়া রামরায় বাড়ী গমন করিলেন, আর স্বরূপ তাঁহার নিকটে তাঁহার আপন ঘরে শয়ন করিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

নায়ক বর্ণনা।

পূর্ব্বরাগ-রসাস্বাদন করা সকলের পক্ষেই সম্ভব। এমন কি জীবনে কোন না কোন এক সময়ে জীব মাত্রই এই রস কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়েন। মিলন-সুখ-রসাস্বাদন করাও অনেকের পক্ষে সম্ভব, কিন্তু কৃষ্ণ-বিরহ-রসাস্বাদন করা, যাহা জীবের পক্ষে সর্ব্বপ্রধান ভজন, তাহা মনুষ্যের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। অন্ততঃ এক প্রভুই এই রসাস্বাদন করিয়াছেন দেখা যায়। আর কেহ যে করিতে পারিয়াছেন তাহা জানা যায় না! প্রভু এই কৃষ্ণ-বিরহ সর্ব্বাপেক্ষা দুরারাধ্য ও কুটীল গতি বলিয়া প্রায় ইহাতে দ্বাদশ বৎসর নিমগ্ন ছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহার গম্ভীরা লীলা বলিতে কৃষ্ণ-বিরহ-বেদনা নানা প্রকারে প্রকাশ করা।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে নায়ক বহু প্রকারে আছে, কিন্তু সে সম্প্রদায়ের সহিত আমাদের প্রয়োজন অতি অল্প, আমাদের কার্য্য ব্রজের

কিছুকাল পরে সান্ত্বনা লাভ করিবে, করিয়া সহজ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। প্রভুর এই যে "আমার কৃষ্ণ কোথা," এই অন্বেষণে চিরজীবন গিয়াছে, আর যত অন্বেষণ করিয়াছেন, তত এই তল্লাসস্পৃহা বাড়িয়া গিয়াছে। ইহাকে বলে কৃষ্ণপ্রেম। প্রভু যেরূপ কৃষ্ণপ্রেম দেখাইয়াছেন, এমন প্রেম কেহ কোন কালে কাহারও নিমিত্ত দেখাইতে পারেন নাই। স্ত্রী স্বামীর নিমিত্ত নয়, জননী পুত্রের নিমিত্ত নয়। কোন কবি এরূপ প্রেম কল্পনা করিতেও শক্ত হন নাই।

উপরে দেখিবেন, নরহরির পদে, ভিতে মুখ ও শির ঘসার কথা আছে। এই শির ঘসা লীলা ভক্তগণ ভাল বাসেন না। তাঁহাদের ইচ্ছা এই যে প্রভু এ লীলা না করিলে পারিতেন। এ লীলার কিরূপে সৃষ্টি হয় শ্রবণ করুন। স্বরূপ একদিন প্রাতে দেখেন যে, প্রভুর নাসিকা ক্ষত হইয়া রক্ত পড়িতেছে। তখন ব্যথিত হইয়া প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি? ইহা কিরূপে হইল? প্রভু একটু লজ্জিত হইলেন। স্বরূপের ভাব দেখিয়া ভয়ও পাইলেন। বলিলেন, উদ্বেগে গৃহের বাহিরে যাইতে চেষ্টা করি, কিন্তু পারি না, দ্বার তল্লাস করিয়া বেড়াই, ঘোর অন্ধকার দ্বার পাই না, তাই নাসিকাতে আঘাত লাগিয়া ক্ষত হইয়াছে।

কথা এই, প্রভু কৃষ্ণবিরহে জর জর। তিনি স্থির থাকিতে পারিতেছেন না। ঘরের মধ্যে অস্থির হইয়া বেড়াইতেছেন। কোথা যাবেন, কি করিবেন, কোথা যাইয়া বিরহ যন্ত্রনা থেকে শান্তি পাইবেন, এই তখনকার চেষ্টা ও মনেরভাব। চরিতামৃত বলেন :—

এইমত অদ্ভুত ভাব শরীরে প্রকাশ।
মনেতে শূণ্যতা বাক্য হা হা হুতাস ॥
কাঁহা করো কাঁহা পাঙ ব্রজেন্দ্র নন্দন।
কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলী বদন ॥

কাহারে কহিব কথা কেবা জানে দুঃখ।
ব্রজেন্দ্র নন্দন বিনা ফাটে মোর বুক॥

এই গেল প্রভুর সহজ অবস্থার কথা। দিবানিশি হা হুতাস, দিবানিশি অস্থির, শান্তিহীন। রাত্রিতে তাঁহাকে শয়ন করাইয়া ভক্তগণ নিজ নিজ স্থানে গিয়াছেন। ভক্তগণ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গমন করিলে, হঠাৎ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, অমনি কৃষ্ণ বিরহ জ্বলিয়া উঠিয়াছে, অমনি উঠিয়া বসিয়াছেন, ইচ্ছা হয়েছে বাহিরে গমন করেন। সেই চেষ্টা করিতেছেন, দ্বার পাইতেছেন না, নাসিকায় আঘাত লাগিয়া ক্ষত হইয়াছে।

এখন অগ্রে বিচার করুন, প্রভুর যে কৃষ্ণবিরহ ইহা কি সত্য না কাল্পনিক? যদি কৃষ্ণবিরহ তাঁহার প্রকৃত না হইয়া অভিনয় হইত, তবে নাসিকায় আঘাত লাগিত না। যেরূপ, কোন রঙ্গভূমিতে প্রভু সাজিয়া, কৃষ্ণবিরহ দেখাইবার নিমিত্ত যদি কেহ ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইত, তবে তাহার নাসিকায় কখন আঘাত লাগিত না। কিন্তু যদি সত্য কৃষ্ণবিরহ হয়, তবে ত নাসিকায় আঘাত লাগিবারই কথা, আঘাত না লাগাই আশ্চর্য্য। কথা এই, প্রভুর নাসিকায় যে আঘাত ইহাই অব্যর্থ প্রমাণ যে, প্রভুর কৃষ্ণবিরহ সত্য, কাল্পনিক নয়, আর এই আঘাত একটি পরিমাপক যন্ত্রের কার্য্য করিতেছে, অর্থাৎ প্রভুর কৃষ্ণবিরহ কতখানি, এই ক্ষত দ্বারা তাহার কতক পরিমাণ পাওয়া যাইতেছে।

যখন সরূপ নাসিকা ক্ষত হইবার কারণ শুনিলেন, তখন উপায় স্থির করিলেন। সেই অবধি প্রভুকে আর একাকী শয়ন করিতে দেওয়া হইত না। প্রভুর পদতলে শঙ্কর সেই গম্ভীরায় শয়ন করিতেন। প্রভু একখানি পাথরে শয়ন করিতেন। আর শঙ্কর প্রভুর পদ দুখানি আপনার হৃদয়ে রাখিয়া নিদ্রা যাইতেন। সেই শঙ্করের একটি পদ শ্রবণ করুন। *

---

* কৃষ্ণবিরহে প্রভুর কিরূপ অবস্থা হয়েছিল, তাহা এই ভক্তগণ, যাঁহারা দিবানিশি সঙ্গে থাকিতেন, তাঁহাদের দ্বারা জানা যায়।

সে যে মোর গৌরকিশোর।
মুরছি মুরছি পড়ে ভকতের কোর॥
সোণার বরণ তনু হইল মলিন।
দেখিয়া ভকতগণের প্রাণ হয় ক্ষীণ॥
বচন না নিঃসরে সে চাঁদ বদনে।
অবিরল ধারা বহে অরুণ নয়নে॥
কান্দে সহচরগণ গৌরাঙ্গ বেড়িয়া।
পাষাণ শঙ্কর দাস না যায় মরিয়া॥

একাদশ অধ্যায়।

গম্ভীরা লীলার পূর্ব্বাভাস।

রজনী জাগিয়া গোরা থাকে।
হা নাথ হা নাথ বলিয়া ডাকে॥
প্রভাতে উঠিয়া গোরা রায়।
চঞ্চল লোচনে সদা চায়॥
নমিত বদনে মহী লিখে।
আঁখি জলে কিছু না দেখে॥
লোচন বলে এই রস গূঢ়।
বুঝয়ে রসিক না বুঝয়ে মূঢ়॥

রথোপলক্ষে যখন নদীয়ার ভক্তগণ আইসেন, তখন প্রভু একটু সম্পূর্ণ রূপে চেতন থাকেন। তাঁহারা প্রত্যাগমন করিলে আবার বিহ্বল হয়েন। এই অবস্থা ক্রমে বাড়িতে লাগিল। দিনের বেলা যে চেতনা টুকু থাকে, সন্ধ্যা হইলে সে টুকু যায়। সন্ধ্যার বিহ্বলতা, রজনী বৃদ্ধির সহিত ক্রমে বাড়িতে থাকে। সরূপ ও রামরায় প্রত্যহ ভাবেন যে, অদ্য রাত্রি কি করিয়া কাটাইবেন। গম্ভীরায় প্রভু না জানি কি হৃদবিদারক লীলা করেন। উভয়ের, বিশেষতঃ সরূপের, চেষ্টা এই যে, প্রভুকে সচেতন রাখিবেন, নানা কথা বলিয়া প্রভুকে ভুলাইতেছেন। প্রভু উপরোধে দুই এক কথার উত্তর দিতেছেন। কিন্তু প্রাণ মন শ্রীকৃষ্ণে। বৈকাল হয়েছে, প্রভু ক্রমে বিহ্বল হইতেছেন। আর সরূপ কি রাম রায় নানা উপায়ে প্রভুকে অচেতন হইতে দিতেছেন না। যাহারা আহিফেণ সেবনে প্রাণে মরে, তাহাদিগকে বাচাইবার এক উপায় এই যে, তাহাদিগকে অচেতন হইতে না দেওয়া।

তাই রোগী শুইতে চায়, কিন্তু শুইতে দেয় না, বসিতে দেয় না, হাটাইয়া লইয়া বেড়ায়। ইত্যাদি ইত্যাদি নানা উপায়ে তাহাকে চেতন রাখিবার চেষ্টা করে।

সরূপ ও রাম রায় প্রভু সম্বন্ধে তাহাই করিতেছেন। প্রভুর যে কথায় রুচি আছে তাহাই মনে করিয়া দিয়া, অনমনা করিতে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে ভুলাইতে চেষ্টা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রভুর হৃদয়ে প্রবেশ করিতেছেন, আর প্রভুর বাহ্য জগতের সহিত সম্বন্ধ যাইতেছে। সরূপ, যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ হৃদয়ে প্রবেশ করিতে না পারেন, তাহার চেষ্টা করিতেছেন। এইরূপ চেষ্টা করিয়া কিছু কাল প্রভুকে সচেতন রাখিলেন। কিন্তু সে কেবল কিছু কালের নিমিত্ত। পরিশেষে না পারিয়া ক্ষান্ত দিলেন, প্রভু একবারে বিহ্বল হইলেন।

আবার যখন প্রভু বিহ্বল হইলেন, তখন তাঁহাদের চেষ্টা যে প্রভুর হৃদয়ে দুখ রস আসিতে দিবেন না, যাহাতে আনন্দ রস আইসে তাহার নানা উপায় করেন।

প্রভুর বিহ্বলতা কিরূপ, বলিতেছি। সরূপকে ভাবিতেছেন সখি ললিতা, আপনাকে ভাবিতেছেন রাধা, সম্মুখে একটি বৃক্ষ দেখিয়া ভাবিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া আছেন ইত্যাদি।

পূর্ব্বে বলিয়াছি এই লীলা অতি গোপনে হয়। সুতরাং উহার বিবরণ সংগ্রহ করা বড় কঠিন। তবু ইহা বিবরিয়া লিখিতে আমাদের তত কঠিন বোধ হইতেছে না। কারণ, অনেক প্রভুর সঙ্গী, মহাজনগণের পদে সাহায্য পাইতেছি। সরূপের কড়চায় সাহায্য পাইতেছি। রঘুনাথ দাসের বর্ণনা হইতে কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার গ্রন্থ অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তাহা পাইতেছি। চরিতামৃত এই কড়চার কথা এইরূপ বলিতেছেন—

সরূপ গোসাঞি মত, রঘুনাথ জানে যত,
তাহা লিখি নাহি মোর দোষ।

আমারও সেই কথা, এই ভুবনপাবন ভক্তগণের পদধূলি মস্তকে দিয়া লিখিতেছি, আমার কোন দোষ নাই। আর এক কথা জানিবেন, ঐকান্তিক চেষ্টা থাকিলে প্রভুর কৃপায় তাহার হৃদয়ে নানা গূঢ় কথা স্ফূর্ত্তি হয়।

যখন প্রভু একবারে অচেতন হইলেন তখন তাঁহাকে ধরিয়া গম্ভীরা ভিতরে অর্থাৎ কুটিরের অন্তঃপ্রকোষ্ঠে লইয়া যাওয়া হইল। অতি মলিন আসনে প্রভুকে বসাইলেন। সম্মুখে স্বরূপ, রামরায় বসিলেন। প্রদীপ টিপ টিপ করিয়া জ্বলিতেছে। প্রভু এই প্রদীপের সাহায্যে স্বরূপের ও রাম রায়ের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছেন। যেন চেন চেন করেন, চিনিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা প্রভুর মুখ দেখিয়া বুঝিতেছেন যে প্রভুর বাহ্য জগতের সহিত সম্বন্ধ একবারে গিয়াছে, প্রভুর হৃদয়ে বিরহ বেদনা সর্ব্বদা জাগরূক, আর সর্ব্বদা তাহাই আলোচনা করেন। কিন্তু প্রভু সেই ভাবের কথা বলিতে গেলেই, স্বরূপ ও রামরায় সে ভাব ফিরাইবার চেষ্টা করেন। কিরূপে বলিতেছি। প্রভু ধীরে ধীরে আপন মনে বলিতেছেন, তাঁহার সম্মুখে যে দুইজন বসিয়া আছেন, তখন তিনি আর তাঁহাদের দেখিতে পাইতেছেন না, যেন আপন মনে, বলিতেছেন, "ছি, ছি, এমন পিরীত কি কেহ কখন করে? আমি যমুনায় ঝাঁপ দিয়া ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিব। হায়! হায়! আমি অবলা এত কি জানি!" এই "প্রলাপ" বাক্য শুনিবা মাত্র স্বরূপ বুঝিলেন যে, প্রভুকে বিরহ যন্ত্রণা ধরিতেছে। তাই হৃদয়ে সেই রস না আসিতে পারে ও প্রভুর মন হইতে দুঃখ রস নিঙ্গাড়িত করিবার নিমিত্ত পূর্ব্ব রাগের গীত ধরিলেন। স্বরূপের ন্যায় গায়ক জগতে কাহার হইবার সম্ভাবনা ছিল না। কারণ, প্রভু গোলক হইতে যে "অনর্পিত" ভাব আনিয়াছেন, তাহা তিনি সঙ্গীত দ্বারা ব্যক্ত করিতেন। আর সেই হইতেই আমাদের অপূর্ব্ব কীর্ত্তন সৃষ্টি হইয়াছে। স্বরূপ পূর্ব্ব রাগের গীত ধরিলেন। তাহাতে শ্রীমতী রাধা কিরূপে প্রথমে প্রেম ডোরে

আবদ্ধ হয়েন তাহা বর্ণিত আছে। মনে থাকে যেন, বিরহে দুঃখ, মিলনে সুখ, কিন্তু পূর্ব্বরাগে, মিলন সুখ হইতে অধিক আনন্দ। সরূপ পূর্ব্বরাগের গীত আরম্ভ করিলেন। যথা পদ :—

আমি কি হেরিলাম নীপ মূলে।
আমার মন প্রাণ কাড়ি নিলে গো॥
হিয়ায় আমার রূপ জাগে।
সংসারে না মন লাগে গো॥

এই গীত শুনিবা মাত্র প্রভু অমনি চুপ করিয়া শুনিতে লাগিলেন। শুনিতে শুনিতে মনের ভাব ফিরিতে লাগিল। না পরে পূর্ব্ব রাগে বিভাবিত হইয়া তাঁহার বদন প্রফুল্ল হইল। গান রাখিয়া তখন সরূপ প্রভুকে জিজ্ঞাসিতেছেন, বলিতেছেন, তোমার যে প্রীতি ইহা কিরূপে হইল, বল দেখি? উদ্দেশ্য এই যে, প্রভুকে উত্তপ্ত বিরহ বালুকা হইতে শীতল পূর্ব্বরাগ রূপ সরোবরে লইয়া যাইবেন।

অমনি প্রভু বলিতেছেন, আহা, কি সুখের দিন, আর কি সে দিন আসিবে! আমি জল আনিতে যমুনায় যাইতেছি, তাকি জানি, যে আমার সম্মুখে এত ঘোর বিপদ? দেখি কি যে একজন পরম সুন্দর পুরুষ কদম্ব তলায় দাঁড়াইয়া। বলিতে বলিতে প্রভুর হৃদয়ে অমনি কৃষ্ণের রূপ স্ফূর্ত্তি হওয়ায় তাঁহার বদন আনন্দে ডগ মগ করিতে লাগিল। সুযোগ বুঝিয়া সরূপ প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাঁহার কি প্রকার রূপ ভাল করিয়া বল। তখন প্রভুর সহস্র জিহ্বা হইল। কৃষ্ণের আপাদমস্তক বর্ণন করিতে লাগিলেন। আর ঝলকে ঝলকে আনন্দ উদগীরণ করিতে লাগিলেন। তখন আনন্দে তিন জন ভাসিয়া চলিলেন। সরূপ রামরায় ভাবিলেন যে, সে প্রভুকে এ রজনী বিরহ যন্ত্রণা হইতে বাঁচাইয়াছেন! প্রভু রূপ বর্ণনা করিতেছেন, নয়নে আনন্দধারা পড়িতেছে, মুখে এরূপ

মনে ভাবুন, শ্রীভগবানের গলে মুণ্ডমালা, শিরোভূষণ সর্প ইত্যাদি। বিভৎসরস শ্রীভগবানের ভজনায় কি রূপে প্রবেশ করিল বলিতে পারি না। বিভৎস কি রৌদ্ররস দ্বারা যে শ্রীভগবানের ভজনা হইতে পারে ইহা আপাততঃ মনে ধরে না। কিন্তু আমরা চক্ষে দেখিতেছি, ভগবানের গলায় মুণ্ডমালা, গাত্রে মনুষ্যরক্ত ইত্যাদি। তবে বিভৎসরস দ্বারা প্রকৃত ভজনা হয় না সে ঠিক। যাঁহারা এইরূপ ভজনা করেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য শ্রীভগবান-প্রেমাহরণ নয়, শক্তি কি সিদ্ধিলাভ করা। বোধ হয় সেই নিমিত্ত তাঁহাদের ভদ্র কি অভদ্র রস বিচারের প্রয়োজন হয় নাই।

ফলে এ প্রস্তাব বাড়াইবার আর আমাদের ইচ্ছা নাই। রসশাস্ত্রের মর্ম্ম আমরা ভাসা কথায় প্রকাশ করিতেছি। যাঁহারা ইচ্ছা করেন শ্রীরূপ গোস্বামীর উজ্জ্বল নীলমণি পড়িতে পারেন। আমাদের উদ্দেশ্য এই যে, প্রভু গম্ভীরা-লীলায় যে সমুদায় রসের চর্চ্চা করেন, তাঁহারই আলোচনা করি। এখানে মাথুরের পালা দিব, যাহার দ্বারা অনেকগুলি রসের মর্ম্ম প্রকাশ পাইবে।

ভক্তগণের ভজন সুবিধার নিমিত্ত কৃষ্ণলীলা দ্বারা অনেকটি পালা বিভক্ত হইয়াছে। যথা—পূর্ব্বরাগ, মিলন, মান, মাথুর, নৌকাখণ্ড, দানখণ্ড। এই সমুদয় প্রভু আপনি আচরিয়া জীবকে দেখাইয়াছেন। কতক নদীয়ায়, কতক নীলাচলে ও কতক গম্ভীরায়। নদীয়ার মাথুর, দান ও নৌকাখণ্ড, নীলাচলে রাস ও নন্দোৎসব, ও গম্ভীরায় প্রধানতঃ শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ ও মান। দানখণ্ড চন্দ্রশেখরের বাড়ী কৃষ্ণযাত্রার দিবস দেখান হয়। নৌকাখণ্ড তাহার পরে ও মাথুর সন্ন্যাসের কিছু পূর্ব্বে আপনার বাড়ীতে। নীলাচলে যে রাস রস প্রকাশ করেন, তাহা পাঠক পূর্ব্বে অবগত হইয়াছেন। তবে এ সমুদায় আবার গম্ভীরায় আরো পরিষ্কার করিয়া দেখাইয়াছিলেন।

মূর্চ্ছায় অভিভূত হইয়া লম্বা হইয়া পড়িয়া গেলেন। দেবচক্ষু হইয়াছে, নয়নতারা উর্দ্ধে উঠিয়াছে, নিশ্বাস প্রশ্বাস একপ্রকার নাই, হৃদয়ে স্পন্দন নাই, মুখ দিয়া ফেণ বহিয়া পড়িতেছে, আর কণ্ঠে ঘরঘর শব্দ হইতেছে। বাসুদেব বলিতেছেন, সে দৃশ্য দেখিয়া সকলের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। হইবার কথা বটে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে কৃষ্ণপ্রেম কাহাকে বলে, তাহা আমাদের প্রভু জগতে দেখাইয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ উপরে ঐ চিত্রটি দেখাইলাম।

বিবেচনা করুন যাঁহার ভগবানে এত প্রেম, ভগবান যদি নিতান্ত নিষ্ঠুর না হয়েন, তবে তিনি এরূপ ভক্তের অনুগত হইবেন। এইরূপ আর একটি লীলার আভাস পূর্ব্বে বলিয়াছি, অদ্য বিবরিয়া বলিতেছি। রঘুনাথ দাস গোস্বামী তাঁহার স্তবাবলীতে এই লীলাটি এইরূপ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। একদিন প্রভু মন্দিরে দর্শনে গিয়াছেন। দ্বারি আসিয়া প্রভুর চরণ বন্দনা করিল। অমনি প্রভু তাহাকে বলিতেছেন, "হে সখে, আমার প্রাণকান্ত কৃষ্ণ কোথা, তাঁহাকে আমায় শীঘ্র দেখাও।" উন্মাদের ন্যায় এইরূপ বলিলে, সরস্বতী, মূর্খ দ্বারীর হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে এইরূপ বলাইলেন, যথা :—প্রভু আপনি আসুন, আপনার প্রিয়তমকে শীঘ্র দর্শন করাইতেছি। দ্বারী ইহা বলিলে, প্রভু অমনি তাহার হাত ধরিলেন, ধরিয়া বলিলেন, তবে চল আমাকে লইয়া তাঁহাকে দেখাও। দ্বারী তাঁহাকে জগন্নাথের সম্মুখে লইয়া চলিল, যাইয়া বলিল, ঐ দেখুন আপনার প্রাণকান্ত।

পুত্র যাহার প্রাণ, এরূপ জননী, তাহার সেই পুত্র জীবন ত্যাগ করিলে ক্ষণকালের নিমিত্ত উন্মাদ হইতে পারে, এমন কি তাহার এমন ভ্রমও হইতে পারে যে, নিকটস্থ কাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে যে, আমার সেই অমুক কোথা, তাহাকে দেখেছ? এমন শোকাকুলি জননীও শোকের

এখন মাথুরের পালা একবার আলোচনা করুন। শ্রীনবদ্বীপে প্রভু মাথুরের পালা আরম্ভ করেন, তাহার পদ শ্রবণ করুন :—

অক্রূর অক্রূর বলি পুন পুন ধাবই
ভাবই পূরব পিরীত।
কাঁহা মোর প্রাণনাথ, লই যাও হে
ডারি মোরে শোকের কূপে।
কো পুন বারণ, বোলে নাহি ঐ ছন
সব জন রহল নিচুপে॥ ইত্যাদি

অর্থাৎ প্রভু অক্রূর এসেছেন বলিয়া কান্দিয়া আকুল। বলিতেছেন, "হে অক্রূর, আমার প্রাণনাথকে কোথায় লইয়া যাও আমাকে শোকে ডুবাইয়া?" আবার সঙ্গিগণকে বলিতেছেন, "তোমরা যে চুপ করে রইলে, কথা কও না, কৃষ্ণকে যে নিয়া গেল দেখছ না?" ইত্যাদি।

এইরূপ নৌকাখণ্ডের ও দানখণ্ডের পদ দ্বারা জানা যায় প্রভু ঐ সমুদায় কিরূপে প্রকাশ করেন। রাখালরাজ মথুরার রাজা হইয়াছেন, সেখানে তাঁহার নিকট ব্রজের গোপীগণ গিয়াছেন। দেখেন, কৃষ্ণ রাজা হইয়া বসিয়া আছেন। গোপীগণ বলিতেছেন, যথা গীত :—

রাজসেবা বাস ভাল ব্রজ ভাল লাগে না।
(আমরা) অবোধিনী গোয়ালিনী ভজন সাধন
(শ্লোক শাস্ত্র) (তন্ত্র মন্ত্র) জানি না।

অর্থাৎ হে ভগবান, তুমি কি রাজসেবা ভালবাস, তাহা যদি হয়, আমাদের উপায় কি? আমরা মূর্খ, কাঙ্গাল, আমরা রাজসেবা কোথা পাব? আমরা বক্তৃতা দ্বারা, কি শ্লোক দ্বারা, কি রাজভোগ অর্থাৎ ভাল বসনভূষণ দ্বারা কিরূপে তোমার সেবা করিব? পরে শুনুন :—

শঠ নায়ক।

শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রেয়সী রাধা। কারণ তাহার যে প্রেম তাহাতে মলিনতা নাই, তাহার প্রেমে শ্রীভগবান্ স্বয়ং পাগল। মনে ভাবুন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর কুঞ্জে চলিয়াছেন। পথে চন্দ্রাবলী ধরিলেন। কোথা যাও? আমার কুঞ্জে আইস বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে টানিয়া লইয়া চলিলেন। তাহার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত কৃষ্ণ কত প্রকার চাতুরী করিলেন, কিন্তু পারিলেন না, চন্দ্রাবলী ধরিয়া নিজ কুঞ্জে লইয়া চলিলে। তখন শ্রীকৃষ্ণ করেন কি, বলিতেছেন, তুমি আমাকে জোর করিয়া লইয়া যাইতেছ কেন? তোমার ন্যায় প্রেয়সী আমার কে আছে বল? আর যত দেখ তাহাদের সকলের সহিত যে প্রণয় সে বাহ্য। তোমার প্রতি আমার যে প্রেম তাহার তুলনা নাই। শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর মনস্তুষ্টির নিমিত্ত এই সমুদায় কথা বলিতেছেন, অনেক চেষ্টা করিয়া মুখে আনন্দ দেখাইতেছেন। কিন্তু প্রকৃত কথা, নাগর একবারে মর্ম্মাহত হইয়াছেন। ইচ্ছা ছিল যে শ্রীমতীর বিশুদ্ধ প্রেম-সুধা ভোগ করিবেন, আর সেই আনন্দে যাইতেছিলেন। কিন্তু তাহাতে ব্যাঘাত ঘটিল। তবু চন্দ্রাবলীর হৃদয়ে পাছে ব্যথা লাগে বলিয়া চাটুবাক্যে তাহার মনস্তুষ্টি করিতেছেন। এইরূপ যিনি নাগর তিনি "শঠ"। তাঁহার পরে :—

ধৃষ্ট নাগর।

ইনি অন্য রমণীর কুঞ্জে নিশি যাপন করিয়াছেন, পরে প্রেয়সীর নিকট গমন করিয়াছেন। সেখানে যাইয়া, তিনি যে অন্য রমণীর সহিত নিশি যাপন করিয়াছেন এ কথা একবারে গোপন করিতেছেন। কিন্তু গণ্ডদেশে তাম্বুলের চিহ্ন রহিয়াছে, সুতরাং ধরা পড়িয়াছেন। কিন্তু যদিও হাতে হাতে ধরা পড়িয়াছেন, তবু ছল করিতে ছাড়িতেছেন না। আপনার দোষ কোন ক্রমে স্বীকার করিবেন না, ইনি ধৃষ্ট।

কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন নায়কের ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র বর্ণনা না করিয়া তাহাদের ভজন কিরূপ তাহা বলিলে একরূপ আমার কার্য্য বেশ সিদ্ধি হইবে। যাঁহাদের নিকট এ সমুদায় কথা একবারে নূতন, তাঁহাদের স্মরণ করাইয়া দিই যে, এক শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ, আর জীব মাত্রেই প্রকৃতি। কাজেই কৃষ্ণ বহুবল্লভ অর্থাৎ বহু নায়িকার বল্লভ। গোপী অনুগা ভজনে আমরা কেহ প্রধান নহি, আমরা কেবল যোজকতা করি। যদি কৃষ্ণ শঠ বলিয়া বিদ্রূপিত হয়েন, সে আমাদের দ্বারা নয়, সে গোপীগণ দ্বারা। আর কৃষ্ণের প্রেয়সী যাঁহারা, তাঁহাদের পক্ষে তাঁহাকে শঠ বলা অস্বাভাবিক নয়। সম্রাটের যিনি প্রেয়সী তিনি তাঁহার কান্তকে অবশ্য তিরস্কার করিবার অধিকার রাখেন।

আর এক কথা স্মরণ করাইয়া দিই। শ্রীভগবানে দুই ভাব আছে, ভগবত্ত্ব আর মনুষ্যত্ব। মনুষ্যের তাঁহার সহিত সঙ্গ করিতে হইলে তাঁহাকে বিশুদ্ধ মনুষ্য হইতে হইবে। তাঁহার যে পরিমাণে ভগবত্ত্ব থাকিবে, সেই পরিমাণে তিনি মনুষ্যের আয়ত্বের অতীত হইবেন। যে পরিমাণে তিনি মনুষ্য ভাব গ্রহণ করিবেন, সেই পরিমাণে তিনি মাধুর্য্যময় হইবেন।

মায়াতীত জ্ঞানাতীত হয়ে বসে রবে।
কেমনেতে বলরাম তোমা লাগ পাবে॥

শ্রীভগবান্ জ্ঞানময় ভ্রমপ্রমাদশূন্য, কিন্তু এরূপ ভগবানের সহিত মনুষ্য ইষ্টগোষ্ঠী করিতে পারে না। এরূপ ভগবানে এক বিন্দু রস থাকিবে না, তিনি শুষ্ক কাষ্ঠ। যিনি জ্ঞানাতীত মায়াতীত ভগবান্, তাঁহার হাসি অস্বাভাবিক, ক্রন্দন অস্বাভাবিক, রসিকতা অস্বাভাবিক, তাঁহাকে আদৌ ভজনা চলে না। তাঁহাকে নাগররূপে ভজনা করিতে হইলে তাঁহাকে ঠিক মনুষ্যের ন্যায় নাগর হইতে হইবে। অতএব যেমন মনুষ্যের মধ্যে নাগর ভেদ, তেমনি কৃষ্ণের মধ্যে নাগর ভেদ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

শেষ দ্বাদশ বৎসর।

শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিরহ স্মৃতি হয় নিরন্তর॥
শ্রীরাধিকার চেষ্টা যৈছে উদ্ধব দর্শনে।
এই মত দশা প্রভুর হয় রাতি দিনে॥
নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ-উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ॥
রোম কূপে রক্তোদ্গম দন্ত সব হালে।
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয় ক্ষণে অঙ্গ হালে॥

চরিতামৃত।

গম্ভীরায় অদ্য প্রভুর এইরূপ অবস্থা যে আপনাকে ভুলিয়া গিয়াছেন, অথচ তিনি যে কে তাহাও ঠিক করিতে পারিতেছেন না। তবে দাস্যভাবে অভিভূত হইয়াছেন। দৈন্যতার খনি। মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া একটি শ্লোক পড়িলেন, সেটি তাঁহার নিজের যথা :—

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-
স্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয়॥

প্রভু বলিতেছেন, আহা! আমি ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্য অনুভূত করিতে

পারি না, সেই ভাগ্য কি না আমি শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের ধূলার সমান হইয়া তাঁহার পদ সেবা করিব। তখন অশ্রুপূর্ণ নয়নে স্বরূপ ও রাম রায়ের পানে চাহিয়া বলিতেছেন, রামরায়! স্বরূপ! জগতে কত জনে কত প্রার্থনা করে, কেহ ধন চায়, কেহ কবিত্ব চায়, কেহ সুন্দরী ভার্য্যা চায়, আমি সরল মনে বলিতেছি আমার এ সমুদায় বিষয়ে কিছু মাত্র লোভ নাই। তবে আমি চাই কি শুনিবে? ইহা বলিয়া নিজ কৃত আর একটি শ্লোক পড়িলেন। যথা:—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥

হে জগদীশ্বর! আমাকে তোমার অহেতুকী ভক্তি দাও।

রামরায়! ভক্তি তত দুর্ল্লভ নয়, কিন্তু অহেতুকী ভক্তি অতি দুর্ল্লভ! জগতে কি উহা আছে? হে নাথ! সে ভাগ্য কবে হবে? কবে তোমাতে আমার স্বার্থ শূন্য ভক্তি হবে? কবে (এটিও তাঁহার নিজকৃত শ্লোক):—

নয়নং গলদশ্রুধারয়া, বদনং গদ্‌গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈ র্নিচিতং বপুঃ কদা, তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥

হে নাথ! কবে তোমার নাম শ্রবণ করিবা মাত্র আমি বিগলিত হইব—ইহা বলিতে বলিতে কান্দিয়া আকুল হইলেন,—একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিতেছেন। কি আশ্চর্য্য! নাথ! তোমাকে বঞ্চনা করিতে চেষ্টা বিফল, কারণ তুমি অন্তর্যামী। এই আমি ক্রন্দন করিতেছি সত্য, কিন্তু কেন? রাম রায়! আমি যে ক্রন্দন করিতেছি, ইহা কি কৃষ্ণের নিমিত্ত, না আমার কোন স্বার্থ সাধনের নিমিত্ত? কৃষ্ণের নিমিত্ত একটুও নয়, শুধু আমার নিমিত্ত। আমি ক্রন্দন করিতেছি, কেননা আমি ভক্তি হইতে বঞ্চিত। অতএব আমি

আমার দুঃখের নিমিত্ত কান্দিতেছি, ইহাতে কৃষ্ণের গন্ধ নাই, সবই আমি, এই আমি আমি করিয়া আমার জীবন বিফলে গেল!

ইহা বলিতে বলিতে কৃষ্ণপ্রেম স্ফূর্ত্তি হইল। তখন পূর্ব্বে যে সমুদায় কথা বলিয়াছেন, তাহা একবারে ভুলিয়া এই নিজকৃত শ্লোক পাঠ করিলেন, যথা :—

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে।

তখন অতি কাতর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট "আমাকে দর্শন দাও, দর্শন দাও", বলিয়া ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। আবার হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন। পূর্ব্বে বিচার করিয়াছিলেন যে তিনি যে রোদন করিয়াছিলেন, সে কৃষ্ণের নিমিত্ত নহে, আপনার নিমিত্ত। এখন সেই ভাব আবার মনে উদয় হইল। তখন আর একটি অপরূপ শ্লোক পড়িলেন। যথা :—

ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ।
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্।
বংশী বিলাস্যাননলোকনং বিনা।
বিভর্ম্মি যৎপ্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা।

প্রভুর এ পর্য্যন্ত বরাবর অর্দ্ধ বাহ্যদশা রহিয়াছে, ঠিক সহজ জ্ঞান হইতেছে না, হইবার সম্ভবও নাই, তবে সম্পূর্ণ বিহ্বল ভাবও নয়। শ্লোক পড়িয়া বলিতেছেন—

সরূপ রামরায়, তোমরা মনে করিতে পারো যে, আমার কৃষ্ণপ্রেম আছে, কারণ তোমরা দেখিতেছ, আমি "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" বলিয়া রোদন করিতেছি, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমাতে কৃষ্ণপ্রেম নাই। কৃষ্ণপ্রেম যদি থাকিত, তবে আমি পতঙ্গের ন্যায় পুড়িয়া মরিয়া যাই না কেন? যেহেতু কৃষ্ণের বংশীবদন আমি দেখিতেছি না, কৃষ্ণকে আমি দেখিতেছি

না, অথচ মরিতেছি না। ইহাতেই স্পষ্ট প্রমাণ যে আমার কৃষ্ণপ্রেমের গন্ধ মাত্র নাই। শ্রীভাগবত ইহার সাক্ষী দিতেছেন। যথা :—

কৈঅবরহিঅং পেম্মংণহি হোই মানুষে লোএ।
জোই হোই কস্‌স বিরহো ন বিরহে হোণ্ডম্মি নকো জিঅই॥

মনুষ্যের এরূপ প্রেম হয় না, যাহাতে প্রতিদানের ইচ্ছা শূন্য। একবারে বিশুদ্ধ অকৈতব প্রেম, যাহা একবারে কিছুমাত্র প্রার্থনা করে না, তাহা হইতে পারে না। আর যদি বড় ভাগ্য বলে কখন হয়, তবে তাহা হইলে তাঁহার আর কৃষ্ণ-বিরহ হইতে পারে না। কৃষ্ণ এমন অনুগত জনকে কখন ত্যাগ করেন না, আর যদি কোন কারণে ত্যাগ করেন, তবে সে ব্যক্তি তদ্দণ্ডে মরিয়া যায়। অতএব সরূপ! রামরায়! আমাতে কৃষ্ণ-প্রেম নাই, যদি আমার প্রেম থাকিত, তবে কৃষ্ণ আমার নিকট থাকিতেন। আর যদিও কোন কারণে আমার প্রেম সত্তে কৃষ্ণ আমাকে ত্যাগ করিতেন, তবে আমি তদ্দণ্ডে পতঙ্গের ন্যায় পুড়িয়া মরিতাম। কই আমি-ত মরিতেছি না?

"তবে আমার চক্ষের জল দেখিতেছ বটে, উহা দেখিয়া তোমরা ভুলিও না। এ চক্ষের জল কৃষ্ণ-বিরহের নিমিত্ত নয়, কারণ তাহা হইলে মরিয়া যাইতাম। এ চক্ষের জল লোককে কেবল আপনার সৌভাগ্য দেখাইবার জন্য, যে আমি খুব ভাগ্যবান আমাতে কৃষ্ণ-প্রেম আছে।

ইহা বলিয়া অতি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে বলিলেন—"এই আমি কৃষ্ণের সহিত সর্ব্বদা কপটতা করিতেছি। অথচ কৃষ্ণ যদি আমাকে কৃপা না করেন, তবে তাঁহার প্রতি দোষারোপ করি।"

প্রভুর এ কথাগুলি দ্বারা বুঝা যায় যে, শ্রীভগবানে প্রীতি কি, এবং তাঁহার ভজন জীবের পক্ষে কতদূর কঠিন ব্যাপার। অনেক কষ্টে চক্ষে দু ফোঁটা জল আহরণ করিল, আর অমনি মনে দম্ভের সৃষ্টি হইল যে আমি বড় ভক্ত হইয়াছি। তাহাতে ফল এই হইল যে, পূর্ব্বের যে ভক্তি টুকু ছিল, তাহাও

হারাইতে হইল। এ দিনকার লীলায় প্রভু ভক্তি ও প্রেমতত্ত্বের যেরূপ সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিয়া বিচার করিলেন, তাঁহাতে মনে নির্ভরসার উদয় হয়।

জীবের উপায় কি? তুমি মনে বুঝিতেছ যে, তোমার শ্রীভগবানে একটু প্রেম হইয়াছে, কারণ তাঁহার কথা তোমার নিকট মিষ্টি লাগে। আর হৃদয়মন্দিরে তাঁহার অদর্শনে তুমি ব্যথিত হইতেছ! তুমি ব্যথিত হইতেছ বলিলাম, কিন্তু ব্যথিত হইতেছ তাহার প্রমাণ নাই, বরং তোমার ব্যথা যে সামান্য তাহার প্রমাণ আছে। তুমি কৃষ্ণ বলিয়া রোদন করিতেছ সত্য, কিন্তু এ তোমার প্রেমের ক্রন্দন নয়। কারণ শাস্ত্র বলেন কৃষ্ণবিরহ হইলে জীব মরিয়া যায়। কেন? তুমি ত বেশ আছ, মরিতেছ না? তবে কান্দিতেছ বটে। কিন্তু সে কি জন্য? কৃষ্ণপ্রেমে—না প্রতিষ্ঠার লোভে? অর্থাৎ লোকে তোমাকে বড় ভক্ত বলিবে, সেই নিমিত্ত? কৃষ্ণপ্রেমের নিমিত্ত তুমি কান্দিতেছ না, কারণ তাহা হইলে তুমি বাঁচিতে না। কৃষ্ণপ্রেম-মুগ্ধ জীবে তাঁহার বিরহ সহ্য করিতে পারে না, অর্থাৎ— বিশুদ্ধ কৃষ্ণবিরহ হইলে, তিনি তদ্দণ্ডে উপস্থিত হয়েন। যখন কৃষ্ণ আইলেন না, তখন জানিও তোমার যে মনের দুঃখ উহা ঠিক কৃষ্ণপ্রেম হইতে নহে।

যখন প্রভু গম্ভীরা-লীলায় একেবারে দিব্য উন্মাদভাবে আক্রান্ত হইতেন, তখনকার তাঁহার ভাব বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। প্রভু তখন নানাভাবে বিভাবিত হইতেন। মনে ভাবুন, একখানি নৌকা স্রোতের বেগে চলিয়াছে, বায়ু তাহাকে বিপরীত দিকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে, নাবিক তাহাকে এ পারে লইবার চেষ্টা করিতেছে। এই নৌকার যেরূপ অবস্থা, প্রভুর মনের ভাব সেইরূপ।

কৃষ্ণকে আদর করিতেছেন, বলিতেছেন, "আমার চাঁদ", "আমার

নয়নানন্দ", "আমার হৃদয়ের রাজা", বলিতে বলিতে কৃষ্ণকে না দেখিতে পাইয়া একটু ক্রোধ হইয়াছে, তখন বলিতেছেন, তুমি নিষ্ঠুর, তুমি না পুরুষ? পুরুষ না চিরদিন কঠিন জাতি? তুমি প্রেমের কি জানো? কিছুই জান না, কারণ প্রেমের ব্যথা কখন ভোগ কর নাই। যে বহু নায়িকার বল্লভ, তাহার আবার প্রেম কিরূপে সম্ভবে? এরূপ নাগরের সহিত কি প্রেম করিতে আছে?

ইহা বলিতে বলিতে মনে উদয় হইল যে, কৃষ্ণকে নিন্দা করিতেছেন। ভাবিতেছেন, কি করিলাম, এমন মধু হইতে মধু যে কৃষ্ণ তাঁহার নিন্দা করিলাম? তখন কাতর ভাবে বলিতেছেন, বন্ধু! তোমার নিন্দা করি নাই, তোমার মহিমাই বর্ণনা করিয়াছি। তোমা ব্যতীত ত্রিজগতে এরূপ কে আছেন, যিনি এত নায়িকার প্রেমপিপাসা নিবৃত্তি করিতে পারেন? আমি তাই বলিতেছিলাম, তোমার নিন্দা করি নাই!

পরে সরূপ রামরায়কে বলিতেছেন, সখি! কৃষ্ণপ্রেমের সীমা নাই, ঠাই নাই, উহা অতলস্পর্শ। আমরা একজনের সহিত প্রেম করিয়া অস্থির হই, কিন্তু ইহার প্রেমের বস্তু অসংখ্যা, সকলেরই প্রতি প্রেমভাব, সকলেই তাঁহার প্রাণ, সকলেরই সহিত তাঁহার মধুর ব্যবহার, সকলেই তাঁহার ব্যবহারে কৃতার্থ। এমন নাগরকে যে ভজনা না করে তাহাকে ধিক্, শত ধিক্!

পরে আপনা আপনি বলিতেছেন, "প্রেম যেরূপ সুধাস্বরূপ, বিরহ সেইরূপ সতেজ কালকূট। কৃষ্ণের বিরহে আমার দিবানিশি যন্ত্রণা। সখী তোমরা স্বপ্নেও ভাবিও না যে, কৃষ্ণের নিমিত্ত আমি যে এত দুঃখ পাই, ইহাতে আমার মনে কিছু ক্ষোভ আছে।" ইহা বলিয়া একটি নিজ কৃত শ্লোক পড়িলেন। যথা:—

আশ্লিষ্য পাদরতাং পিনষ্টু মা
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।

নায়ক লইয়া, অর্থাৎ যিনি প্রেম বিকিকিনি করেন, প্রেম বিক্রয় করেন ও প্রেম ক্রয় করেন। আবার ইহাও বলিয়াছি যে এই ব্রজের নায়ক এক প্রকার নহেন। এইব্রজের নায়ককে নানা ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। একরূপ নায়কের ভজন অন্য নায়কের ভজন হইতে পৃথক। সুতরাং এক ব্রজের নায়কের বহু প্রকারের ভজন আছে। প্রভুর এই সমুদায় ভিন্ন ভিন্ন ব্রজের নায়কের ভিন্ন ভিন্ন ভজন প্রণালী আস্বাদ করিতে, কি সরূপ ও রায়কে দেখাইতে, যে দ্বাদশ বৎসর লাগিয়াছিল, সে জন্য বিস্ময়াবিষ্ট হইবার কোন কারণ নাই।

এই ব্রজের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির নায়কগণের প্রত্যেকের কিরূপ ভজন তাহা আমাদের বর্ণনা করিবার স্থানও নাই, শক্তিও নাই, এক প্রকারে প্রয়োজনও নাই। আমরা এইরূপ দুই চারিটি নায়কের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি বর্ণনা করিব, যাঁহাদের প্রকৃতি সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য হইবার সম্ভব। যাঁহারা আরো আগে যাইতে চাহেন, তাঁহারা উজ্জ্বলনীলমণি পড়িবেন। প্রধান কয়েকটী নায়কের কথা বলিতেছি যথা—অনুকূল, দক্ষিণ, ললিত, ধীরোদ্ধত, ধীরশান্ত, শঠ, ধৃষ্ট ইত্যাদি।

প্রথম অনুকূল নায়ক।

ইনি প্রেয়সীর নিতান্ত বাধ্য। ইঁহার মন অন্য কোন রূপবতী কি গুণবতীতে বিচলিত করিতে পারে না।

দক্ষিণ নায়ক।

ইঁহার সকল নায়িকার প্রতি সমান ভাব। মনে ভাবুন রাসের রজনীতে শ্রীকৃষ্ণ সকল গোপীর সহিত সমানভাবে বিহার করিতেছেন। তখন তিনি দক্ষিণা শ্রেণীর নায়ক। তাহা দেখিয়া শ্রীমতীর মান হইল। পরে সকল গোপী ত্যাগ করিয়া যখন শ্রীমতীকে লইয়া অন্তর্ধান করিলেন, তখন তিনি অনুকূল নায়কের কার্য্য করিলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

গম্ভীরা লীলায় শ্রীমতীর প্রকাশ।

যিনি শ্রীকৃষ্ণ বিরহ পাইয়াছেন তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ভাগ্যবান, এইজন্যে প্রভু গম্ভীরায় দ্বাদশ বৎসর প্রধানতঃ এই বিরহ রস প্রস্ফুটিত করিয়াছিলেন। এই যে সমুদয় অতি সূক্ষ্ম রস, ইহা কেবল ভাষার দ্বারা ব্যক্ত করা অসম্ভব। প্রভু স্বয়ং নানা উপায় অবলম্বন করিয়া ইহা করিয়াছিলেন। এমন কি, এই রস সমুদায় বুঝাইতে ও প্রস্ফুটিত করিতে স্বয়ং শ্রীমতীর আসিতে হইয়াছিল। তিনিই প্রভুতে আশ্রয় করিয়া সরূপ রাম রায়কে এই নিগূঢ় অনর্পিত রস সমুদয় বুঝাইয়া ছিলেন।

শ্রীমতী স্বয়ং না আইলে কাহার সাধ্য এ রস প্রস্ফুটিত করে? তিনি তাঁহার কৃষ্ণের সহিত যে খেলা খেলিয়াছেন, কি খেলিয়া থাকেন, তাহা দেখাইতে আসিয়াছেন। যখন শ্রীরাধা প্রভুতে প্রকাশ হইলেন, তখন প্রভুর স্বাভাবিক কমনীয় দেহ লক্ষ গুণ কমনীয় হইল, যেন তিনি একটি ভুবনমোহিনী স্ত্রীলোক। শ্রীমতী কথা কহিতে লাগিলেন, স্বর হইল স্ত্রীলোকের ন্যায়! বলিতেছেন, "সখি! আমার ভাগ্যের সীমা কি আছে? দেখ কৃষ্ণকে না ভালবাসে এমন কেহ নাই। আমি তাঁহাকে যেমন ভালবাসি এই ব্রজে কে না তাঁহাকে সেইরূপ ভালবাসে? আবার ইহাও কে না জানে যে এ ব্রজে আমার ন্যায় রূপসী কত শত রমণী আছে? কিন্তু তিনি আমা ছাড়া আর জানেন না। তাঁহার ভালবাসার হৃদয়ে তিনি ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারেন না। সুতরাং যেমন ব্রজগোপী সকলে তাঁহাকে ভালবাসে, তিনিও সকলকে সমান ভালবাসেন, কিন্তু তবু আমার প্রতি

সব সুধা বরিষণ।
প্রেমাঙ্কুরে শিশির সিঞ্চন॥

অর্থাৎ হে ভগবান! তুমি যে আমার প্রতি অত্যাচার কর, ইহা আমার অঙ্গের ভূষণ, আর আমার নিকট অতি মিষ্ট লাগে, আর ইহাতে আমার, তোমার প্রতি প্রেম-অঙ্কুরিত হয়। এ নিবেদন কে করিতেছে? যদি আমি করিতাম তবে সম্পূর্ণ ভণ্ডামি হইত। কিন্তু এ নিবেদন যিনি করিতেছেন তিনি এক জন গোপী, সুতরাং তখন তাঁহার পক্ষে এরূপ নিবেদন আর ভণ্ডামি হইল না।

গম্ভীরায় প্রভুর যে উপদেশ তাহা তিনি দুই প্রকারে দিতেন, এক কথা দ্বারা, আর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভঙ্গি, কি অন্যান্য বহুবিধ উপায় দ্বারা। এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ভাব দ্বারা কিরূপে উপদেশ দিতেন, তাহার উদাহরণ দিতেছি। তাহার উৎকণ্ঠা বর্ণনা করিব। মানের মধ্যে উৎকণ্ঠা রস একবারে পরিষ্কাররূপে টল টল করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ আসিবেন এ কথা ঠিক করা আছে। আর তাঁহার নিমিত্ত বাসক সজ্জা করিয়া শ্রীমতী (অর্থাৎ গম্ভীরায় প্রভু) বসিয়া আছেন।

প্রভু তাঁহার উৎকণ্ঠা দেখাইতেছেন, ইহা কত প্রকারে তাহা সংখ্যা করা যায় না। এত প্রকারের যে আমরা তাহা কল্পনায় আনিতে পারি না, তবু কিছু বলিতেছি। প্রভুর মুখ একটু মলিন হইয়াছে, ক্রমে কষ্ট বৃদ্ধি হইতেছে। অল্প অল্প দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। পরে মৃদুস্বরে "উহু উহু" করিতে লাগিলেন, এদিকে আবার উঁকি মারিতেছেন।

আমার একটি আত্মীয় একটু অধিক পরিমানে স্ত্রীর বশীভূত ছিলেন। তিনি আমাকে উৎকণ্ঠা লীলা দেখাইয়াছেন। আর তাহা এখনও আমার হৃদয়ে অঙ্কিত আছে। তাঁহার সুন্দরী স্ত্রী সংসারের গৃহিনী, রজনীতে

সকলের আহারাদি হইলে স্বামীর নিকট শয়ন করিতে আইসেন। স্বামী অগ্রে আহার করিয়াছেন, করিয়া শয্যায় শয়ন করিতে গিয়াছেন, কিন্তু শয়ন করিতে পারিলেন না, উঠিলেন, উঠিয়া স্ত্রীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। একবার রন্ধন ঘরের দ্বারে যাইতেছেন, যাইয়া বসিতেছেন, আবার শয্যায় আসিতেছেন, এইরূপে স্থির হইতে পারিতেছেন না, আমাকে বলিতেছেন, (আমি তখন অতি বালক) "যাও ডাকিয়া আন গিয়া।" আমি সেই গরবিনী স্ত্রীর নিকট যাইয়া তাঁহার স্বামীর সন্দেশ বলিলাম। তিনি বলিলেন, "আমার কাজ সমাধা হয় নাই, আমি যাই কিরূপে? তাঁহার লজ্জা ভয় কি কাণ্ডজ্ঞান নাই। আমি বধূ, আমি কিরূপে নিলর্জ্জের ন্যায় ব্যবহার করি?" "ভাল, কার্য্য সমাধা হইলে আসিও," ইহা বলিয়া আমি তাহার স্বামীর নিকট আসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে বসিলাম। পরে সেই গরবিণীর কার্য্য সমাধা হইল, সকলে শয়ন করিতে গেলেন, তখন তিনি স্বামীর নিকট আসিলেই পারেন, কিন্তু তাহা না আসিয়া রন্ধন ঘরের দাওয়ায় চুল কুলাইতে বসিলেন।

তখন বুঝিলাম যে, তিনি হঠাৎ আসিবেন এ তাঁহার ইচ্ছা নয়। তাঁহার স্বামী যে তাঁহার নিমিত্ত "উৎকণ্ঠা" রস ভোগ করিতেছেন, ইহাতে তিনি বড় সুখী আছেন। সুতরাং স্বামীকে শান্তিদান করায় তাঁহার স্বার্থ নাই।

সেই উৎকণ্ঠা রসের খেলা দেখিয়াছিলাম, আর একটু বড় হইলে যখন প্রভুর গম্ভীরা লীলা পাঠ করিলাম, তখনি তাহা আবার দেখিলাম। দেখিলাম প্রভুর যে উৎকণ্ঠা তাহা উপরে বর্ণিত স্বামীর উৎকণ্ঠা হইতে অনেক বিভিন্ন ও অনেক প্রবল।

কোন একজন আসিতেছেন না, তাহাতে তোমার মনে উৎকণ্ঠা ভাব উদয় হইয়াছে। তাহার কারণ এই যে, তাহাতে কিছু আছে যাহাতে

তোমার লোভ হইয়াছে ও তখনি প্রয়োজন হইয়াছে। সেই নিমিত্ত তুমি তাহাকে চাহিতেছ, কিন্তু এত ব্যস্ত হইয়াছ কেন? তিনি তখনি আসিতেছেন, না হয় কিছু পরে আসিবেন। তখনি তাঁহা.. না আসাতে এরূপ অধৈর্য্য কেন? এ অধৈর্য্যের কারণ দেখাইতেছি। তো.. পিপাসা হয়েছে, কি ক্ষুধা হয়েছে, তুমি জল কি আহারীয় দ্রব্য চাঁও, কাজেই তোমার বিলম্ব সহিতেছে না, তোমার জলের কি আহারীয় বস্তু তখনি প্রয়োজন। তোমার প্রিয় জনকে সর্পে দংশন করিয়াছে, রোজা আনিতে লোক গিয়াছে, কাজেই তুমি উৎকণ্ঠায় প্রপীড়িত হইয়াছ, তুমি দণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে রোজাকে প্রতীক্ষা করিতেছ, সে কতদুর আসিয়াছে তাহা উঁকি মারিয়া দেখিতেছ। আমার স্ব-সম্পর্কীয় যাহার কথা উপরে বলিলাম, তিনি কেন উৎকণ্ঠায় অভিভূত? তাঁহার স্ত্রী তাঁহার সম্মুখে, কেবল একটু দূরে। তাঁহাকে দেখিতেছেন, তাঁহার কথা শুনিতেছেন, ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে স্পর্শ করিতেও পারিতেন, তবে তাঁহার উৎকণ্ঠা কেন? অবশ্য কোন ক্ষুদ্র কারণ ছিল আর সেই নিমিত্ত তাঁহার শরীরে উৎকণ্ঠার লক্ষণ, সেও সামান্য। তিনি একবার শয়ন করিতেছেন, একবার উঠিয়া বসিতেছেন, কি এক বার এখানে ওখানে বিচরণ করিতেছেন। কিন্তু প্রভু কি করিতেছিলেন তাহা শ্রবণ কর। প্রভু উহু উহু করিতেছেন, প্রথমে মৃদুস্বরে, পরে অতি স্পষ্ট করিয়া "গেলেম মোলেম" বলিতেছেন। "প্রাণ যায় প্রাণ যায়" বলিতেছেন। একবার বলিতেছেন, আচ্ছা আমি একটু শয়ন করি, কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে আবার উঠিয়া বসিতেছেন। উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কেন? না বন্ধুর তল্লাসে যাইবেন এই নিমিত্ত। কিন্তু সরূপ ধরিয়া বসাইলেন, কাজেই আবার বসিলেন, বলিতেছেন যাও না একটু এগুইয়া দেখ। কি শব্দ শুনিলাম হে? বোধ হয় আসিয়াছেন? কখন বৃশ্চিকদষ্ট ব্যাক্তির ন্যায়

গড়াগড়ি দিতেছেন, আর পরিশেষে সহ্য করিতে না পারিয়া মূর্চ্ছিত হইতেছেন ;

এই গেল প্রভুর উৎকণ্ঠা, আর সরূপ রামরায় উহা দেখিতেছেন। কৃষ্ণের আসিতে একটু বিলম্ব হইয়াছে তাহাতে প্রভু কিরূপ ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন, সরূপ ইহা দেখিলেন। আর তাই এখন শ্রীমতী রাধার উৎকণ্ঠা কৃষ্ণ লীলার অভিনীত হইয়া থাকে। যথা পদ—

"ও ললিতা, সে কই গো ?
বুঝি এলোনা, এলোনা, এলোনা,
নিশি পোহাইল।"

রাধা একবার উঠে একবার বসে, কেঁদে বলে উদয় দীননাথ অনুদয় দীননাথ।

কি সনাতন গীতায় :—

"সীদতি সখি মম হৃদয়মধীরং।

কৃষ্ণের নিমিত্ত প্রকৃত যে উৎকণ্ঠা, সে আমার আত্মীয়ের যেরূপ হয়েছিল ঠিক সেরূপ নহে, সে অন্য জাতীয় রস। শ্রীমতী বলিতেছেন "বন্ধুর সর্ব্বাঙ্গ লাগি কান্দে সর্ব্ব অঙ্গ মোর।" শ্রীমতী পঞ্চ বহিরিন্দ্রিয় ও পঞ্চ অন্তরেন্দ্রিয় দ্বারা ভগবানকে আস্বাদন করেন। কথা কি, জীবে ও শ্রীভগবানে যেরূপ গাঢ় সম্বন্ধ এরূপ জীবে জীবে সম্ভবে না, এ সম্বন্ধ পুত্রবৎসলা জননী ও মাতৃভক্ত পুত্রে নাই। পতিব্রতা স্ত্রী ও স্ত্রীপ্রাণ স্বামীতে ও নাই। প্রভু গম্ভীরা লীলা দ্বারা তাই জীবকে দেখাইয়াছেন।

হে জীব! এই তত্ত্বটি বিচার ও ধ্যান কর। সেটি এই যে, তোমাতে আর শ্রীভগবানে যেরূপ গাঢ় ঘনিষ্ঠতা, এরূপ তোমার কাহারও সঙ্গে নাই। এ কথা হঠাৎ শুনিলে কবিতার বাণি বলিয়া বোধ হইতে

পারে। কিন্তু তাহা নহে, প্রভুর গম্ভীরা-লীলা বিচার করিলে বুঝা যাইবে যে প্রধানতঃ এই তত্ত্ব শিক্ষা দিবার নিমিত্ত প্রভু এই লীলা করেন।

সরূপ প্রভুর সম্বন্ধে একটী স্তুতি শ্লোক বলেন সেটী এই :—

হেলোদ্ধূলিত খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া।
শাম্যচ্ছাস্ত্র বিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া ॥
শশ্বদ্ভক্তি বিনোদয়া সমদয়া মাধুর্য্য মর্য্যাদয়া।
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া ॥

"হে দয়ানিধি শ্রীচৈতন্য, তোমার যে দয়ায় অনায়াসে সকলের দুঃখ দূরীভূত হইয়া চিত্ত নির্ম্মল হয়, এবং প্রেমানন্দের বিকাশ হয়; তোমার যে দয়ার প্রভাবে শাস্ত্রাদির বিবাদ উপশম প্রাপ্ত হয়, যে দয়া চিত্তে রস সঞ্চার করিয়া দিয়া প্রগাঢ় মত্ততা উৎপাদন করে, যাহা হইতে নিরন্তর ভক্তি সুখ ও সর্ব্বত্র সমদর্শন সংঘটিত হয় এবং যে দয়া সকল মাধুর্য্যের সার, তুমি করুণা করিয়া সেই দয়া আমাতে প্রকাশিত কর।"

শ্লোকের প্রকৃত অর্থ এই যে, মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়া শাস্ত্রের সকল বিবাদ মীমাংসা করিয়াছেন। এটা একটি স্তুতি বাক্য নয় প্রকৃত কথা।

জগতে বিবাদ দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদী লইয়া, বিবাদ নাস্তিক ও অনাস্তিক লইয়া। কেহ বলেন, ভগবান আছেন, কেহ বলেন নাই, আছেন তাহার কি প্রমাণ? তাঁহার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। মনে কেবল আশা মাত্র যে তিনি আছেন। আবার তিনি যে নাই তাহারও প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। মনুষ্যের মধ্যে এই এক ঘোর বিবাদ চিরদিন চলিতেছিল। আর এক বিবাদের কারণ ভগবানের প্রকৃতি লইয়া, কেহ তাহার হাতে বংশী দেন, কেহ দেন খাঁড়া। বিবাদ শ্রীভগবানে ও জীবে সম্বন্ধ লইয়া। কেহ বলেন শ্রীভগবান জীব হইতে পৃথক, কেহ বলেন সোহহং, আমিই সেই। এই দুই তত্ত্ব লইয়া চিরদিন এ ভারতবর্ষে বিবাদ হইতেছে। ভারতবর্ষ

কোথা না পৃথিবীর কেবল যেখানে আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের চর্চ্চা হইয়া থাকে।

কেহ বলেন, ভগবান নাই কেহ বলেন আছেন। কেহ বলেন, তিনি খড়্গধারী, কেহ বলেন তিনি বংশীধারী। কেহ বলেন তিনি নির্গুণ তাঁহার সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই, আমরা আমাদের কর্ম্মের দাস। কেহ বলেন ভগবান কর্ত্তা আমরা তাঁহার দাস। আবার কেহ বলেন তিনিও যে আমিও সে।

প্রভু অবতীর্ণ হইয়া এই চিরদিনের বিবাদ মীমাংসা করিলেন কিরূপে? না আপনি আসিয়া দেখাইলেন যে আমি ভগবান, আমি আছি। আর আপনি আসিয়া মনুষ্যের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করিয়া দেখাইলেন, তাঁহার প্রকৃতি ও তাঁহার ভজন কি। শ্রীভগবানের অস্তিত্বের ও প্রকৃতির এরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ পূর্ব্বে ছিল না, এই গৌর অবতারে জীবে প্রথমে পাইল।

শঙ্করের সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গদাসদিগের এই বিবাদ। প্রবোধানন্দের সঙ্গেও প্রভুর এই বিবাদ হয়। প্রভু এই বিবাদ মীমাংসা করিলেন। দুঃখের মধ্যে এই যে প্রভু যে এই চিরদিনের বিবাদ মীমাংসা করিলেন এ কথা তাঁহার ভক্ত কি কেহ উল্লেখ মাত্র করেন নাই। অর্থাৎ তাঁহারা লক্ষ্য ও করেন নাই।

অর্থাৎ গম্ভীরা লীলার উদ্দেশ্য কি? গম্ভীরা লীলার উদ্দেশ্য এই যে, জীবের নিকট শ্রীভগবানের পরিচয় করিয়া দেওয়া। কিন্তু একথা এ পর্য্যন্ত কেহ লক্ষ্য করেন নাই, আর যদি কেহ মনে মনে করিয়া থাকেন তবে প্রকাশ করেন নাই।

প্রভু অদ্বৈতবাদিতে ও দ্বৈতবাদিতে কিরূপে বিবাদ মীমাংসা করিলেন তাহা বলিতেছি। তিনি বলিলেন, যে জীব ও ভগবানে পৃথক এ কথা ঠিক্, আর সোঽহং একথাও ঠিক। অদ্বৈতবাদিতে দ্বৈতবাদিতে প্রকৃত পক্ষে কোন বিবাদ নাই। কিরূপে বলিতেছি।

আমরা বার বার একথা বলিয়াছি যে প্রভু যেরূপ কৃষ্ণবিরহ দেখাইয়াছেন, এরূপ বিরহ কোন জননী কোন পুত্রের নিমিত্ত কি কোন স্ত্রী কোন স্বামীর নিমিত্ত দেখাইতে পারেন নাই। প্রভু চব্বিশ বৎসর পর্য্যন্ত কৃষ্ণের বিরহে অন্ততঃ প্রত্যহ একবার মূর্চ্ছা যাইতেন। গম্ভীরায় প্রভু জাগিয়া রজনী পোহান। এরূপ বার বৎসর করিয়াছেন। কোথায় কোন বিরহিনী নারী তাহার প্রিয়তমের নিমিত্ত এরূপ কঠোর করিয়াছেন, না করিতে পারেন? কোথা কোন রমণী তাহার "প্রিয়তমের নিমিত্ত দণ্ডে দণ্ডে মূর্চ্ছা গিয়াছেন? প্রভু এইরূপ চব্বিশ বৎসর করিয়াছেন। প্রভু আপনি আচরিয়া জীবকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছেন। প্রভু শিক্ষা দিলেন যে, কৃষ্ণপ্রেম, দাম্পত্য প্রেম কি বাৎসল্য প্রেম হইতে অনন্ত গুণে গাঢ়।

এখন বিবেচনা করুন স্ত্রীকে লোকে বলে অর্দ্ধাঙ্গী। প্রকৃত পক্ষে যেখানে দাম্পত্য প্রেম বিশুদ্ধ, সেখানে স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গ ও স্বামী স্ত্রীর অর্দ্ধাঙ্গ সন্দেহ নাই। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেম, দাম্পত্য প্রেম হইতে কত গাঢ় তাহা প্রভুর কৃষ্ণবিরহ দেখিলে কতক বুঝা যায়।

তাহা যদি হইল তবে জীব ভগবানের প্রায় পূর্ণাঙ্গ ও ভগবান জীবের প্রায় পূর্ণাঙ্গ, অতএব সোহহং এ তত্ত্ব ঠিক। অথচ জীব ও ভগবান যে পৃথক একথাও ঠিক। এই তত্ত্ব শিখাইবার নিমিত্ত, এই বিবাদ মিমাংসা করিবার নিমিত্ত, প্রভুর অবতার। এই তত্ত্ব প্রস্ফূটিত করিবার নিমিত্ত প্রভুর গম্ভীরা লীলা। গম্ভীরা লীলা সম্বন্ধে আর অধিক না বলিলে চলে, ইহাই প্রচুর যে ভগবান তোমার যত ঘনিষ্ঠ এত কেহই নয়, তিনি তোমাকে লইয়া আর তুমি তাঁহাকে লইয়া, তাঁহার জগত তুমি ও তোমার জগত তিনি, ইহাই প্রকাশ করা এ লীলার উদ্দেশ্য। ইহা যদি তুমি জানিলে তবে কি হইল শুনিবে? তাহা হইলে তুমি শ্রীভগবানের সম্পত্তি পাইয়াছ তোমার আর অভাব থাকিল না। তোমার স্ত্রী, তোমার অর্দ্ধাঙ্গ

কিন্তু শ্রীভগবান তোমার পূর্ণাঙ্গ। তুমি যখন কৃষ্ণকৃষ্ণ বলিয়া কি গৌর গৌর বলিয়া নাম জপ কর, তখন মনে ভাবিতে পার যে, তুমি "আমি, আমি" অর্থাৎ নিজের নাম জপিতেছ।

তবে তুমি আর ভগবান এক, অথচ তিনি সম্পূর্ণ পৃথক, ইহা কিরূপে হয়, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পার। আমি তাহার উত্তর দিতে পারি না, তবে এই বলিতে পারি যে, প্রভু দেখাইয়া গিয়াছেন যে স্ত্রী ও স্বামীতে যেরূপ ঘনিষ্টতা, ইহা অপেক্ষা অনন্ত গুণে গাঢ় ঘনিষ্ঠ জীবে ও ভগবানে। তাহার মানে এই যে, তিনি আর তুমি এক। তিনি ও আমি পৃথক অথচ এক, ইহা কিরূপে হয়? তুমি আর তোমার স্ত্রী পৃথক, অথচ তোমরা পরস্পরে অর্দ্ধাঙ্গ, ইহা কিরূপে হয়? যদি স্ত্রী পৃথক হইয়া অর্দ্ধাঙ্গ হইতে পারে, তবে স্ত্রী হইতে কোন ঘনিষ্ঠতর বস্তু প্রায় পূর্ণ অঙ্গ হইবার বিচিত্র কি? কিরূপে কি হয় জানি না, তবে প্রভু ২৪ বৎসর প্রত্যহ কৃষ্ণবিরহে মূর্চ্ছিত হইতেন ইহা জানি।

যাঁহারা জোর করিয়া মুখে বলেন সোহহং, অর্থাৎ যাঁহাদের ভগবত প্রেমের লেশ মাত্র নাই, তাঁহাদের জানা উচিত যে, ভগবান জ্ঞানময় ও আনন্দময়, কিন্তু তুমি ভ্রমময় ও দুঃখময়। তবে তুমি যে সোহহং বল, তোমার লজ্জা করে না? তুমি এই মাত্র জানিলে যে, ভক্তগণ যে বলিয়া থাকেন "তিনি আমার আমি তাঁহার" তাহাও ঠিক নয়, ঠিক হইতেছে "আমি তিনি, তিনি আমি।" এই আমার অধিকার, এই আমার জীবনের শেষ সীমা, তাঁহার অনন্ত জীবন আমারও অনন্ত জীবন। তিনি আর আমি চিরদিন ঘনিষ্টতা করিব, ক্রমে এ ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া যাইবে। এমন কি, শেষে প্রায় এক হইয়া যাইব, তবুও পৃথক থাকিবে, আর ইহাকে বলে অধিরূঢ় ভাব।

যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণ নাথস্তু সএব নাপরঃ ॥

ইহার অর্থ এই, "শ্রীকৃষ্ণ আমাকে আলিঙ্গন দান করিয়া কৃতার্থ করুন, কিবা সেই আলিঙ্গনের পেষণে আমাকে প্রাণে বধ করুন, ইহা উভয়ই আমার পক্ষে সমান। যেহেতু তিনি আমার পর নহেন, তিনি আমার প্রাণনাথ।" প্রভু বলিতেছেন :—

"তিনি আমাকে মারিবেন কি আশীর্ব্বাদ করিবেন সব আমার নিকট অমৃত। তিনি যে আমাকে তাঁহার বিরহ-জনিত ক্লেশ দিয়া থাকেন, তাহাও আমি পরম সৌভাগ্য মনে করিয়া থাকি।"

আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন, সরল ভাবে এরূপ কথা শ্রীভগবানকে কেহ বলিতে পারেন না, যে, "হে বিভু! তোমার আশীর্ব্বাদ ও দণ্ড আমার নিকট সমান।" তবে তিনিই পারেন যাঁহার শ্রীভগবানে নিঃস্বার্থ প্রীতি হইয়াছে। অর্থাৎ এরূপ কথা শ্রীমতী রাধা বলিতে পারেন, বা শ্রীপ্রভু রাধা ভাবে, বলিয়া গিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে তানসেনের গীতের উল্লেখ করিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন যে, "হে কৃষ্ণ, আমি নিশিদিন তোমার বিরহে ব্যাকুল, কেমন, না জলের নিমিত্ত যেমন চাতক।" আমরা তখন বলিয়াছি যে তানসেনেরও সরল প্রার্থনা নয়, কেবল কবিতা। এই ক্ষুদ্র লীলা-লেখক ও একদিন এইরূপ ভণ্ডামি করিয়াছিল। আমার একটী গীত আছে। যথা :—

"ও বাপ, জেনো আমার কাছে তোমার প্রহারও মিঠে লাগে।"

গীতে আমি ইহা বলিলাম, কিন্তু ইহা কি সত্য? ইহা সত্য নয়, কবিতা মাত্র। কারণ প্রহার তাঁহারি হউক বা আর কাহার হউক, আমার কাছে মিঠা লাগে না।

আমার আর একটি গীত আছে :—

যত অত্যাচার তোমার, অঙ্গের ভূষণ আমার,

তাহা বলিতেছেন, সখি! কৃষ্ণকে ভজিয়া আমার একি হইল? সখি! কৃষ্ণকে ভজিয়া আমার একি হইল? কৃষ্ণকে ভজিয়া দেখিতেছি আমার উন্মাদ দশা হইয়াছে। শুনিবে? মেঘ দেখিলে আমার প্রাণ কান্দিয়া উঠে। তোমরা ময়ূরকে নয়ন-সুখকর ভাব, কিন্তু আমার হৃদয়ে তাহার কৃষ্ণকণ্ঠ যে কালফণীর ন্যায় বোধ হয়। সখি! বলিব কি! কৃষ্ণবর্ণ কোন মনুষ্য দেখিলে আমার দেহে আর প্রাণ থাকে না। এ সমুদায় ত উন্মাদের অবস্থা? আমি কাল দেখিলে বিচলিত হই, কেমন? যাহা হউক আমি কাল আর দেখিব না। সখি! দেখিও যেন আমার কুঞ্জে কৃষ্ণবর্ণ কিছু না থাকে। দেখিলেই কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি হইবে, আর বিরহে পুড়িয়া মরিব। তার কি করিব?

সরূপ—তোমার কেশ?

প্রভু—মস্তক মুণ্ডন করিব।

সরূপ—তোমার শ্যামা সখি?

প্রভু—তাহাকে তাড়াইয়া দাও।

প্রকৃতই প্রভুর অকথ্য প্রেমের আর কি বর্ণনা করিব, মেঘ কি কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ দেখিলে তাঁহার কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি হইয়া তিনি অচেতন হইতেন। অন্যের মনের ভাব দুইরূপে জানা যায়, ভাষা দ্বারা আর নানা উপায় দ্বারা। এইরূপে মনের ভাব ভাল করিয়া প্রকাশ করিবার নিমিত্ত কেহ স্বর বিকৃতি করেন, অঙ্গভঙ্গি করেন, কবিতার সাহায্য লয়েন ইত্যাদি। একজন মনে একটি ভাব প্রকাশ করিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার তৃপ্তি হইল না। তিনি সেই ভাবটি তাঁহার শ্রোতার ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করাইবার নিমিত্ত হাত কি মাথা চালাইতে লাগিলেন, কি চক্ষের ভঙ্গি করিলেন, কি নাসিকা কুঞ্চিত করিলেন, কি ওষ্ঠ দুটি দৃঢ় করিয়া সংলগ্ন করিলেন।

আর এক উপায় কণ্ঠস্বর বিকৃত করিয়া। যেমন একজন সহজ সুরে

তাঁহার যে টান দেখা যায় এ প্রকার আর কাহাতেও নাই।" এখানে শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণকে অনুকূল নাগরের পদ দিতেছেন। বলিতেছেন, "আমার এ ভাগ্য কেন? আমি কি ব্রত করিয়াছিলাম?" তখন দুইহাত জুড়িলেন, উর্দ্ধে চাহিলেন, আর বলিতেছেন, "নাথ! তুমি বড় করুণ, তোমার গুণ আমি কিরূপে শোধিব? আমি শ্রীমতী দুর্গার নিকট কামনা করি যে তুমি চিরদিন সুখে থাক, আমার যত মঙ্গল সব তুমি লও।" প্রভু রাধা ভাবে এইরূপ বলিতেছেন। এতদূর কষ্টে শ্রষ্টে মনের ভাব বলিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু অবিরত ধারা পড়িতেছে, কথা ক্রমে ঘন হইয়া আসিতেছে, আর কথা বলিতে পারেন না। তখন স্বরূপের গলা ধরিলেন, ধরিয়া অঝোরে রোদন করিতে লাগিলেন। কণ্ঠরোধ হয়েছে, মুখে আর কথা সরিতেছে না।

এইরূপ কিছুকাল থাকিয়া হঠাৎ প্রভু চমকিয়া উঠিলেন। যেন বিহ্বল ছিলেন এখন সম্পূর্ণ বাহ্য পাইলেন। বলিতেছেন, "সখি! ঐ কৃষ্ণ আসিতেছেন, শুনিতেছ না? আমি যেন নূপুরের রুনু ঝুনু শুনিতেছি। দেখছ না সমস্ত আকাশ পদ্মগন্ধে ভরিয়া গিয়াছে।" ইহা বলিয়া উঁকি ঝুঁকি মারিতে লাগিলেন। ভাব এই যে, কতদূর কৃষ্ণ আসিয়াছেন তাহা দেখিতেছেন। বদন চিন্তাকুল, কিন্তু তদণ্ডে উহা প্রফুল্ল হইল, আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া সম্মুখে নিমিখহারা নয়নে চাহিয়া বলিতেছেন, "এসেছো বন্ধু এসো, আমি তোমারই কথা বলিতেছিলাম। আর কাহার বা কথা বলিব, আর আমি কি কথা জানি?" ইহাই বলিতে বলিতে প্রভু উঠিতে গেলেন। মনোগত ভাব, অগ্রবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণকে আলিঙ্গন বা আহ্বান করিবেন। কিন্তু স্বরূপ উহা বুঝিতে পারিয়া উঠিতে দিলেন না। বলিতেছেন, তুমি উঠিতেছ কেন? তোমার বন্ধুকে তোমার কাছে আসিতে বল। প্রভু উঠিতে না পারিয়া তাই স্বীকার করিয়া বলিতেছেন—

"এসো বন্ধু এসো, আমি আঁচল পাতিয়া দিতেছি।
তুমি বসো, আমার আধ অঞ্চলে বসো।"

ইহা বলিতে বলিতে যেন আঁচল পাতিতে লাগিলেন। তাহার পরে বলিতেছেন, "তুমি আমার আঁচলে বসো, আমি নয়নভরে তোমায় দেখি। তোমার মুখখানি দেখিতে আমার কি সুখ তাহা আর কি বলিব, আমার প্রাণ তার সাক্ষী। এই প্রলাপ হইতে এই বিখ্যাত পদ সৃষ্ট হইয়াছে যাহা বৈষ্ণব মাত্রে কীর্ত্তনে অপরূপ সুরে গাহিয়া থাকেন—

এসো এসো বন্ধু, এই আধ অঞ্চলে, এসো বসো বন্ধু,
আমি দুটি নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।
দেখিতে তোমার মুখ, উপজয়ে কত সুখ,
সেইতো পরাণ আমার সাক্ষী॥

এই যে কীর্ত্তন, এই যে সহস্র সহস্র মহাজনের পদ সৃষ্টি হইল, ইহার প্রায় সকলেরই ভাব প্রভু আপনি রাধা হইয়া প্রকাশ করেন। প্রভুর ভাব মহাজনগণ কবিতার সুর তালের সাহায্যে প্রকাশ করিলেন। প্রথম দেখুন এই উপরের লীলায় কৃষ্ণ হইতেছেন অনুকূল নাগর। শ্রীমতী রাধা স্বয়ং আসিয়াছেন, তিনি অনুকূল নায়ককে কিরূপ ভজনা করিলেন, তাহা সরূপ প্রভৃতি দেখিলেন। আবার ভক্তগণ গোপী অনুগা ভজন কি তাহাও এই লীলা দ্বারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। শ্রীমতী রাধা ও শ্রীকৃষ্ণের খেলা হইতেছে, সরূপ ও রামরায় কিছু করিতেছেন না, কেবল বসিয়া দেখিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের সেই দেখার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে ভজন হইতেছে। শ্রীমতী স্বয়ং যে রস আস্বাদন করিতেছেন, তাঁহারা ততখানি না হউক, কিয়ৎ পরিমানে সেই রসই আস্বাদ করিতেছেন।

সরূপ ও রামরায় এই লীলা চক্ষে দেখিলেন। হে ভক্ত, সত্য তুমি ইহা চক্ষে দেখিলে না, কিন্তু তুমি এখন ধ্যান চক্ষে এই লীলা অনায়াসে

দেখিতে পার। উপরে যাহা যাহা বর্ণনা করিলাম, ইহা সমুদায় হৃদয়ে দেখিতে চেষ্টা কর, তুমিও দেখিতে পাইবে।

দ্বাদশ বৎসর, প্রধানতঃ কৃষ্ণ-বিরহ লইয়া, প্রভু গম্ভীরা লীলা করেন। এ কৃষ্ণ-বিরহ কিরূপ? অতি প্রিয়জন দেহ ত্যাগ করিলে যে দুঃখ হয় তাহাকে শোক বলে। তিনি অদর্শন হইলে প্রিয়জন কিছুদিনের জন্য যে দুঃখ ভোগ করেন তাহাকে বিরহ বলে। মনে ভাবুন পতি দূরে আছেন, তাহার প্রেমে অভিভূত পত্নী, গৃহে তাহার নিমিত্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। এই যন্ত্রণাকে বলে বিরহ। প্রভুর কৃষ্ণ-বিরহ, এইরূপ রমণীর পতিবিরহের ন্যায় নহে। পতি দূরে থাকায়, তাহার অদর্শন জনিত দুঃখ ছাড়া রমণীর আরো কিছু আছে। মনে ভাবুন পত্নী, পতি কাছে না থাকায়, সাংসারিক অনেক দুঃখ ভোগ করিতে পারেন,—শাশুড়ির যন্ত্রণা জনিত, অতৃপ্ত ইন্দ্রিয়ের নিমিত্ত দুঃখ পাইতে পারেন, সুতরাং পতিবিরহে রমণীর দুঃখ, আর কৃষ্ণ-বিরহে প্রভুর দুঃখ অনেক বিভিন্ন। প্রভু যে কৃষ্ণকে না দেখিয়া মরিতেছেন, সে কেবল কৃষ্ণ-প্রেমের নিমিত্ত। আর পত্নী যদি পতিবিরহে দুঃখ পান তবে সে শুদ্ধ পতির নিমিত্ত নয়। পতির বিরহে পত্নীর যে দুঃখ, তাহা প্রভুর কৃষ্ণবিরহ জনিত দুঃখের সহিত তুলনাই হয় না।

প্রভু কৃষ্ণের নিমিত্ত যে বিরহ দেখাইয়াছেন, ইহা জগতে কেহ কাহারও নিমিত্ত কখন দেখাইতে পারেন নাই। এই পদ দেখুন—

বিরহ ভাবে মোর গৌরাঙ্গ সুন্দর, ভূমে পড়ি মুরছয়।
পুন পুন মুরছিত অতি ক্ষীণ শ্বাস।
দেখিয়া লোকের মনে হয় কত ত্রাস॥
উচ্চ করি ভকত বলে হরিবোল।
শুনিয়া চেতন পাই আখি ঝরু লোর॥

আপনারা বিরহে এরূপ কাতর কাহাকে দেখিয়াছেন? কাহারও কথা

শুনিয়াছেন ? কোন কবিতা বা নাটকে পড়িয়াছেন ? বিরহে মূর্চ্ছা যায় এরূপ কেহ কখন শুনিয়াছেন কি দেখিয়াছেন ? শোকে মূর্চ্ছা যায় সত্য, কিন্তু সে প্রথম প্রথম, উহা পরে সারিয়া যায়। আর শোকে মূর্চ্ছা যাওয়ার অনেক কারণ আছে যাহা বিরহে নাই। পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রভু প্রত্যহ এইরূপ মূর্চ্ছা যাইতেন।

প্রভু গম্ভীরায় বসিয়া আছেন, সম্মুখে রামরায় ও সরূপ। ক্রমে আপনি যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সন্ন্যাসী তিনি শ্রীমতী রাধা হইলেন, সে কিরূপে তাহা পরিশিষ্টে বিস্তার করিয়া বর্ণনা করিয়াছি। অর্থাৎ দেহ রহিল গৌরাঙ্গের, এবং শ্রীমতী ঐ দেহে প্রবেশ করিলেন। তাহাতে কি হইল না, সরূপ ও রামরায়ের সম্মুখে শ্রীমতী রাধা বসিলেন। সে কেমন, না একদিন যেমন শ্রীবাসের বাড়ীতে শ্রীকৃষ্ণ সকলের সম্মুখে ঐ গৌরাঙ্গ দেহ আশ্রয় করিয়া প্রকাশ হয়েন। তখন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত কথা কহিয়াছিলেন, এখনও সরূপ ও রামরায় সেইরূপ শ্রীমতীর সহিত ইষ্টগোষ্ঠি করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কেন আসিয়াছিলেন, না তিনি কিরূপ বস্তু, তিনি চান কি, ও তাঁহাকে কিরূপে পাওয়া যায়, তাহাই জীবকে জানাইতে।

তুমিও সরূপ ও রামরায়ের ন্যায় এই রস, ততখানি না হউক, কতক আস্বাদন করিতে পারিবে। তবে অবশ্য ধ্যানে ইহা দর্শন করিতে অভ্যাস প্রয়োজন, তাহাতে ক্রমে ধ্যান স্ফূর্ত্তি হইবে। তখন সরূপ ও রামরায় যতখানি আস্বাদ করিলেন, তুমিও প্রায় ততখানি আস্বাদ করিতে পারিবে। ইহাকে বলে গোপী-অনুগত ভজন।

এখন গম্ভীরা লীলার "প্রতিকূল" নায়ক সম্বন্ধে কিছু বলিব। প্রভু, শ্রীমতী রাধা হইয়া গম্ভীরায় বসিয়াছেন। মনের ভাব এই যে, তিনি চঞ্চল ও নিঠুর কৃষ্ণের সহিত প্রেম করিয়া বড়ই অকাজ করিয়াছেন। মনে এই

ভাবিতেছেন, আর তাহা ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত জগন্নাথ বল্লভ নাটকের এই শ্লোকটি পড়িলেন—

প্রেমচ্ছেদরুজোঽবগচ্ছতি হরির্নায়ং ন চ প্রেম বা।
স্থানাস্থানমবৈতি নাপি মদনো জানাতি নো দুর্ব্বলাঃ।

তাহার অর্থ এই—শ্রীরাধিকা সখীকে বলিতেছেন, সখি! এই হরি, প্রেমভঙ্গজনিত পীড়া যে কি গুরুতর তাহা জানেন না। প্রেমও স্থানাস্থান জানে না, মদনও জানে না যে আমরা দুর্ব্বল ইত্যাদি। ইহার অর্থ এই, শ্রীমতী কৃষ্ণপ্রেমের ক্লেশ বলিতেছেন তাই কৃষ্ণকে নিন্দা করিতেছেন। বলিতেছেন, হে নাথ! প্রেম-ভঙ্গ যে কি হৃদ্‌বিদারক দুঃখ তাহা তুমি জান না। আমরা তোমাকে ভাল বাসিয়া মরি, তুমি ফিরেও চাওনা। এই গেল প্রতিকূল নাগরের মধুর ভজন। *

সঙ্গী রামরায়কে সখী ভাবিয়া প্রভু বলিতেছেন, "সখি! কৃষ্ণের সঙ্গে প্রেম করিয়া কি অকাজ করিয়াছি। তিনি ত প্রেমভঙ্গের যে বেদনা তাহা

* এক গোস্বামীর এক ঠাকুর ছিলেন, তাঁহাকে তিনি যত্ন পূর্ব্বক সেবা করিতেন। তাঁহার শিশু পুত্র মরিতেছে দেখিয়া তিনি তাঁহার সেই ঠাকুরকে আঙ্গিনায় ফেলিয়া হস্তে দা লইয়া বলিতে লাগিলেন, "এই তোমার কৃতজ্ঞতা" আমি তোমার ভজন করি আর তুমি আমার পুত্র নিতেছ? এই দাঁ দিয়া তোমায় খণ্ড খণ্ড করিব। এখানেও প্রতিকূল নায়ক লইয়া কাণ্ড। কিন্তু গোস্বামী ঠাকুর তাহার কার্য্যে দেখাইতেছেন যে, তিনি ঠাকুরকে ভজন করিতেন না, ভজন করিতেন আপনাকে। অর্থাৎ তাঁহার কৃষ্ণ ভজন মানে আপনি সুখে থাকিবেন। কিন্তু প্রভুর প্রতিকূল নাগর ভজন অতি মধুর, উচ্চ হইতে উচ্চতম। ইহা আর এক প্রকার, ইহার ভিত্তি বিশুদ্ধ প্রেম।

জানেন না, তাঁহার কি? সখি! আমাকে ডুবিতে পার যে, এমন প্রেম তুমি কর কেন? ভাই, প্রেম কি কথা শুনে? স্থানাস্থান মানে? প্রেম যদি সে বিচার করিত তবে কৃষ্ণেতে ধাবিত কেন হইব? আমি যে এই দিবানিশি পুড়িতেছি তাহা কি তিনি জানেন? আমি পুড়িতেছি তাহাতে তাঁহার কি? সখি, তুমি আমাকে বারবার বল যে, ধৈর্য্য ধর, কিন্তু জাতিতে অবলা, স্বভাবে অখলা, হায় বিধি! এমন জীবকে কি প্রেম দিয়া দগ্ধ করিতে হয়?"

পাঠক মহাশয় স্মরণ রাখিবেন, প্রভু যে এ অভিনয় করিতেছেন তাহা নয়। প্রভু ঠিক রাধা হইয়াছেন, আর তাঁহার প্রকৃত মনের ভাব উঘাড়িয়া বলিতেছেন। এই পদটি কীর্ত্তনীয়া মাত্রে গাইয়া থাকেন যথা:—

আঁধল প্রেম পহিলা না জানি হাম। ইত্যাদি।

প্রভু বলিতেছেন, সখি প্রেম অন্ধ তাঁকি আগে আমি জানি, আমি দারুণ প্রেম করিয়াছি, ইহার আর ঔষধ নাই। সখি! যৌবন দুই দিনের নিমিত্ত। আমার যৌবন আমি যাচিয়া কৃষ্ণের কাছে ভিক্ষারি হইলাম। কিন্তু তাহার যে নাগরালি তাহা বাহিরের, অন্তরের নয়। সখি! কি করি, কি করি, হায়, হায়, এরূপে দিবা নিশি কত সহিব?

প্রভু একটু চুপ করিয়া কর্ণামৃতের এই শ্লোকটি পড়িলেন:—

কিমিহঃ কৃণুমঃ কস্য ব্রমঃ কৃতং কৃতমাশয়া,
কথয়তঃ কথামন্যাং ধন্যামহো হৃদয়েশয়ঃ!
মধুর মধুর স্মেরাকারে মনোনয়নোৎসবে,
কৃপণ কৃপণা কৃষ্ণে তৃষ্ণা চিরংবৃলম্বতে।

বলিতেছেন, সখি! আমার অন্যায়, আমি তোমাদের কাছে প্রবোধ ভিক্ষা করিতেছি। যেহেতু তোমরাও ত আমার মত ব্যথিত? তোমাদের কাছে এসব কথা বলিয়া তোমাদের হৃদয়ের ব্যথা আরো বাড়াইয়া

দিতেছি। তোমরা আমাকে প্রবোধ দিতেছ, কিন্তু তোমাদের প্রবোধ কে দিবে? আবার সখি! না বলিয়াইবা কি করি? তোমরা ছাড়া আর কাহাকে বলি, আমার আর কে আছে?

আবার একটু চুপ করিলেন। বলিতেছেন, "সখি, এক কাজ কর। আমরা কৃষ্ণের জন্যে যতদূর করিতে হয় করিলাম, কিন্তু কোন ফল হইল না। এসো আমরা এখন কৃষ্ণ কথা ছাড়িয়া অন্য কথা বলি। এসো আমরা সকলে প্রাণপণ করিয়া কৃষ্ণকে ভুলিয়া যাই।" ইহা বলিয়া নয়ন মুদিলেন, উদ্দেশ্য কৃষ্ণকে তাড়াইয়া হৃদয়ে অন্য কথা, ভাব ও ছবি আনিবেন। একটু নয়ন মুদিয়া থাকিয়া বলিতেছেন, "সখি! এ কি হইল? হইল না! হইল না! আমি কৃষ্ণকে ছাড়িতে পারিলাম না। শুন, সে বড় আশ্চর্য্য কথা। আমি কৃষ্ণকে ছাড়িব বলিয়া দৃঢ় সঙ্কল্প করিলাম, প্রাণপণ করিয়া নয়ন মুদিয়া বসিলাম, সঙ্কল্প এই যে, কৃষ্ণকে আর হৃদয়ে আসিতে দিব না। ওমা! দেখি কি যে, যাহাকে ছাড়িব তিনি আমার হৃদয় জুড়িয়া বসিয়া আছেন! শুধু তাহাও নয়, সেই ভুবন মোহনিয়া বদন আমার পানে চাহিয়া আমাকে বিনয় করিতেছেন। ইঙ্গিতে অনুনয় করিতেছেন, যেন আমি তাঁহাকে না ছাড়ি!"

আমরা প্রাণপণ করিয়াও এই অবাধ্য চিত্ত একবারও কৃষ্ণের দিকে লইতে পারি না। কিন্তু প্রভুর মহাবিপদ এই যে, তিনি কৃষ্ণকে ছাড়িতে ভারি উদ্যোগী, কিন্তু কৃষ্ণ কোন ক্রমে যাইতে চাহেন না!

প্রভুর এখন একবারে ভাব পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। তখন সখীদের ছাড়িলেন, একবারে অধীর হইয়া কৃষ্ণকে বলিতেছেন, "বন্ধু! তুমি আমার দিকে অমন করে কাতরভাবে চাহিও না, আমি তাহা সহ্য করিতে পারি না। তোমাকে ছাড়িব? তোমাকে আমি ছাড়িব? তোমাকে আমি, যাহার এ জগতে তুমি ছাড়া আর কেহ নাই, সেই হতভাগিনী রাধা ছাড়িবে?

আমি তোমাকে ছাড়িব তবে আমার কি থাকিবে? আমি তোমাকে ছাড়িব এ কথা বলিয়াছি সত্য, কিন্তু তুমি কি তাই বিশ্বাস কর? এ সব মিথ্যা কথা, এ সব আমার চাতুরী, তাও নয়, আমার প্রলাপ। তোমাকে না দেখিয়া পাগল হইতেছিলাম, তাহাই প্রলাপ করিতেছিলাম।"

পূর্ব্বে কৃষ্ণকে মন্দ বলিয়াছিলেন, তাহার নিমিত্ত এখন কৃষ্ণের নিকট করুণ স্বরে ক্ষমা চাহিতেছেন! সে এরূপ করুণ স্বরে যে, শুনিলে প্রাণ বিদীর্ণ হইয়া যায়। বলিতেছেন, আমি কি তোমাকে নিন্দা করিতে পারি? তাকি হয়? তবে অবলা বলিয়া, কি উন্মাদ হইয়া যদি কিছু বলি, তবে আমি তোমাকে স্বরূপ বলিতেছি, সে মনে নয়, মুখে। এখানে প্রতিকূল নাগরের ভজন অনুকূলে পরিণত হইল।

কখন বা বিষম বেদনার আঘাতে কাতর হইয়া, প্রভু শ্রীকৃষ্ণের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন। বলিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণকে ভজিয়া কি কুকার্য্যই করিয়াছি। হায়! হায়! আর না, আমি আর কৃষ্ণকে ভজিব না। যেন প্রভু ইহা রহস্য ভাবে বলিতেছেন, সেই ভান করিয়া স্বরূপ বলিলেন, কৃষ্ণকে ছাড়িয়া তবে কাহাকে ভজিবে? প্রভু বলিলেন, কেন গণেশকে ভজিব! তিনি সিদ্ধিদাতা, যাহা চাহিব তাহা পাইব। না হয় সদাশিব সরল মহাদেবকে ভজিব, তিনি শত্রু কর্তৃক বিষজালে প্রপীড়িত হইয়াও তাঁহাকে বর দিয়াছিলেন। তাও না হয়, মা দুর্গা আছেন, কালী আছেন, তাঁহাদের পূজা করিব, যাহাই হউক সদ্রূপ, তাঁহাদের ভজনে প্রেম বেদনা নাই। জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে হইবে না, আমি যে দিবা নিশি পুড়িতেছি!

ইহা বলিতে বলিতে হৃদয়ে, কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি হইল, আর কৃষ্ণপ্রেমে অভিভূত হইলেন। তখন অতি কাতরে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সে কাতরোক্তিতে পাষাণ বিদীর্ণ হয়।

কৃষ্ণ তাঁহার কিরূপ সর্ব্বনাশ করিয়াছেন প্রভু গম্ভীরায় হৃদয় উঘারিয়া

রতনে জড়িত তুমি কি দিব তার তুলনা।
(আমরা) কাঙ্গালিনী বনে থাকি হীরা মতি চিনি না॥
আমাদের রাজপাট কদম্বতলা, সে বনের রাজা চিকণ কালা,
রসসিংহাসনে রসের বালিশ, শোয়াতাম তাকি জান না।
ব্রজে আমরা সবাই সবল আমরা লৌকিকতা জানি না।

এই গেল শ্রীভগবানকে রসের দ্বারা ভজনা করা। গোপীরা বলিতেছেন, ছি! তোমার চরিত্র কি? লোকে তোমাকে খোসামোদ করে, তাই তুমি ভুলে যাও? তোমাকে হীরামুক্তা দেয়, আর তাই তুমি আদর করে লও? কিন্তু আমাদের যে সরল ভালবাসা, তাহা তোমার ভাল লাগে না? ছি!

ইহা শুনিয়া সভাসদগণ হাসিলেন, কৃষ্ণও সুখে মধুর হাসিলেন, কারণ তিনি সভাসদগণকে গোপীর মহিমা দেখাইতেছেন। এই স্বার্থপর অসরল সভাসদগণ স্তুতি বাক্যে বড় মজবুত। স্বার্থ সাধন নিমিত্ত মুখে কেবল দয়াময়, দয়াময় করিতেছেন। মুখে পাপ পাপ বলিয়া দৈন্যতা দেখাইতেছেন, কেননা রাজাকে তুষ্ট করিয়া কিছু স্বার্থ সাধন করিবেন।* গোপীগণের ঠিক ইহার বিপরীত, ইহার কিছুই করেন না। পরে গোপিনীগণ আবার বলিতেছেন—যথা পদ :—

দে দে দে মোদের চূড়া দে।
(চূড়াত মথুরার নয়) (চূড়াত আমাদের দেওয়া)
চূড়ায় মথুরা ভুলবে না।
চূড়া দে মুরলী দে (শুন রাজেশ্বর হে)
আমাদের পিরীতি ফিরায়ে দে।

জীব চিরদিন শ্রীভগবানকে রাজ রাজেশ্বর বলিয়া ভজনা করিয়াছেন।

---

* আপনারা দেখিবেন জগতের ভগবান এইরূপ।

সঙ্গে নিজজন যত তেমতি চলিল।
সত্বরে মন্দির ভিতরেতে উত্তরিল ॥

এইরূপে প্রভু যখন মন্দিরে চলিলেন, ভক্তগণও তখন নীরবে পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন। প্রভু এরূপভাবে ভক্তগণ ছাড়িয়া মন্দিরে কখন যাইতেন না, সুতরাং ভক্তগণ চিন্তিত হইয়া পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন। প্রভু মন্দিরের মধ্যে গমন করিলেন, তাঁহার পর (চৈতন্যমঙ্গলে)—

নিরখে বদন প্রভু দেখিতে না পায়।
সেই খানে মনে প্রভু চিন্তিল উপায় ॥
তখন দুয়ারে নিজ লাগিল কপাট।
সত্বরে চলিল প্রভু অন্তরে উচাট ॥

প্রভু দ্বারে দাঁড়াইয়া উকি মারিতে লাগিলেন যেন জগন্নাথের বদন ভাল দেখিতে পাইতেছেন না। প্রভু যেন এই নিমিত্ত জগন্নাথের সম্মুখে অগ্রবর্ত্তী হইবার নিমিত্ত ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

প্রভু অভ্যন্তরে কখন যাইতেন না, গরুড় স্তম্ভের নিকট দাঁড়াইয়া দর্শন করিতেন। সে দিবস মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, করিয়া উকি মারিতে লাগি-লেন, যেন ভাল দেখিতে পাইতেছেন না, পরে একেবারে অভ্যন্তরে জগন্নাথের সম্মুখে গমন করিলেন।

এরূপ প্রভু কখন করেন নাই, সুতরাং ভক্তগণ প্রভুর কাণ্ড একটু বিস্ময় ও চিন্তার সহিত দর্শন করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের বিস্ময় কোন এক কারণে অনন্ত গুণ বাড়িয়া গেল। অর্থাৎ প্রভু যেই অভ্যন্তরে গমন করিলেন, অমনি দ্বার আপনি বন্ধ হইয়া গেল। ভক্তগণ অবাক্ হইয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আষাঢ় মাস সপ্তমী তিথি, রবিবার বেলা তৃতীয় প্রহর। প্রভু অভ্যন্তরে, জগন্নাথ সম্মুখে, ভক্তগণ বাহিরে। প্রভু কি করিতেছেন, তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন না, কারণ কপাট বন্ধ রহিয়াছে।

ব্রজগোপীগণ প্রথমে তাঁহার রাজমুকুট কাড়িয়া লইলেন, লইয়া চূড়া দিলেন, হাতের দণ্ড কাড়িয়া লইয়া মুরলী দিলেন। এখন মথুরায় তাঁহাকে রাজবেশ, রাজ-পদে দেখিয়া গোপীগণ কাজেই তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতেছেন। বলিতেছেন, তুমি যদি রাজা হবে, তবে চূড়া মুরলী আর আমাদের পিরীতি ফিরায়ে দাও। কারণ উহাতে ত তোমার আর প্রয়োজন নাই। যেহেতু মথুরার লোক বাঁশীতে ভুলিবে না। তাহারা প্রেম চাহে না। যাঁহাদের সর্ব্বদা ভয়, ভগবান তাঁহাদের উপর রাগ করিবেন, তাঁহার বিগ্রহ করিলে তিনি রাগ করিবেন, তাঁহার বিগ্রহ আছে বলিলে তিনি রাগ করিবেন, করজোড় করিয়া কথা না বলিলে রাগ করিবেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যাঁহারা শ্রীভগবানকে একটু প্রীতি করেন, তাঁহারা তাঁহার বদনে গাম্ভীর্য্য দেখিলে সেটা অস্বাভাবিক ভাবিয়া বড় ক্লেশ পায়েন। কারণ তাঁহাদের ভগবান হাস্যময়, রসিক, করুণাময়, স্নেহশীল, প্রেমের কাঙ্গাল।

এখন শ্রবণ করুন, গোপীগণ তাহার পরে শ্রীভগবানকে কেমন বিদুষক সাজাইলেন। ব্রজগোপীগণ আবার বলিতেছেন, হে রাজরাজেশ্বর, আমরা তোমাকে ব্রজে ধরিয়া লইয়া যাইব। কারণ আমরা বুঝিতেছি যে এই অসরল স্বার্থপর স্থানে তোমার একটুও আরাম নাই।

সভাসদগণ। তোমরা পল্লীগ্রামের লোক, তায় আবার তোমরা মূর্খ, তোমরা বলিতে পার যে ত্রিলোকের অধিপতিকে ধরিয়া লইয়া যাইবে। কিন্তু তোমাদের প্রাণে ভয় নাই? যাঁহার ইচ্ছায় এই ত্রিলোক নষ্ট হয়, আর তাঁহাকে এরূপ অপমান বাক্য বলিতেছ?

গোপী। আপনারা রাজাকে ভয় করেন, আমরাত ভয় করি না, কারণ আমাদের কোন প্রার্থনা নাই। আমরা জানি উহার যে ক্রোধ, সে হাস্যময়, তাহাতে ধার নাই। বিশেষতঃ তিনি নিজহাতে

একথা জননী মুখে আনিতে পারেন না, তাই যদি তাঁহার পুত্র মরিয়াছে, একথা বলিতে হয়, তবে হাত নাড়িয়া দেখান যে, সে চলিয়া গিয়াছে। জননীর নিকট পুত্র মরা সংবাদ যেরূপ হৃদ্‌বিদারক, শ্রীপ্রভুর নিকট "শ্রীকৃষ্ণ নাই" এই কথা তদপেক্ষা অনন্ত গুণে ক্লেশকর। তাই কৃষ্ণ আমার নাই, ইহা তাঁর মুখে আসিতেছে না, তাই আপনার হৃদয়ে হাত দিয়া সঙ্কেত দ্বারা জানাইতেছেন যে, কৃষ্ণ শূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। প্রভু সন্ন্যাস লইয়া গৃহ ত্যাগ করিলে, মহান্তগণ সকাল বেলা গঙ্গাস্নান করিয়া প্রভুর বাড়ী আসিয়া শুনিলেন, প্রভু কোথা চলিয়া গিয়াছেন। আর দেখেন যে, বাহির দুয়ারে মা শচী ঈশানের গায়ে হেলান দিয়া বসিয়া আছেন। তাহার পরে বাসু ঘোষের পদ শ্রবণ করুন :—

বাসুদেব ঘোষ ভাষা, শচীর এমন দশা,
মরা হেন রহিল পড়িয়া।
শিরে করাঘাত করি, ঈশানে দেখায় ঠারি,
গোরা গেল নদীয়া ছাড়িয়া॥

অর্থাৎ শচী মুখে বলিতে পারিলেন না যে, নিমাই তাঁহাকে ছাড়িয়া গিয়াছেন, তাই ঈশানকে সঙ্কেত দ্বারা বলিলেন, শুধু হাত নাড়িয়া আর মুখে বিষাদ মাখা লক্ষণ প্রকাশ করিয়া। সেইরূপ প্রভু কৃষ্ণ নাই দেখাইলেন। সরূপ, তাহাতে যেরূপ প্রভুর মনের হা হুতাশ ভাব বুঝিলেন পাঠক আমি তাহা কথায় কিরূপে তোমাকে বুঝাইব? প্রভু যখন কৃষ্ণকে সম্মুখে ভাবিয়া, আর তিনি রাগ করিয়াছেন ভাবিয়া, বলিতেছেন, "বন্ধু আমি তোমাকে দুটা মন্দ বলিয়াছি, তাহাতে রাগ করিও না, সে মুখে, মনে নয়, আমি কি তোমাকে রূঢ় কথা বলিতে পারি?" সে যেরূপ স্বরে ও যেরূপ মুখের ভঙ্গিতে বলিলেন, আমি তাহা কেবল 'ক''খ'য়ের সাহায্যে কিরূপে প্রকাশ করিব? তবে পাঠক! আমার কথা আপনারা বিশ্বাস করুন,

সাধন ভজন করুন, তবে ক্রমে আস্বাদ শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। ক্রমে তখন বুঝিবেন যে, প্রভুর গম্ভীরা লীলায় যে সুধা আছে, তাহা জগতে আর কোথাও নাই। মহাপ্রভু শুধু কথা দ্বারা মনের ভাব ব্যক্ত করেন নাই, করিতেও পারিতেন না। তাঁহার হৃদয়ের যে তরঙ্গ, তাহাতে ক খ গয়ের সমষ্টি ঠাই পাইবে কেন? সে তরঙ্গে তিনি নিজে ভাসিয়া যাইতেছেন, যাঁহারা নিকটে আছেন তাঁহারা ভাসিয়া যাইতেছেন, আর অদ্যাবধি ভাগ্যবান ভক্তগণ ভাসিয়া যাইতেছেন। তিনি সেই তরঙ্গ বুঝাইবার নিমিত্ত নানাবিধ হৃদ্‌বিদারক উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়েন। সে সমুদায় ভাব ব্যক্ত করিতে প্রভু সহস্র কলসী আনন্দ জল ফেলিয়াছেন, সমস্ত নিশি আনন্দে নৃত্য করিয়াছেন, কি ক্লেশে সহস্র বৃশ্চিক দষ্ট ব্যক্তির ন্যায় ধূলায় গড়াগড়ি দিয়াছেন, মুহুর্মুহু মূর্চ্ছা গিয়াছেন, আর প্রত্যেক মূর্চ্ছায় তাঁহার জীবন সংশয় বোধে ভক্তগণ হাহাকার করিয়াছেন, আমি তাহা শুধু কথা দ্বারা কিরূপে সম্যক প্রকারে ব্যক্ত করিব?

পাঠক মহাশয়! উপরের কথাগুলি মনে রাখিয়া, আমার এখন বাক্য দ্বারা যে গম্ভীরা বর্ণনা তাহা বিচার করুন। দিগ্‌দর্শন স্বরূপ আমরা এক নিশির গম্ভীরা লীলার কিঞ্চিত বর্ণনা করিব। ইহাতে পাঠক এই কয়েকটী বিষয় জানিতে পারিবেন। (১) সাধন ভজনের আরম্ভই বা কি, আর শেষই বা কি? (২) প্রভু আপনি আচরিয়া জীবকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহার অর্থ কি? (৩) প্রভু গম্ভীরায় যেরূপ জীবকে শিক্ষা দিলেন, তাহা কি উপায়ে স্বরূপ রামরায়ের হৃদয়ে হৃদয়ে প্রস্ফুটিত করেন। প্রথমতঃ পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রভু বক্তৃতা কি কথা দ্বারা মনের ভাব বড় ব্যক্ত করিতেন না, অতি গূঢ় যে রস তাহা ভাব দ্বারা ব্যক্ত করিতেন। যেমন নয়ন জল ফেলিয়া সহজে কোন কথা বলিলে এক ফল হয়, আর কান্দিয়া বলিলে আর এক ফল হয়। এখন প্রভুর এ ক্রন্দন কেমন?

প্রভুর জীবনে যে ভাবের লক্ষণ প্রকাশ পাইত তাহা সৃষ্টি ছাড়া। তোমার আমার কোন কারণে নয়নে জল উদয় হইতে পারে, কিন্তু প্রভুর নয়ন জল সে আর এক কাণ্ড। ভক্তগণ বর্ণনা করিয়াছেন যে, প্রভু এক একবারে শত কলসী নয়ন জল ফেলিতেন।

অবশ্য একথা শুনিলে সকলেরই মনে বোধ হইবে যে ইহা অত্যুক্তি। কিন্তু তাহা বড় একটা নয়। প্রভুর নয়ন দিয়া যে জল পড়িত, সে পিচকারীর ন্যায়। প্রভু যেখানে থাকিয়া রোদন করিতেন উহা কর্দ্দমময় হইত। একটী চিহ্ন দ্বারা প্রভুর নয়নে কত জল পড়িত তাহা পরিষ্কার জানা যায়। সমুদ্র তীরে প্রভু ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতেছেন, ভক্তগণ দর্শন করিতেছেন ও হস্তে তালি দিতেছেন। সে বালুকাময় ভূমি, সেখানে কর্দ্দমের সৃষ্টি হইয়াছে, এমন কি চিত্রের দ্বারা স্পষ্ট দেখা যায় যে, প্রভুর শ্রীপদ নৃত্য করিতে করিতে কর্দ্দমে ডুবিয়া যাইতেছে, আর সেই নিমিত্ত পায়ের দাগ পড়িয়া যাইতেছে।

হৃদয়ে অধিক পরিমাণে আনন্দ কি ভক্তির উদয় হইলে, নয়ন জলের সহিত সর্ব্বাঙ্গে পুলকের সৃষ্টি হয়। সচরাচর সে পুলক যেন ঘামাচির মত। কিন্তু প্রভুর যে পুলক তাহার এক একটী বদরী ফলের ন্যায়। অধিকন্তু প্রত্যেক পুলকের উৎপত্তি স্থান হইতে রক্তোদ্গম হইত।

প্রভু যখন মূর্চ্ছা যাইতেন, তখন ভক্তগণ হাহাকার করিয়া রোদন করিতেন, কারণ কাহারও জানিবার উপায় ছিল না যে, তিনি দেহে আছেন কি ছাড়িয়া গিয়াছেন। কোন এক ব্যক্তি কেবল মূর্চ্ছিত হইয়াছেন, তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে কিনা, উহা জানিবার এক উপায় নাসিকায় তুলা ধরিয়া দেখা উহা চলে কিনা। কিন্তু ঘোর মূর্চ্ছার সময় প্রভুর নাসিকায় তুলা ধরিলে উহা চলিত না। প্রভু এইরূপ কখন তিন প্রহর পর্য্যন্ত মৃত্যুর ন্যায় পড়িয়া থাকিতেন।

প্রভুর আনন্দে যে নৃত্য তাহা অবর্ণনীয়, সে নৃত্য দেখিলে ভক্তির উদয় হয়, নয়নে জল আইসে, ও আনন্দে সর্ব্বশরীর তরঙ্গায়িত হয়। প্রভু যখন হাস্য করিতেন, তখন কখন কখন এক প্রহরেও তাহা থামিত না। প্রভুর হাস্য চন্দ্র-কিরণের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। অতএব প্রভু আপনার মনের ভাব শুধু কথার দ্বারা ব্যক্ত করিতে যাইতেন, কিন্তু করিতে গেলে ফল তেমন হইত না। প্রভু আপনার মনের ভাব হাসিয়া, কান্দিয়া, নাচিয়া, মরিয়া প্রকাশ করিতেন।

কৃষ্ণ-বিরহ, কি দুঃখ তাহা তাঁহার মূর্চ্ছায় জানা যাইত। কৃষ্ণ-মিলন কি সুখ, তাহা তাঁহার নৃত্যে, প্রফুল্ল বদনে, চক্ষে ও হাস্যে প্রকাশ করিতেন।

প্রভুর শিক্ষার আর এক বিশেষত্ব এই ছিল যে, প্রভু যাহা শিক্ষা দিবেন তাহাকে আনিতেন, আনিয়া তাহার দ্বারা শিক্ষা দিতেন। যদি প্রভুর এরূপ ইচ্ছা হইত যে, সখ্যরস শিক্ষা দিবেন, তবে তাহা আপনি না করিয়া আপনি শ্রীদাম হইয়া অর্থাৎ তাহাকে আপনার দেহে আনিয়া শিক্ষা দিতেন। তখন তিনি শ্রীদাম হইতেন, মহাপ্রভু থাকিতেন না।

পূর্ব্বে বলিয়াছি এইরূপে প্রভু গম্ভীরায় জীবগণকে ভজন সাধনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত আপনি আচরিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। প্রভু যেন একজন অতিশয় অনুতপ্ত-বিষয়-মুগ্ধ-জীব হইয়া স্বরূপ রামরায়ের নিকট এই নিজকৃত শ্লোকটী পড়িলেন, যথা :—

অয়িনন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পদপঙ্কজস্থিতধূলী সদৃশং বিচিন্তয়।

ভাবার্থ এই, হে শ্রীকৃষ্ণ! আমি তোমার নিত্য দাস, ভব সাগরে হাবুডুবু খাইতেছি, কৃপা করিয়া চরণতরী দিয়া আমাকে উদ্ধার কর।

জীবের এইরূপে ভজন পথ প্রথম অবলম্বন করিতে হয়। প্রভু ইহা

কেন করিলেন? তিনি ত বিষয়ে মগ্নও নন, কৃষ্ণকেও ভুলেন নাই? তবে কিনা আপনি আচরিয়া জীবকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত।

আর একটী শ্লোকে প্রভু এই ভাব ও ঐ প্রার্থনাটী প্রস্ফুটিত করিলেন, যথা:—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

ভাবার্থ এই, একজন বিষয়মুগ্ধ জীবভাবে প্রভু বলিতেছেন, আমি ধন জন ইত্যাদি চাই না, আমাকে তোমার চরণের দাস কর!

সাধক এইরূপে আর একটু অগ্রবর্ত্তী হইলেন। তাঁহার পরে আর এক শ্লোকে বলিতেছেন, যথা:—

নাম্না মকারি বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তি।
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ। ইত্যাদি।

প্রভুর প্রার্থনা এই যে, হে ভগবান, তোমার বহু নাম আছে, সকল নামে তোমার শক্তি, এ নাম লইতে কোন নিয়ম কি বাধা নাই, অথচ আমার ইহাতে রুচি হইল না!

এখানে প্রভু ভজন কি তাহা আপনি আচরিয়া দেখাইতেছেন, সহজ ভজন শ্রীনাম গ্রহণ করা মাত্র, তাহা করিলে ক্রমে কৃষ্ণপ্রেম হইবে। অবশ্য যখন কৃষ্ণপ্রেম হইবে তখন সে ভজন আর এক প্রকার, সে ভজনে সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইবে। নামের কি শক্তি প্রভু এই শ্লোকে বর্ণিয়া বলিতেছেন:—

নয়নং গলদশ্রু ধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা, তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি।

হে ভগবান! কবে তোমার নাম শ্রবণ করিতে করিতে আমার নয়নে জল, অঙ্গে পুলক, কণ্ঠরোধ প্রভৃতি হইবে।

এই সমগ্র কৃষ্ণপ্রেমের লক্ষণ। প্রভু দেখাইতেছেন, নাম গ্রহণ করিলে এই সমুদায় ভাব হয়, অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেম হয়। তাহার পরে, যিনি কৃষ্ণপ্রেমরূপ মহাধন লাভ করিয়াছেন, তাঁহার কি কথা, তাহা প্রভু এই শ্লোকে ব্যক্ত করিতেছেন যথা :—

যুগায়িতং নিমিষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূণ্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ বিরহেন মে॥

এই অদ্ভুত শ্লোকের যে ভাব তাহা প্রকাশ করিতে গম্ভীরায় প্রভুর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সময় যাইত। এই বিরহ বেদনা উঘাড়িয়া বলিতে প্রভু প্রত্যেক নিশিতে শতবার প্রাণে মরিতেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়

প্রভুর অপ্রকট।

এইমত মহাপ্রভুর উৎকল বিহার।
উৎকল বিহার কথা অনেক বিস্তার॥

চৈতন্যমঙ্গল।

তাহার বহুদিন পূর্ব্বে শচীদেবী অদর্শন হইয়াছেন। প্রভুর তখন বয়ঃক্রম আটচল্লিশ বৎসর, শক ১৪৫৫। তাহার পরে শ্রবণ করুন, যথা চৈতন্যমঙ্গলে—

হেনকালে মহাপ্রভু কাশী মিশ্র ঘরে।
বৃন্দাবন কথা কহে ব্যথিত অন্তরে॥

সে আষাঢ় মাস। নবদ্বীপের ভক্তগণ যেরূপ যাইয়া থাকেন, সেইরূপ প্রভুকে দর্শন করিতে গিয়াছেন। প্রভু নিজ ভবনে বসিয়া, ও তাঁহাকে বেড়িয়া সকল ভক্তগণ বসিয়া আছেন। দুঃখের সহিত বৃন্দাবনের কথা বলিতে বলিতে প্রভু নীরব হইলেন। পরে দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া উঠিলেন। প্রভু উঠিলে সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পরে চলিলেন, কোন দিকে না মন্দিরের দিকে। কাজেই ভক্তগণ পশ্চাৎ চলিলেন।

নিশ্বাস ছাড়িয়া যে চলিল মহাপ্রভু।
এমত ভকত সঙ্গে নাহি হেরি কভু॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া জগন্নাথ দেখিবারে।
ক্রমে ক্রমে গিয়া উত্তরিলা সিংহদ্বারে॥

বলিলেন "তুমি যাও" সে একরূপ। কিন্তু "তুমি যাও" সে এরূপ কঠিনভাবে বলা যায় যে, শ্রোতা ভাবিবে বক্তার নিতান্ত ইচ্ছা সে যায়।

আর এক উপায় কবিতা দ্বারা। প্রকৃত কবিত্বের সাহায্যে কোনভাব বর্ণনা করিলে তাহা যেরূপে হৃদয়ে প্রবেশ করে, তাহা সামান্য ভাষায় হয় না।

আর এক উপায় সঙ্গীত দ্বারা। টড্ সাহেব বলিতেছেন, ভারতবর্ষীয় যে সঙ্গীত, তাহা দ্বারা মনুষ্যকে নানা ভাবে বিভাবিত করা যায়, হৃদয়ে দুঃখ কি আনন্দ উত্থিত করা যায়।

আর এক উপায় যাহাকে শাস্ত্রে অষ্ট সাত্বিক ভাব বলে। কিন্তু প্রভু দেখাইলেন যে, তাঁহার শরীরে অষ্ট কেন বহু অষ্ট সাত্ত্বিকভাব প্রকাশ পাইত। যথা হাস্য, রোদন, কম্প, স্বেদ, পরে মূর্চ্ছা ইত্যাদি।

প্রভুর যে মনের ভাব, তাহা, উপরে যতগুলি উপায় বলিলাম, ইহার সাহায্যে তিনি ব্যক্ত করিতেছেন। কিন্তু আমার, ভাষা কি বর্ণনা ছাড়া অন্য উপায় নাই। সুতরাং প্রভুর যে মনের ভাব, ইহা আমি কিরূপে অবিকল ব্যক্ত করিব? তবে স্বরূপের কৃপায় জগৎ এই ভাবের আভাস কিছু পাইয়াছেন। অর্থাৎ মহাপ্রভু যে রস দ্বারা জগত প্লাবিত করিয়া গিয়াছেন, সঙ্গীত ও কীর্ত্তন দ্বারা তাহার কিছু আভাস পাওয়া যায়। আপনারা ভক্তের মুখে কৃষ্ণনাম শুনিবেন, সে এক রকম, তাহার তুলনা নাই। আমি দেখিয়াছি একটি ভক্ত হাতে তালি দিয়া শুধু হরেকৃষ্ণ বলিয়া পদ গাইতেছেন, আর শ্রোতাগণ, কি ভক্ত কি অভক্ত, সকলেই বিগলিত হইতেছেন। কেন না, তাঁহার স্বরেতে তখন কি এক শক্তি প্রবেশ করিয়াছে।

প্রভু স্বরূপের পানে চাহিয়া, আপনার বুকে হাত দিয়া দেখাইলেন যে, তাঁহার হৃদয়ে কৃষ্ণ আর নাই। কথা এই, প্রভু স্বরূপকে বলিবেন যে, "কৃষ্ণ তাঁহার হৃদয়ে নাই, তিনি গিয়াছেন।" কিন্তু ইহা মুখে আইল না, কণ্ঠরোধ হইয়াছে, কি বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। পুত্র মরিয়াছে,

তাঁহাদের নেতা তাঁহারা সাধু ও ভক্ত। "তৃণাদপি" শ্লোকের দ্বারা তাঁহাদের প্রকৃতি গঠিত। তাঁহারা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ও সমাজে অসীম পদস্থ ব্রাহ্মণগণের সহিত পারিবেন কেন? সুতরাং রাজদ্বারে বৈষ্ণবগণ প্রপীড়িত হইতে লাগিলেন। জমিদারগণ দ্বারা, কি কাজীকে হাত করিয়া, ব্রাহ্মণগণ "বৈরাগী বেটাদের" টিকি কাটিতে লাগিলেন।

এই মাত্র বলিলাম, বৈষ্ণবগণের অস্ত্র শস্ত্র ভাল ছিল, সেইজন্য তাঁহাদের দল ক্রমে বাড়িতে চলিল। না, ক্রমে দেশে দুইটী দল পৃথক্ হইল। তখন বৈষ্ণবগণ এরূপ প্রবল হইয়াছেন যে, "বৈরাগী বেটারা" বলিয়া তাঁহাদিগকে একেবারে উপেক্ষা করিবার পথ রহিল না। কারণ বৈষ্ণবগণের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ প্রবেশ করিতে লাগিলেন। যাঁহাদিগকে শাক্তগণ পূর্ব্বে বহুমান্য করিয়াছেন, এখন তাঁহারা বৈষ্ণব হইয়াছেন বলিয়া এখন তাঁহাদিগকে "বৈরাগী বেটারা" বলিতে পারিলেন না। ক্রমে কিরূপ অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হইল, শ্রবণ করুন। বৈষ্ণবগণ ক্রমে ব্রাহ্মণের "ঠাকুর" উপাধি কাড়িয়া লইলেন, আর আপনাদিগকে বৈষ্ণব ঠাকুর বলিতে লাগিলেন। আর এ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণগণ কেবল যে পতিতপাবন ছিলেন, তাহা আর বৈষ্ণবগণ স্বীকার করিতে চাহিলেন না, তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত "বৈষ্ণব গোসাঞির" নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। যথা পদ :—

আইজ আনারে কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর।
তোমা বিনা গতি নাই ইত্যাদি।

ঝড়ু ঠাকুর ভুঁয়েমালি, অস্পৃশ্য জাতীয়, ভক্তির বলে তিনি হইলেন ঝড়ু ঠাকুর, আর বড় বড় ভক্তগণ তাঁহার প্রসাদ পাইতেন।

যখন রামচন্দ্র কবিরাজ বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, তখন শাক্তগণ বড় ক্লেশ পাইলেন। কারণ রামচন্দ্র কবিরাজ একজন পদস্থ ব্যক্তি, অতি

জীবের কথা ভুলেন নাই। এই কথা বলিয়া প্রভু কি করিলেন শ্রবণ করুন, যথা চৈতন্যমঙ্গলে—

এ বোল বলিয়া সেই ত্রিজগত রায়।
বাহু ভিড়ি আলিঙ্গনে তুলিল হৃদয়॥

অর্থাৎ পাণ্ডা ঠাকুর দেখিতেছেন যে, প্রভু জগন্নাথকে এই নিবেদন করিয়া তাঁহাকে বুকে তুলিয়া লইলেন। পরে শ্রবণ করুন, যথা চৈতন্য মঙ্গলে ঃ—

এ বোল বলিয়া সেই ত্রিজগত রায়।
বাহু ভিড়ি আলিঙ্গনে তুলিল হৃদয়॥
তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলেন আপনে॥

পাণ্ডা ঠাকুর সম্বন্ধে চৈতন্যমঙ্গল বলিতেছেন যথা—

গুঞ্জা বাড়ীতে ছিল পাণ্ডা যে ব্রাহ্মণ।
কি কি বলি, সত্বরে সে আইল তখন॥
বিপ্রে দেখি ভক্তে কহে শুন হে পড়িছা।
ঘুচাও কপাট প্রভু দেখি বড় ইচ্ছা॥

উপরে যে "বিপ্রে দেখি" কথা আছে উহার অর্থ যে বিপ্রকে তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন এমন নয়, কারণ বিপ্র মন্দিরের মধ্যে। ইহার অর্থ যে বিপ্রের চিৎকার ধ্বনি শুনিয়া ভক্তগণ বলিলেন, "পড়িছা ঠাকুর শীঘ্র দ্বার উন্মোচন কর, প্রভুকে দেখিব।"

তখন পড়িছা দ্বার খুলিলেন, খুলিয়া বলিতেছেন, যথা চৈতন্যমঙ্গলে—

ভক্ত ইচ্ছা দেখি কহে পড়িছা তখন।
গুঞ্জা বাড়ীর মধ্যে প্রভু হ'লো অদর্শন॥
সাক্ষাতে দেখি গৌর প্রভুর মিলন।
নিশ্চয় কহিয়া কহি শুন সর্ব্বজন॥

এক দাসখত লিখিয়া আসিয়াছেন। তাহাতে লেখা আছে যে, আমাদের যে প্রধানা শ্রীমতী, তাঁহার নিঃস্বার্থ প্রেমের জন্য তিনি তাঁহার দাস হইলেন। সেই খতের বলে, আমরা শ্রীমতীর দাস কে ধরিয়া লইয়া যাইব।

শ্রীকৃষ্ণ। বোধ হয় এ তোমরা মিথ্যা কথা বলিতেছ। আমি দাসখত লিখিয়া দিয়াছি, ইহা ত আমার স্মরণ হয় না।

গোপী। এই দেখ তোমার দাসখত। ইহাতে তোমার স্বাক্ষর আছে।

কৃষ্ণ। তোমরা যে মিথ্যাবাদী তাহা এই এক কথায় ধরা পড়িয়াছ। আদৌ আমি দস্তখত করিতে জানি না। সে অতি লজ্জার কথা, সন্দেহ নাই। কিন্তু লেখা পড়া শিখিতে আমার সুবিধা হয় নাই। বৃন্দাবনে গরু রাখিতাম, পাঠশালায় যাইবার সময় কোথা? তবু একবার গিয়াছিলাম, কিন্তু বেশী দূর শিখিতে পারি নাই। প্রথম আখর ক হইতে বেশ শিখিলাম, তাহার পরে যখন ধ য়ে আইলাম, তখনি গণ্ডগোল বাধিয়া গেল। একটার আঁকড় ডাহিনে, একটার বাঁয়ে, এই আমার গোল বাধিয়া গেল। কোন ক্রমে ঠিক করিতে পারি না, কোনটা "ক," কোনটা "ধ"।

তাহার পরে এখন রাজা হইয়াছি, লেখা পড়া শিখিবার আর এখন প্রয়োজন নাই।

কৃষ্ণ যাত্রার, উপরে যে কাহিনী বলিলাম, তাহার অভিনয় হইয়া থাকে। কৃষ্ণ উপরের কথাগুলি অতি গাম্ভীর্য্যের সহিত বলেন। তিনি বলেন কিনা, "আমি শ্রীভগবান, ক আর ধ ঠিক করিতে না পারিয়া বর্ণমালা শিখিতে পারিলাম না। আর তখন দর্শক সভাসদগণ হাস্য রসে ও ভক্তিতে মুগ্ধ হয়েন, অথচ শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহাদের অতিশয় আকর্ষণ বাড়ে।

এই কাহিনীর শেষ বলিতে ইচ্ছা করিতেছে। গোপীগণের সহিত

অর্থাৎ গুণ্ডাবাড়ীর মধ্যে থাকিয়া আমি সমুদায় দেখিলাম, প্রভুকে দেখিলাম ও স্বচক্ষে তাঁহাকে জগন্নাথের সহিত মিলন হইতে দেখিলাম।

এ বোল শুনিয়া ভক্ত করে হাহাকার।

এ কথা শুনিয়া কেহ মরিলেন, কেহ মরিতে মরিতে বাঁচিয়া উঠিলেন। যাঁহারা বাঁচিয়া উঠিলেন, তাঁহারা নীলাচল ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে গমন করিলেন।

প্রভুর সঙ্গোপন জানিয়া ভক্তগণের কি দশা হইল তাহা আর বলিব না, বলিবার সাধ্যও নাই। আমাদের প্রভু যাইবার বেলা আমাদিগকে জগন্নাথ দেবের হাতে হাতে সঁপিয়া দিয়া গিয়াছেন। সঁপিয়া দিয়া আবার সেই জগন্নাথের হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন। আমাদের প্রভু কি সত্যই চলিয়া গিয়াছেন? তিনি যাবেন কোথায়? গেলে আমাদের উপায়? আমরা যে বড় বড় পরমেশ্বর, বড় বড় দেব দেবী ত্যাগ করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে মাথা বেচিয়াছি, তিনি যদি চলিয়া যান তবে আমরা কোথায় যাইব? জীবনে অনেক সুখ ভোগ করিয়াছি, দুঃখও পাইয়াছি, দুঃখও মনে নাই, সুখও মনে নাই। এখন মরণ সময় আসিতেছে, এখন শ্রীগৌরাঙ্গ তুমি যদি যাবে তবে আমাদের কি থাকিবে? *

* কোন স্থানে দেখিতে পাই যে, ভক্তগণ সকলে মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সকলে ক্রমে চেতন পাইলেন, কেবল স্বরূপ নয়। দেখা গেল তাহার হৃদয় ফাটিয়া প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে। আমাদের কঠিন হৃদয় ফাটিবার দ্রব্য নয়।

ষোড়শ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব।

ভারতবর্ষে যেরূপ অধ্যাত্ম বিদ্যার চর্চ্চা হইয়াছে, এরূপ আর কোথায়ও হয় নাই। ইহা কেবল ব্রাহ্মণ দ্বারা হয়, সুতরাং ব্রাহ্মণগণের নিকট ভারতবর্ষীয়গণের ও জগতের যে ঋণ তাহা অশোধনীয়। তাঁহাদের সহিত ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতির এইরূপ বন্দোবস্ত ছিল। তাঁহারা সকলের জন্য জ্ঞান ও ধর্ম্ম চর্চ্চা করিবেন, অন্যান্য সকলে তাঁহাদিগকে পালন করিবেন। ইহাতে এই হইল যে, ব্রাহ্মণগণ উন্নতি করিতে লাগিলেন, কিন্তু অন্যান্য জাতীয়গণ উন্নতি না করিয়া পড়িয়া রহিল, বরং ক্রমেই অধঃপাতে যাইতে লাগিল।

মহাপ্রভুর পরে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ বৈষ্ণব ধর্ম্মের উন্নতি করিতে লাগিলেন। তখন বৈষ্ণবগণ শাক্ত অপেক্ষা প্রবল হইয়াছেন, কারণ তাঁহাদের অস্ত্র শস্ত্র ভাল, ও নূতন জীবন। কিন্তু আবার বৈদিক ধর্ম্মের আধিপত্য বৃদ্ধি ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের পতন হইয়াছে। যখন গৌড়ে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রবল হইল, তখন অবশ্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ বড় ভয় পাইলেন। তাঁহারা দেখিলেন, সমাজে তাঁহাদের যে পদ ছিল, তাহা উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ যে ধর্ম্ম শিক্ষা দিলেন, তাহা বাক্যজালে যিনি যতরূপ আবরণ করেন করুন, কিন্তু তাহার স্থূল মর্ম্ম এই যে, শ্রীসচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীভগবান্ জীবের একমাত্র উপাস্য, অন্যান্য দেবদেবী ভজনে জীবের পুরুষার্থ লাভ হয় না, এবং এই শ্রীভগবানকে পাইবার একমাত্র উপায় প্রেম ও ভক্তি। মন্ত্র, তন্ত্র, যাগ ও যজ্ঞে তাঁহাকে পাওয়া যায় না।

কিন্তু ব্রাহ্মণগণের, জীবকে শিক্ষা আর একরূপ। যাগ যজ্ঞ কর, শীতলা মনসা সকলকে পূজা কর। আর এই সমুদয় কার্য্য ব্রাহ্মণ দ্বারা করাইও, তোমরা ইহাতে অধিকারী নও। এইরূপ সকলের ব্রাহ্মণকে কর দেওয়া, ধর্ম্ম চর্চ্চার প্রধান অঙ্গ হইল। এইরূপে ব্রাহ্মণগণ অন্যান্য জাতির নিকট তাহাদের ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্ব হইতে কর আহারণ করিতে লাগিলেন। গর্ভে প্রবেশ করিলে পঞ্চামৃত, তারপরে জীবের জন্ম হয়। জন্ম হইলে ষষ্ঠী, তার পরে মৃত্যু হয়। তাহার পর শ্রাদ্ধ। যদিও সে মরিয়া গেল, তবু তাহার কর দেওয়া স্থগিত হইল না। বার্ষিক শ্রাদ্ধ আছে, সপিণ্ডকরণ আছে ইত্যাদি। এইরূপে অন্যান্য জাতি জন্মের পূর্ব্ব হইতে মরণের বহুদিন পর পর্য্যন্ত কর দিতে লাগিলেন। এরূপ অদ্ভুত কর স্থাপন জগতে দেখা যায় না।

অতএব জীবের ধর্ম্ম কি রহিল, না ব্রাহ্মণকে কর দেওয়া। দোল দুর্গোৎসব ত আছেই, ইহা ছাড়া তেত্রিশ কোটী দেবতার পূজা। আর পূজা কিনা ব্রাহ্মণকে কিছু দেওয়া। উত্তম আহার দেওয়া, দক্ষিণা, চাউল, কাপড়, কড়ি ইত্যাদি।

আবার, গুরুরূপে ব্রাহ্মণগণ কর্ণে মন্ত্র দেন। শিষ্য, তাঁহার চিরকালের সম্পত্তি হইল। গুরুর আর কিছু করিতে হয় না। শিষ্যের বাড়ী গমন করিলে, শিষ্যের গোষ্ঠীবর্গ চরণে মস্তক কুটিবে, আর তাহার অর্থ থাকুক বা না থাকুক, গুরুকে অর্থ দিতে হইবেই হইবে। এই যে নানাবিধ উৎসব ও দেবদেবীর পূজা, ইহা সমুদয় ব্রাহ্মণগণের হস্তে, অন্যান্য জাতি কেবল তাহার ব্যয় বহন করিতেন মাত্র।

যখন হিন্দুগণের এরূপ অবস্থা, যখন আচার্য্যগণ এইরূপ বিষয় লোভে জ্ঞানশূন্য হইয়া শিষ্যগণের বিত্ত অপহরণ করিতে লাগিলেন,—যখন গুরুগণ পরকালে ভাল হইবে, এই স্তোত বাক্য বলিয়া নানাবিধ উৎসব

সৃষ্টি করিয়া, শিষ্যের নিকট বঞ্চনা পূর্ব্বক অর্থ লইতে লাগিলেন,—যখন এইরূপে ভগবানের নাম লইয়া, আমি পতিতপাবন এইরূপ ভাণ করিয়া, আচার্য্যগণ সচ্ছন্দে বিষয় বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন,—যখন ব্রাহ্মণ নির্ভয়ে বলিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদের পাদোদক পানে পাপের শান্তি হয়, তখন শ্রীভগবান নবদ্বীপে উদয় হইলেন।

যদি আচার্য্য ভাল থাকেন, শিষ্য মন্দ হইলেও তত ক্ষতি হয় না। কিন্তু যখন বিষয় লোভে আচার্য্যগণ, শিষ্যকে গলে বান্ধিয়া আপনারা নরককুণ্ডে ঝম্প দিতে লাগিলেন, তখন শ্রীভগবান আর থাকিতে না পারিয়া, কৃপার্ত্ত হইয়া, আচার্য্য ও সাধারণ জীবগণের উদ্ধারের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইলেন।

শ্রীভগবান্ স্বয়ং প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে জীবগণকে ধর্ম্ম উপদেশ দিতে লাগিলেন। সে ধর্ম্ম ব্রাহ্মণগণের ভাল লাগিল না।

শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মের সার মর্ম্ম পূর্ব্বে বলিয়াছি, আবার বলি। শ্রীভগবান সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, তাঁহাকে কেবল প্রেম ভক্তিতে পাওয়া যায়। অতএব শ্রীভগবদ্ভক্তি ও প্রেমেই পরম পুরুষার্থ, আর শ্রীভগবদ্ভক্তই মুক্ত জীব।

এখন প্রেম ভক্তি যদি শ্রীভগবচ্চরণ লাভের একমাত্র উপায় হইল, তবে যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি নানাবিধ উৎসব পার্ব্বণ সমুদায় গেল। কারণ সে সমুদয়ে প্রেম ভক্তি নাই। আর তাহা হইলে ব্রাহ্মণগণ যে, অনায়াসে অর্থ উপার্জ্জন দ্বারা দিন যাপন করিতেছিলেন, তাহা সমুদয় গেল।

ব্রাহ্মণগণ হাহাকার করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ আচার্য্যগণ যে, এইরূপে আপনাদের ও তাঁহাদের সর্ব্বনাশ করিয়া শুধু অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, এরূপ নয়। সমাজে অপরিসীম সম্মান লইতেন। তাঁহারা অন্যান্য বর্ণের নিকট কিরূপ সম্মান দাবী করিতেন, তাহা সকলেই জানেন। যিনি ব্রাহ্মণ তিনি গুরু, বিপ্রপাদোদক পান করিলে সমস্ত আপদ নষ্ট হয় ইত্যাদি।

ব্রাহ্মণকে মারিতে নাই, ব্রাহ্মণ অবধ্য। ব্রাহ্মণকে উপবাসী রাখিয়া আপনারা ভোজন করিতেন নাই।

কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মে ব্রাহ্মণগণের শুধু উপার্জ্জনের পথ গেল, তাহা নহে, সমাজে সম্মান যাইবার যো হইল। যে হেতু ব্রাহ্মণগণ চিরদিন শিক্ষা দিয়া আসিতেছিলেন যে, ব্রাহ্মণই গুরু, আবার গৌরাঙ্গের উপদেশ হইল যে, যে ভক্ত সেই কেবল পূজ্য। ভক্ত যদি চণ্ডাল হয়, তবু সে অভক্ত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই আমাদের প্রভুর শিক্ষা। কাজেই ব্রাহ্মণগণ একেবারে মারমার কাটকাট করিয়া উঠিলেন।

স্বার্থ লইয়া যেখানে এরূপ টানাটানি, সেখানে একটি ব্রাহ্মণও বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেন না। কিন্তু তবু অনেকে স্বার্থ ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিলেন। মনে ভাবুন ঠাকুর মহাশয় নরোত্তম বাড়ী প্রত্যাগমন করিলে, বলরাম মিশ্র তাঁহার নিকট মন্ত্র দীক্ষা লইলেন। এরূপ সমাজ-বিরোধী কার্য্য তিনি কেন করিলেন? ঠাকুর মহাশয় কায়স্থ, তাঁহার নিকট বলরাম মিশ্র মন্ত্র লইলে, সমাজে মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। এইরূপ গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী অদ্বিতীয় পণ্ডিত, ঠাকুর মহাশয়ের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। করিয়া সমাজে তিনি, তাঁহার স্ত্রী ও বিধবা কন্যা বহুতর উৎপীড়িত হইলেন। এ সমুদয় সমাজ-সম্মত পথ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা ওরূপ ঘোর বিপরীত পথে কেন চলিলেন?

কেন চলিলেন, তাহার কারণ বলিতেছি। শেষ ভালই ভাল, পরকালের ভালই প্রকৃত ভাল, ইহকালের সম্পত্তি কিছুই নহে। তাঁহারা দেখিলেন, যদিও তাঁহারা ব্রাহ্মণ, তবুও তাঁহারা পতিত। অন্যকে পথ দেখান অনেক দূরের কথা, আপনারাই পথ না পাইয়া গর্ত্তে পড়িয়া হাবুড়ুবু খাইতেছেন। আপনারা গর্ত্তে হাবুড়ুবু খাইতে খাইতে অন্যকে উদ্ধার করিতে যাওয়া যেরূপ হাস্যকর, তাহাদের পক্ষে আপনারা অসিদ্ধ সত্ত্বেও কেবল

ব্রাহ্মণ বলিয়া শিষ্যের উদ্ধারের ভার ঘাড়ে লওয়া, সেইরূপ হাস্যকর। তাঁহারা ভাবিলেন এইরূপ অন্ধ জীবকে ষষ্ঠী মাখাল পূজা করাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করা ঘোর বঞ্চনা। এই সমস্ত ভাবিয়া তাঁহারা অন্যকে বঞ্চনা করিয়া অর্থ উপার্জ্জনের পথ ছাড়িয়া দিয়া, আপনারা যাহাতে উদ্ধার হয়েন তাহাই করিলেন। এরূপ সমাজবিরুদ্ধ পথ অবলম্বন করায় তাঁহাদের প্রতি সমাজে উৎপীড়ন হইল, কিন্তু সে কয়দিনের জন্য? অন্তিমে তাঁহারা নিত্য-ধামে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহকে চিরদিনের জন্য পাইবেন, এই আশায় সমুদায় সহিয়া থাকিলেন।

এইরূপ গৌরাঙ্গের ধর্ম্ম প্রচারারম্ভ হইলে, ব্রাহ্মণ যাঁহারা নহেন, তাঁহারা জয় জয় করিয়া উঠিলেন, কারণ তাঁহারা ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক পদতলে দলিত হইতেছিলেন। যাঁহারা ব্রাহ্মণ, তাঁহারা মার মার করিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাঁহারা ধর্ম্ম-ভীতু, তাঁহারা গৌরাঙ্গের মত অবলম্বন করিলেন। বলা বাহুল্য যে, এরূপ ধর্ম্মভীতু লোকের সংখ্যা অতি অল্প।

যত দিবস বৈষ্ণবগণ দুর্ব্বল ছিলেন, তত দিবস শাক্তগণ ঘৃণা করিয়া তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিতেন না। কিন্তু বৈষ্ণবগণ ক্রমে প্রবল হইতে লাগিলেন, আর তখন ব্রাহ্মণগণ তাহাদিগকে জব্দ করিবার যতরূপ পথ আছে, ক্রমে ক্রমে সমুদয় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। কায়স্থ ও বৈদ্যগণ, ব্রাহ্মণগণের সহিত রহিয়া গেলেন। এইরূপ দুইটী দল হইল। বৈষ্ণবগণের দলে রহিলেন, অল্প সংখ্যক ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য ও সমুদয় নবশাখগণ। শাক্তগণের দলে রহিলেন প্রায় সমুদয় ব্রাহ্মণ, প্রায় সমুদায় কায়স্থ, প্রায় সমুদায় বৈদ্য।

নবশাখগণ ব্রাহ্মণের প্রধান সহায়, ব্যবসা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, তাঁহারা নিরীহ ভাল মনুষ্য। যে সমস্ত বৈষ্ণব আচা[illegible]

ভক্তগণ চিন্তিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় অভ্যন্তরে হঠাৎ গোলমাল শুনিতে পাইলেন। সে শব্দ শুনিয়া সকলে বুঝিলেন কি মহা-সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

গুঞ্জা বাড়ীতে তখন একজন পাণ্ডা ছিলেন। যদিও ভক্তগণ বাহির হইতে কিছু দেখিতে পাইতেছেন না, কিন্তু সেই পাণ্ডাঠাকুর গুঞ্জাবাড়ী হইতে প্রভুকে বেশ দেখিতে পাইতেছেন। ইহার মধ্যে প্রভু একটী কাণ্ড করিলেন, কি তাহা পরে বলিতেছি। সেই কাণ্ড দেখিয়া পাণ্ডাঠাকুরাণী দৌড়িয়া আইলেন, আসিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সেই চীৎকার শুনিয়া বাহিরের ভক্তগণ তাঁহাকে দ্বার উন্মোচন করিতে বলিলেন। দ্বার খোলা হইলে সেই পাণ্ডাঠাকুর নিম্নোক্ত কাহিনী বলিলেন।

তিনি বলিলেন, প্রভু ভিতরে প্রবেশ করিয়া জগন্নাথের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে নিবেদন করিতে লাগিলেন। যথা শ্রীচৈতন্য মঙ্গলে :—

আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে।
নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিশ্বাসে॥

অর্থাৎ প্রভু মন্দির অভ্যন্তরে জগন্নাথের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া, কাতর স্বরে দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। প্রভু কি বলিলেন শ্রবন করুন। যথা চৈতন্যমঙ্গলে :—

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি যুগ আর।
বিশেষতঃ কলি যুগে সঙ্কীর্ত্তন সার॥
কৃপা কর জগন্নাথ পতিত পাবন।
কলিযুগ আইল এই দেহত স্মরণ॥

প্রভু বলিতেছেন, "সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি, এই কলি যুগের একমাত্র ধর্ম্ম সঙ্কীর্ত্তন। হে জগন্নাথ! তুমি পতিত পাবন। এই কলিযুগ আসিয়াছে। এখন তুমি কৃপা করিয়া জীবকে আশ্রয় দাও।" প্রভু তখনও

সপ্তদশ অধ্যায়।

অবতার-তত্ত্ব।

আমরা চারিটী নূতন ধর্ম্ম প্রচারকের কথা শুনিয়া থাকি, যাঁহাদিগকে মোটামুটি লোকে অবতার বলে। প্রথম বুদ্ধ, দ্বিতীয় যীশু, তৃতীয় মহম্মদ ও চতুর্থ গৌরাঙ্গ। শেষোক্ত বস্তু যে অবতাররূপে পূজিত তাহা বিদেশীয়গণ জানিতেন না। ব্লাবাটস্কি প্রথম তাঁহার গ্রন্থে তাঁহাকে শেষ অবতার বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ইহা হইতে আমরা শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিলাম, কারণ তিনি লীলাময় ঠাকুর রূপে অবতীর্ণ হয়েন, ধর্ম্ম প্রচারক ছিলেন না।

প্রচার কার্য্যে বুদ্ধ ও তাঁহার গণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছিলেন। যেহেতু এই বৌদ্ধধর্ম্ম আমেরিকা পর্য্যন্ত গিয়াছিল। আমরা শুনিয়া থাকি যে কলম্বস প্রথম আমেরিকা আবিষ্কার করেন, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের চিহ্ন আমেরিকায় অনেক স্থানে দেখা যায়। তাহাতে বোধ হয় বৌদ্ধগণ তাঁহার পূর্ব্বে আমেরিকায় গমন করেন।

বৌদ্ধধর্ম্ম শ্রীভগবানকে স্বীকার করেন না। অন্য কয়েকটী অবতার ভগবানে ভক্তি শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। খ্রীষ্টিয়ানগণ বলেন যে, যীশু শ্রীভগবানের একমাত্র পুত্র। মহাম্মদ বলেন যে, যীশুও অবতার তিনিও অবতার, তবে তিনি যীশু অপেক্ষা বড়, আর তিনিই শেষ অবতার, ভগবান পৃথিবীতে আর অবতার পাঠাইবেন না। কিন্তু বৈষ্ণবগণ বলেন (গীতায় "যদা যদাহি" শ্লোক দেখ) যে, যেখানে ধর্ম্ম গ্লানি হয় সেখানে অবতার যাইয়া অধর্ম্মকে অপদস্থ করিয়া ধর্ম্মকে পদস্থ করেন।

রামচন্দ্র কবিরাজের অপূর্ব্ব উত্তর বিচার করুন। রামচন্দ্র বলিতেছেন, আমরা দেখিতেছি শ্রীকৃষ্ণকে প্রহ্লাদ, ধ্রুব প্রভৃতি ভজন করিয়া জগতে ও দেবগণের মান্য হইয়াছেন। কিন্তু শিব, ব্রহ্মার ভক্তগণ, যথা, রাবণ, বাণ প্রভৃতি জগতের বৈরী ও দেবগণের অপ্রিয় হইয়াছেন, অতএব শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করাই শ্রেয়ঃ, মহাদেবকে নয়।

শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মের এই স্বাভাবিক চরম। শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মের বীজ একটি। সেটি এই যে," শ্রীপূর্ণব্রহ্ম সনাতন, জীবের প্রতি কৃপার্ত্ত হইয়া নবদ্বীপে শচীর উদরে জন্ম লইয়া জীবকে উপদেশ, জীবের সঙ্গে সঙ্গ ও সমাজে সামাজিকতা, আত্মীয়তা, এমন কি জীবের মুখ চুম্বন করিয়াছিলেন।

এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের বীজ। ইহাতেই চৌষট্টি রস আছে। যাঁহার হৃদয়ে এই বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে, তাঁহাদের আর কোন শাস্ত্রের প্রয়োজন নাই।

এই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া অভিনব মধু হইতেও মধু, সরল হইতে সরল ধর্ম্মের সৃষ্টি হইল। ইহাতে যাগ যজ্ঞ দেবদেবী পূজা, কি কৌলিন্যের ও জাতীয় ও বংশের গৌরব কিছু থাকিল না।

এইরূপে পরিশেষে শাক্তগণ আলোচাল ও কলা লইয়া থাকিলেন। বৈষ্ণবগণ প্রেম-ভক্তি লইয়া থাকিলেন। বৈষ্ণবগণের সম্পূর্ণ জয় হইল।

কিন্তু এখন সেই বৈদিক ধর্ম্ম আবার সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। আর নয়নধারা নাই, বাহু তুলে নৃত্য নাই, আর ধূলায় গড়াগড়ি নাই। প্রভুর অবতারের পূর্ব্বে যেরূপ অবস্থা ছিল তাহাই হইতেছে। এখন আর শাক্ত বৈষ্ণবে বড় প্রভেদ নাই। শাক্তের ধর্ম্মের সার আলোচাল কলা, বৈষ্ণব ধর্ম্মের সারও তাহাই হইয়া দাঁড়াইতেছে। বৈষ্ণবগণও ক্রমে কর্ত্তব্যে শাক্ত হইতেছেন।

বৈষ্ণবগণ প্রবল হইলে শাক্তগণের সহিত তাঁহাদের বিবাদ আরম্ভ হইল। পূর্ব্বে বৈষ্ণবগণ দুর্ব্বল বলিয়া সমুদয় সহিয়া থাকিতেন। তাঁহারা বলবান হইলে, ক্রমে দুই একটী কথা বলিতে লাগিলেন, ক্রমে এই বিবাদ হাস্যরসের প্রস্রবন হইল। হিন্দু ও মুসলমানদের বিবাদের কথা সকলে জানেন। হিন্দু কলা-পাতার যে পৃষ্ঠে ভোজন করেন, মুসলমানগণ তাহা উল্টাইয়া লইলেন। হিন্দুর গাড়ু, মুসলমানের বদনা। হিন্দু গোঁফ রাখেন, দাড়ি ফেলেন, মুসলমানগণ গোঁফ ফেলেন, দাড়ি রাখেন। এইরূপে বৈষ্ণব বলেন তরকারী বানান, শাক্ত বলেন তরকারী কুটা। দাশরথী রায় আমোদ করিয়া এই কোন্দল বর্ণনা করিয়াছেন। যথা, বৈষ্ণব কালীতলার হাটে যান না, শাক্ত কৃষ্ণনগরের বাজারে যান না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সময়কার একটী ঐতিহাসিক কাহিনীর দ্বারা প্রকাশ পাইবে যে, প্রভুর ধর্ম্ম তখন ভারতবর্ষে লোকের চিত্তে কিরূপ অধিকার করিয়াছিল। জয়পুরের সভাপণ্ডিত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্য দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত পরকীয়া রসতত্ত্ব আক্রমণ করিলেন। করিয়া স্বকীয় মত স্থাপন করিবার চেষ্টা করিলেন। বিচারে পশ্চিম দেশস্থ পণ্ডিতগণ তাঁহার নিকট পরাস্ত হইলেন। কিন্তু জয়পুরের রাজা ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহাকে বঙ্গে পাঠাইলেন। আসিবার সময় তিনি পথে প্রয়াগ ও কাশীর বৈষ্ণবগণকে পরাস্ত করিয়া পরে শ্রীনবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণদেব নবদ্বীপে জয়পত্র চাহিলেন। কিন্তু বিনা বিচারে নদীয়াবাসী উহা দিতে সম্মত হইলেন না। পরে তখনকার নবাব জাফরখাঁর আনুকুল্যে এক প্রকাণ্ড সভা হইল, সেই সভায় কৃষ্ণদেব, রাধামোহন ঠাকুরের নিকট পরাস্ত হইলেন, ইনি আচার্য্য প্রভুর প্রপৌত্র বিখ্যাত পদকর্ত্তা ও পদ সংগ্রাহক।

এ সম্বন্ধে যে দলিলের প্রতিলিপি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে গোস্বামীগণের মধ্যে শান্তিপুর, নবদ্বীপ, খড়দহ, বৰ্দ্ধমান, কাটোয়া, কানাই-

মথুরার রাজা শ্রীকৃষ্ণের যখন এইরূপ বাক্য বিতণ্ডা হইতেছে, তখন কুব্জা তাঁহার রাণী, তাঁহার বামে বসিয়া এ সমুদয় শুনিতেছেন। তিনি আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবতী ভাবিতেন; কারণ তিনি রাজরাজেশ্বরের পত্নী। সুতরাং যখন মলিনবসনা গোপীগণ আসিয়া কৃষ্ণের সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন, তখন তিনি আশ্চর্য্য হইলেন। ভাবিলেন মহারাজের এই সমুদয় নীচ লোকের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করা তাঁহার উচ্চপদের উপযোগী নয়। কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি, শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় যে, মথুরাবাসিগণকে গোপীগণের মহিমা দেখাইবেন। প্রকৃতই কুব্জা উহা দেখিয়া একেবারে মোহিত হইলেন, এমন কি তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হইল। তখন তিনি সিংহাসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া কৃষ্ণের অগ্রে দাঁড়াইয়া করজোড়ে বলিতে লাগিলেন, যথা—পদ ঃ—

এই নিবেদন, শ্রীনন্দের নন্দন, ও বংশীবদন।
যে ধনে পিয়াসী আমি, সে ধন কর বিতরণ॥
কিবা তন্ত্র কিবা মন্ত্র, জানি না হে রাধাকান্ত,
এ দাসীরে না হইও ভ্রান্ত।
কোরো নাহে অন্য যুক্তি, চাইনা কিছু মোক্ষ মুক্তি,
ও চরণে থাকে ভক্তি সেবাতে নিযুক্ত মন।
যেন, জন্ম হয় গোপকুলে, বৃন্দাবনে বসতি।
রাধাকৃষ্ণ মনাভীষ্ট হইনা যেন বিস্মৃতি॥
কিঞ্চিত করি যাচিঞা, তব নেত্র ভ্রুভঙ্গে
চিরদিন থাকি যেন সঙ্গে॥
শ্রীরাধারে লয়ে বামে, বসবে যখন নিধুবনে,
কৃপা করি এ অধিনীর মাথায় দিও শ্রীচরণ॥

মথুরার রাজা কৃষ্ণ; দৈবকী নন্দন, দণ্ডধারী বলিয়া বিখ্যাত, কিন্তু

ডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানের গোস্বামীদিগের স্বাক্ষর দৃষ্ট হয়। তাঁহারা বলিলেন "আমরা শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মতাবলম্বী, অতএব বিচারে যে ধর্ম্ম স্থাপ্য হয়, তাহাই লইব। এইমত প্রতিজ্ঞা করিলাম।" এই মর্ম্মে শ্রীযুক্ত নবাব জাফর খাঁ সাহেবের নিকট দরখাস্ত হইল।

তিঁহো কহিলেন, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিনা তজ্‌বিজে হয় না। অতএব বিচার কবুল করিলেন। সেইমত সভাসদ্‌ হইল শ্রীপাট নবদ্বীপের কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্য, তৈলঙ্গ দেশের রামজয় বিদ্যালঙ্কার, সোনগর গ্রামের রামরাম বিদ্যাভূষণ ও লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য্য গয়রহ, কাশীর হরানন্দ ব্রহ্মচারী ও মবনানন্দ ভট্টাচার্য্য সাং মইনা। *

তখনকার বিবাদের অবস্থা আর একটা কাহিনী দ্বারা লোকে বুঝিতে পারিবেন। পুঁটীয়া রাজধানীতে রাজা রবীন্দ্রনারায়ণের বাড়ীতে দুইজন বৈষ্ণব অতিথি হইলেন। রাজা ভাটপাড়ার ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণের শিষ্য, ঘোর শাক্ত। বৈষ্ণবগণ অতিথি হইলে পূজারি ব্রাহ্মণ দুই থালা ভরিয়া নানাবিধ মিষ্টান্ন আনিয়া দিল। বৈষ্ণবগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কাহার প্রসাদ? পূজারি বলিলেন, কালীর প্রসাদ।

অমনি বৈষ্ণবগণ বলিলেন যে, তাঁহারা বিষ্ণুর প্রসাদ ব্যতিত গ্রহণ করেন না।

এই কথা রাজার কর্ণে গেল। বৈষ্ণবগণের আর রাত্রে আহার হইল না। প্রাতে যখন তাঁহারা চলিতে গেলেন, তখন দ্বারীগণ তাঁহাদিগকে কয়েদ করিল। রাজা আইলেন, "বৈরাগী বেটাদের" ডাকাইলেন, তর্জ্জন গর্জ্জন করিলেন। শেষে কয়েক দিবস বিচার হইল। পরে রাজা বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। সেই অবধি পুঁটীয়ার ঘর পরম বৈষ্ণব হইলেন।

* শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রকাশিত প্রতিলিপি, সাহিত্য-পারিষদ্ পত্রিকা। ফাল্গুন, ১৩০৬।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, বৈষ্ণবগণের অস্ত্র শস্ত্র ভাল ছিল। কাজেই শাক্তগণ যুদ্ধে হারিতে লাগিলেন। বৈষ্ণব ধর্ম্ম স্বাভাবিক ধর্ম্ম। উহা মাধুর্য্যময়। বৈষ্ণবগণের অপূর্ব্ব ভজন পদ্ধতি দেখিয়া লোকে আকৃষ্ট হইলেন। তাঁহারা ব্রজরস আস্বাদ করিয়া মোহিত হইলেন। শাক্তগণের উহা কিছু ছিল না। তাহাদের সাধন ভজন কেবল যাগ, যোগ প্রক্রিয়া লইয়া। তাহাতে প্রেম কি ভক্তি, কি কোন রসের সংশ্রব ছিল না। দশ ঘড়া ঘৃত পোড়াও, কি দশ শত পশুবধ কর, তাহাতে হৃদয় দ্রব কি উন্নত হইবে না। কিন্তু বৈষ্ণবগণ দাস্য হইতে মধুর রসের আশ্রয় লইয়া অনায়াসে রসাস্বাদন করিতে লাগিলেন। শাক্তগণ প্রথমে এই রসাস্বাদন প্রথাকে ঠাট্টা করিতেন। তাঁহারা বৈষ্ণবগণকে "ভাবুক বেটারা" বলিয়া গালি দিতেন। রসকে "ভাবকালি" বলিয়া বিদ্রূপ করিতেন। কিন্তু মুখে ঠাট্টা করিলে কি হয়, প্রেম ও ভক্তি সহজেই মিষ্ট জিনিষ। প্রায় জীব মাত্রেই উহা আস্বাদ করিয়া পুলকিত হয়েন। শাক্তগণ দেখিলেন যে, বৈষ্ণবগণের রসাস্বাদ স্বরূপ এক সুখের প্রস্রবণ আছে, তাহা তাহাদের নাই। আর সেই রসে আকৃষ্ট হইয়া অনেক শাক্ত, বৈষ্ণব হইতে লাগিলেন। তখন তাঁহারাও আপনাদের মধ্যে রসের সৃষ্টি করা প্রয়োজন বোধ করিলেন।

রসের সৃষ্টি করিতে গেলে, নায়ক নায়িকার প্রয়োজন। কাজেই তাঁহাদের নায়ক হইলেন মহাদেব। কিন্তু মহাদেবকে লইয়া মধুর রস ঠাইতে পারিলেন না। যেহেতু মহাদেবের আকার সন্ন্যাসী ও সাধুর মত, নাগরের মত নয়। মধুর রসের নাগর যদি ভস্মাবৃত সন্ন্যাসী হয়েন, তবে রসভঙ্গ হয়। আর পার্ব্বতী সখী নহেন, তিনি জননী। বাবা সন্ন্যাসী ও জননীকে লইয়া মধুর রস হয় না। শাক্তগণ সখ্য রসও সৃষ্টি করিতে পারিলেন না, কারণ মহাদেবের সখা কেহ নাই।

সুতরাং তাঁহাদের দাস্য ও এক প্রকার "কাল্পনিক" বাৎসল্য লইয়া

সন্তুষ্ট হইতে হইল। এইরূপে আগমনী ও বিজয়ার সৃষ্টি হইল। গিরি হইলেন নন্দ, গিরিরাণী যশোদা, উমা হইলেন কৃষ্ণ। উমা শ্বশুর বাড়ী গিয়াছেন। গিরিরাণী কান্দিতে লাগিলেন যেমন যশোদা শ্রীকৃষ্ণের বিরহে কান্দিয়াছিলেন। যশোদা বলেন, নন্দ আমার গোপালকে কোথা পাঠাইয়া দিলে তাহাকে আনিয়া দাও, গিরিরাণী বলিলেন, গিরিরাজ আমার উমাকে আনিয়া দাও।

বৈষ্ণবেরা গান করেন "দেখে এলেম চিকণ কালা" ইত্যাদি ইত্যাদি; শাক্তেরা গায়েন "গিরি যাও আন গিয়া আমার উমারে।" এইরূপে শাক্তগণ তাঁহাদের ধর্ম্মে কিঞ্চিৎ রস প্রবেশ করাইলেন। আমরা, শাক্তগণকে উমার কথা লইয়া রোদন করিতে দেখিয়াছি। কিন্তু বৈষ্ণবগণের যে নন্দ যশোদা লইয়া বাৎসল্য রস, ইহা স্বতন্ত্র জিনিস, এই বাৎসল্য রস, গিরিরাজ ও উমার দ্বারা সৃষ্ট-বাৎসল্য হইতে আকাশ পাতাল পৃথক্।

আবার বৈষ্ণবগণের যুগল মিলন আছে, যাহা জীবের পঞ্চম পুরুষার্থ। শ্রীভগবানের পার্শ্বে শ্রীমতী রাধাকে রাখিয়া তাঁহারা যে ভজনা করেন সে মাধুর্য্য-রস অবর্ণনীয়। কিন্তু শাক্তগণের তাহার কিছু ছিল না। সেইজন্য শাক্তগণের ঐরূপ একটা দৃশ্যের দরকার হইল। কিন্তু হরপার্ব্বতীকে লইয়া যুগল মিলন করিতে পারিলেন না, যেহেতু পার্ব্বতী হইতেছেন মা, আর হর পিতা, আর তাঁহার রূপ নাগরের মত নয়। তখন তাঁহারা বৈষ্ণবের মিলন-গীত স্থানে, আর একরূপ দর্শন সৃষ্ট করিলেন। বৈষ্ণবগণ গায়েন, "কি শোভা শ্যামের বামে" ইত্যাদি, শাক্তগণ তাহার পরিবর্ত্তে গাহিতে লাগিলেন, "কেগো কালাঙ্গি উলাঙ্গি রামা নাচিছে।"

শাক্তগণের এই যে, কালী উলঙ্গ হইয়া মনুষ্য রক্তাবৃত স্থানে নৃত্য করিতেছেন এরূপ চরম দৃশ্য উপযুক্তই হইয়াছিল। কারণ বৈষ্ণবগণ শ্রীভগবানের সৌন্দর্য্য, ও শাক্তগণ শ্রীভগবানের বিভীষিকা পূজা করেন,

তাঁহাদের দর্শনীয় বস্তু, সেই নিমিত্ত কি করিলেন, না "বিকট দশনা, রুধিরে মগনা বামা বিবসনা ইত্যাদি।" আদৌ শাক্তের ভজনে প্রেম ভক্তি ছিল না, থাকিতে পারে না। সে ভজনে ছিল কি না,—সাধনা দ্বারা সিদ্ধি বা শক্তি আহরণ করা। সুতরাং উহার সহিত রসের সংস্রব ছিল না। তান্ত্রিক মত অনুসারে একটী দেববিগ্রহ করিয়া মন্ত্র ও প্রক্রিয়া দ্বারা তাঁহাকে বাধ্য করিয়া সিদ্ধি আহরণ করাই এই শাক্ত ধর্ম্মের উদ্দেশ্য ছিল।

বৈষ্ণবেরা কুঞ্জভঙ্গের সময় গায়েন, "এমনি ভাবে থাকুক মোদের যুগল কিশোর ইত্যাদি।" শাক্তেরা দেখাদেখি নবমী নিশিতে গাইতে লাগিলেন, "নিশি তুমি প্রভাত হইও না, তুমি পোহাইলে উমা না রহিবে ঘরে, ইত্যাদি।"

আগমনী ও বিজয়াতে কিছু রস আছে বলিয়া লোকে মুগ্ধ হইয়া থাকেন। রামপ্রসাদের ভক্তি অঙ্গ গীতগুলিও মধুর, কিন্তু এ সমুদয় বৈষ্ণবগণের সামগ্রী, এই সমুদায় গীতের বীজ বৈষ্ণব ধর্ম্ম হইতে লওয়া। ইহা পূর্ব্বে ছিল না।

শ্রীগৌরাঙ্গ যে ভক্তির তরঙ্গ পৃথিবীতে আনেন, তাহারই ছায়া লইয়া শাক্তগণ নিজ নিজ দেবতাগণের উপাসনায় সন্নিবেশ করেন। রঙ্গ দেখুন, রামপ্রসাদ শক্তিকে বলিতেছেন, "মা তোর মায়া নাই," ইত্যাদি। এখন শ্রীভগবানকে "তুই মুই" করা, কি এরূপ নিজজন ভাবিয়া ভজন করা, শ্রীগৌরাঙ্গই জীব সাধারণকে শিক্ষা দেন। কালী কি দুর্গাকে "তুই মুই" করার নিয়ম পূর্ব্বে ছিল না। কালী কি দুর্গার সহিত এরূপ আত্মীয়তা করিতে যাহাতে তুই মুই করা যাইতে পারে, পূর্ব্বে কাহারও সাহস হইত না, প্রয়োজন হইত না। শাক্তগণ কালী দুর্গাকে মন্ত্র ও প্রক্রিয়া দ্বারা বশীভূত করিয়া আমাকে ইহা দাও, তাহা দাও, বলিতেন। কালী দুর্গার সহিত শাক্তগণের ভালবাসা কি ভক্তির বড় একটা সম্বন্ধ ছিল না।

সেই নিমিত্ত রামপ্রসাদ যখন বৈষ্ণবগণের ভাব লইয়া কালী ঠাকুরাণীকে বলেন, "মা! আমায় কোলে নে," তখন রস ভঙ্গ হয়, ঠিক ভাবব্ধ হয় না।। যে হেতু কালীমায়ের হাতে খাঁড়া, আর গলায় নরমুণ্ড, লোল জিহ্বা দিয়া মনুষ্যের রক্ত পড়িতেছে, এমন জনকে ত্রাহি ত্রাহি বলিয়া ভয় ও পূজা করা যায়। কিন্তু মা বলা যায় না। যেমন সরস্বতীকে গোঁফ দিলে রসভঙ্গ হয়, শিবের স্তন দিলে রসভঙ্গ হয়, সেইরূপ নরমুণ্ড মালিনীকে মা বলিলে রসভঙ্গ হয়। মনে ভাবুন, যে স্ত্রীলোকের এমন বেশ, গলায় মুণ্ডের মালা ঝুলিতেছে, তাহার স্তন্যদুগ্ধ পান কি করা যায়?

তাই রামপ্রসাদ বৈষ্ণবগণের প্রেম-ভক্তির ভাব লইয়া ভয়ঙ্করে যোগ দিতে গিয়াছেন, কাজেই রসভঙ্গ হইয়াছে। "তুই মা কোলে নে," শাক্তগণের ইহা নিজস্ব ভাব হইলে, তাঁহারা মাতার গলায় নরমুণ্ডমালা দিতেন না, তাঁহারা কালীকে "মাতার" আকার দিতেন।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে শাক্তধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, আচার্য্য প্রভু ও ঠাকুর মহাশয়ের সময়ে, সম্পূর্ণ পৃথক্ আকার ধারণ করিল। ঠাকুর মহাশয় বলিয়া গিয়াছেন, "নাহি মানি দেবী দেবা"। ঠাকুর মহাশয়ের সময়ে বৈষ্ণবগণের মধ্যে কোন কোন স্থানে যাগ যজ্ঞ দেবী দেবার পূজা এমন কি জাতি বিচার পর্য্যন্ত উঠিয়া গিয়াছিল।

অল্প বয়সে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হওয়ায় সমাজে অত্যন্ত প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র কবিরাজ, ঘাটে স্নান করিতে গিয়াছেন, শাক্ত পণ্ডিতগণ বলিতেছেন, কবিরাজ! শিবকে পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণকে পূজা করিতে প্রবর্ত্ত হইয়াছ, জাননা কি তোমার কৃষ্ণ শিবকে পূজা করেন? তাহাতে রামচন্দ্র এই দুইটী শ্লোক পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে নীরব করেন ঃ—

শৈবো ভবতু বৈষ্ণবঃ কিমজিনোঽপি শৈব স্বয়ং।
তথা সমতয়াথবা বিধিহরাদিমূর্ত্তি ত্রয়ং॥
বিলোক্য ভব বেধসোঃ কিমপি ভক্ত-বর্গ ক্রমং।
প্রণম্য শিরসাহিতৌ বয়মুপেন্দ্র দাস্যং শ্রিতাঃ॥

এই শ্লোকের অর্থ এই—

শিব বিষ্ণুর উপাসক বিধায় বিষ্ণু জগদুপাস্য হউন, কিম্বা বিষ্ণু শিবের উপাসক বিধায় শিবই জগদুপাস্য হউন, অথবা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব তিনই সমভাবে জগদুপাস্য হউন। আমরা মহাদেব এবং ব্রহ্মার ভক্ত-বৃন্দের পাদে অবলোকন করিয়া, তাঁহাদের উভয়কে মস্তকের দ্বারা প্রণাম করিয়া উপেন্দ্র অর্থাৎ ভগবানের দাসত্ব আশ্রয় করিয়াছি।

প্রহ্লাদ ধ্রুব রাবণানুজ বলি ব্যাসাম্বরি যাদয়োঃ
স্তে বিষ্ণু পরায়ণা বিধিভব শ্রেষ্ঠা জগন্মঙ্গলাঃ
যে হন্তে রাবণ বান পৌণ্ড্রক ক্রোঞ্চ * * অহো
যদ্ভক্তা নচ তৎপ্রিয়াং নচ হরে স্তস্মার্জ্জগদ্বৈরিণঃ।

প্রহ্লাদ, ধ্রুব, বিভীষণ প্রভৃতি বিষ্ণু পরায়ণ, এ কারণ তাঁহারা মহাদেব ও ব্রহ্মার পরম প্রিয় ও জগন্মঙ্গল কারক।

রাবণ, বাণ, পৌণ্ড্র, বৃক প্রভৃতি অসুরগণ ব্রহ্মা এবং মহাদেব ভক্ত হইয়াও তাঁহাদের প্রিয় হয় নাই ও হরির প্রিয় হয় নাই, সুতরাং জগদ্বৈরী হইয়াছিল। ইত্যাদি।

তিনি তোমাকে অবশ্য ভালবাসিবেন। এই কৃষ্ণপ্রেমের নাম মাত্র অন্য ধর্ম্মে শুনা যায়। কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্মে এই প্রেম প্রথমে, মধ্যে ও শেষে।

খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মের ভিত্তি ভূমি য়ীহুদীয় ধর্ম্ম। সে ধর্ম্মের যিনি ঈশ্বর, তিনি তাঁহার দলস্থ জীবের ঘোর পক্ষপাতী, অন্যান্য জীবের ঘোর শত্রু। অথচ তাঁহারা ইহাও বলেন যে, তিনি একা, তিনিই সব মনুষ্য সৃষ্টি করিয়াছেন ও সকলের পিতা। এই য়ীহুদীদিগের ঈশ্বর স্ত্রীপুরুষ বধ করিতে, স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম নষ্ট করিতে অনুমতি দিয়াছেন।

মহাম্মদীয় ধর্ম্মের ভিত্তি ভূমি কি তাহা ঠিক বুঝা যায় না। যাঁহারা মহাম্মদীয়গণের ভয়ে পলায়ন করিয়া ভারতে আশ্রয় লয়েন তাঁহারা সূর্য্য পূজা করিয়া থাকেন। তবে ইহা ঠিক যে, মহম্মদের ঈশ্বর সেই দলস্থ লোকের পক্ষপাতী। তিনি নাকি, যে তাঁহাকে না মানে তাহাকে বধ করিতে বিধি দিয়াছেন। তাই লোকে বলে যে মহাম্মদ বাহুবল দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন।

বৈষ্ণবধর্ম্ম বৈদান্তিক ধর্ম্মের উপর স্থাপিত। যাহা পাঠ করিয়া ইউরোপীয়পণ্ডিতগণ একেবারে বিস্মিত হইয়াছেন।

যীশু দ্বাদশজন মূর্খ শিষ্য রাখিয়া যান। মহাম্মদ অনেক শিষ্য করিয়া যান বটে, কিন্তু তাঁহার প্রচার পদ্ধতি এক নূতন প্রকারের। তিনি মক্কা অধিকার করিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন, যে তাঁহাকে ঈশ্বরের দোস্ত না বলিবে তিনি তাহাকে বধ করিবেন। তাই একদিনে মক্কার অধিবাসীগণ মুসলমান হইলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ কোটী কোটী শিষ্য রাখিয়া যান। তাঁহার প্রচার পদ্ধতি কি তাহা এই পুস্তকে বিবরিত আছে। তিনি জীবকে দর্শনে পর্শনে, দেশকে দেশ পর্শনে উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন।

গৌর লীলায় যে একটি ঘটনা আছে, তাহার ন্যায় ঘটনা জগতে আর কোথাও শুনা যায় না, তাহার মত ঘটনা আর অনুভব করাও যায় না, আর সে ঘটনা যে সত্য তাহার অকাট্য প্রমাণ রহিয়াছে। সেটি এই যে, এই অবতারে শ্রীভগবান জীবের সহিত এক প্রকার প্রত্যক্ষরূপে ইষ্টগোষ্ঠী ও কথাবার্ত্তা কহিয়াছেন। অতএব গৌর-লীলা যিনি না পড়িয়াছেন তিনি হতভাগ্য।

এক্ষণ বৈষ্ণব ধর্ম্মের কয়েকটী সার তত্ত্ব এই স্থানে বলিব।

প্রথম। গীতায় শ্রীভগবান বলেন যে যদা যদাহি ইত্যাদি। অর্থাৎ যেখানে যেখানে অধর্ম্মের প্রবাল্য হয়, সেখানেই ধর্ম্ম স্থাপনের নিমিত্ত অবতার উদয় হয়েন। শ্রীকালাচাঁদ গীতা গ্রন্থে এই তত্ত্বের বিস্তার বিচার আছে।

দ্বিতীয়। শ্রীভগবানের উক্তি যথা—যিনি আমাকে যেরূপ ভজনা করেন, আমি তাহাকে সেইরূপ ভজনা করিয়া থাকি।

তৃতীয়। তিনি বলিয়াছেন যে, যিনি আমাকে স্বার্থের নিমিত্ত ভজনা করেন, তিনি আমাকে ভজনা করেন না, তিনি আপনাকে ভজনা করেন।

চতুর্থ। সাঁধারণ জীবের প্রতি উপদেশ এই যে, ভগবৎ কীর্ত্তনের ন্যায় শ্রীভগবানের চরণ প্রাপ্তির সহজ ও নিশ্চিত উপায় আর নাই।

অবশেষে শ্রীবৈষ্ণবগণ পাপ পুণ্য এক প্রকার মানেন না। তবে কি মনুষ্য বধ করিলে তাহার দণ্ড নাই? আছে। এক্ষণ বৈষ্ণবতত্ত্ব অর্থাৎ মহাপ্রভুর আজ্ঞা বিচার করুন। তাহার এক আজ্ঞা :—

"কি কাজ সন্ন্যাসে মোর প্রেম-প্রয়োজন।"

অর্থাৎ ভগবৎপ্রেম আহরণ করাই জীবের প্রধান কার্য্য। তাহাতে সুসিদ্ধ হইলে আর তাহাকে কিছু করিতে হইবে না, এমন কি এরূপ লোকের পক্ষে সন্ন্যাসও নিষ্প্রয়োজন।

বৈষ্ণব ব্যতীত অপর সকলে বলেন যে, কর্ম্মফল সকলকেই মানিতে হইবে, তাহা হইতে কাহার বাঁচিবার যো নাই। বৈষ্ণব জিজ্ঞাসা করেন, কর্ম্ম ও ভগবান ইহায় মধ্যে বড় কে ? কর্ম্ম না ভগবান ? যদি বল কর্ম্মফল এড়াইবার কাহার যো নাই, তবে ভগবান কেহ নহেন, তিনি আমাদের ভাল মন্দ করিতে পারেন না, কর্ম্মই আমাদের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা। তাহা হইলে নাস্তিকতা আসিল।

বৈষ্ণব বলেন,"ভগবান বড়, কর্ম্ম তিনি ইচ্ছা মাত্র ধ্বংস করিতে পারেন. যেমন জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পাপী জগাই মাধাই বিস্তর স্ত্রীপুরুষ বধ করিয়া প্রভুর ইচ্ছা মাত্র পবিত্রতা লাভ করিয়া মহান্তদলে স্থান পাইলেন।

কথা এই, যাহার প্রেম কি ভক্তি হইয়াছে তাহার পক্ষে জ্ঞানকৃত পাপ এক প্রকার অসম্ভব। মহাপ্রভু তাই বলিয়াছেন, "কি কাজ মোর" ইত্যাদি।

কুব্জা তাঁহাকে তখন নন্দের নন্দন বংশীবদন বলিয়া নিবেদন করিতেছেন. অর্থাৎ কুব্জা সম্মুখের কাণ্ড দেখিয়া একেবারে ব্রজের গোপীভাব পাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ একটু হাসিয়া বলিতেছেন, তুমি বৃন্দাবনে থাকিতে চাও সেখানে ত বসন ভূষণ নাই, তাহারা সকলে অতি দরিদ্র। বিশেষতঃ দেখিলে ত তাহারা পল্লীগ্রামের লোক, তাহাদের জ্ঞানের লেশ মাত্র নাই।

কুব্জা। আমাকে আর বঞ্চনা করিবেন না। আমি বুঝিয়াছি, আমি হতভাগ্য, আর তাঁহারা ভাগ্যবতী। আমি যথেষ্ট ধন পাইয়াছি বটে, কিন্তু তাহারা ধনীকে পাইয়াছে। আমি ধন পাইয়াছি ধনীকে পাই নাই, পাইবার চেষ্টাও করি নাই।

উপরের কাহিনীতে অনেক তত্ত্ব নিহিত আছে। যথা,—প্রথমতঃ তত্ত্ব এই যে, রসাশ্রয়ে কিরূপ শ্রীভগবানকে ভজনা করা যায়। দ্বিতীয়, ভজনা মানে কি। তৃতীয়, মথুরার ও ব্রজের ভজনের বিভিন্নতা কি। ইত্যাদি।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

নদিয়া পথিকের রোদন।

কোথা লুকাইল, মোর গোষ্ঠীগণ।
এ ভুবনেতে কি নাহি একজন?
প্রান্তরে দাঁড়ায়ে, চারিদিকে চাই।
নিজ জন কেহ দেখিতে না পাই॥
পথে কত লোক, করিছে গমন।
গৌরনাম নাহি বলে একজন॥
কেন কেহ নাহি বলে দুটা কথা।
কেহ নাহি বুঝে মোর মনো ব্যাথা॥
আমার গৌরাঙ্গ ভারত ভ্রমিল।
গৌরাঙ্গ গোষ্ঠীতে ভুবন ভরিল॥
দক্ষিণ প্রদেশ আপনি তারিল।
কোন স্থান ভক্ত- দ্বারা উদ্ধারিল॥
রামেশ্বর হতে ভোট দেশ করি।
সুলতান গুজরাট কিবা কাশীপুরি॥
সিন্ধুদেশে ভক্ত যত্নে পাঠাইল।
শ্রীগৌরাঙ্গ নাম তাহা প্রচারিল॥
এত বড় গোষ্ঠী আছিল আমার।
এখন হয়েছে সব ছারখার॥

নদিয়া পথিকের রোদন।

গৌরাঙ্গেরগণ ভারতে কি আছে ?
যদি কেহ থাকে কেবা কারে পুছে ॥
যদি কেহ থাকে চেনা নাহি যায়।
সেই নাহি জানে নিজ পরিচয় ॥
কেহ বা পশ্চিমে কেহ বা দক্ষিণে।
কে তাদের প্রভু কিছু নাহি জানে ॥
পশ্চিমা জানে না গৌড়ীয় কি জানে ?
এই গৌড় মাঝে জানে কয়জনে ?
কেহ গোষ্ঠী থাকো দেহ পরিচয়।
মিলিয়া তা সনে জুড়াই হৃদয় ॥
একা থাকিবারে নারি গৌর হরি।
সঙ্গি মিলাইয়া দেহ কৃপা করি ॥

প্রেমানন্দে যেই নদে ভেসে যায়।
আজ সেই নদে মরুভূমি প্রায় ॥
আমাদের নদে সুখের পাথার।
আজি পুণ্যভূমি হয়েছে আঁধার ॥
নদিয়া আইনু সুখের লাগিয়া।
এবে ফিরি যাই কাঁন্দিয়া কাঁন্দিয়া ॥
কোথায় নদিয়া কোথায় গৌরাঙ্গ।
কোথায় কীর্ত্তন প্রেমের তরঙ্গ ॥
এই কি প্রভুর মনেতে আছিল।
যাইবার কালে সব নিয়া গেল ॥

কি ভাণ্ডারপুরি প্রভু রাখি গেল !
ভাণ্ডারির দোষে জীবে না পাইল ॥
শুন হে ভাণ্ডারি কহি যোড় করে।
প্রভুকে নিকাষ দিতে হবে পরে ॥
প্রভু ধন নষ্ট করে থাক তুমি।
প্রভু বুঝে নিবে বলে খালাস আমি ॥

যাহারা আচার্য্য ধন লোভী হলো।
শ্রীগৌরাঙ্গ আজ্ঞা সব ভুলি গেল ॥
মহা বংশ বলি' করে অভিমান।
কিন্তু ভক্তি বিনা কারু নাহি ত্রাণ ॥
শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মে নাহিক কুলীন।
যেই ভক্তিমান সেইত প্রবীণ ॥
দীক্ষা দান করা হয়েছে ব্যবসা।
জীবে দয়া মিথ্যা শুধু ধন আশা ॥
মহা বংশ যেই তার বড় দায়।
সবা হতে ভালো তার হতে হয় ॥
নিজ কর্ম্ম ভোগ করিতে হইবে।
বংশ দায় দিয়া এড়াতে নারিবে ॥

পরকীয়া রস আস্বাদিবার তরে।
কোন কোন জন পরনারী হরে ॥
কেহ বা গৌরাঙ্গ বিগ্রহ করিয়া।
বাবুগীরি করে তার দায় দিয়া ॥

এরা সব দেয় গৌর পরিচয়।
বলে তারা সব গৌরগোষ্ঠী হয়॥
কুটুম্ব হইয়া মোর স্থানে আসে।
আমি তাদের দেখি পলাই তরাসে।

হাহা শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়া নাথ।
জীব প্রতি কর শুভ দৃষ্টিপাত॥
প্রভু তোমা বিনা সব অন্ধকার।
জীবে ভক্তি দিয়া করহ উদ্ধার॥
কাঁহা গদাধর মুরারী মুকুন্দ।
কাঁহা নরহরি হে জগদানন্দ॥
কোথায় শ্রীবাস কোথা বক্রেশ্বর।
কোথা রামানন্দ কোথা দামোদর॥
এসো ভক্তগণ পুন ধরাধামে।
জীব দুঃখ হর গৌর হরিনামে॥
তোমাদের প্রভু তোমাদের কাজ।
মুইত কীটানু বৈষ্ণব সমাজ॥
তোমাদের নিজ কাজ কর এস।
কেন কান্দি মরে বলরাম দাস?
তোমাদের প্রভু তোমাদের দায়।
কেন বলরাম কান্দিয়া বেড়ায়॥

সমাপ্ত।

আমরা দেখিতেছি যে গীতার যে উক্তি ইহাই ঠিক। কারণ যদি খৃষ্ট অবতার হয়েন, তবে অবশ্য মহাম্মদ অবতার, শ্রীগৌরাঙ্গও অবতার। ইহাতে খৃষ্টিয়ানদিগের মত যে, যীশু কেবল মাত্র অবতার, ইহা থাকে না। মহাম্মদ বলেন যে, তিনিই শেষ অবতার, ইহা মনে ধরে না। কারণ ইহা অস্বাভাবিক, ক্রমোন্নতিই স্বভাবের নিয়ম, অতএব মহাম্মদ যাহা শিক্ষা দিবেন তাহার পরে মনুষ্য আর কিছু শিখিবে না ইহা অস্বাভাবিক।

আমরা বলিলাম যে শেষোক্ত তিনটী অবতার ভগবদ্ভক্তি শিক্ষা দিয়াছেন। তবে খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মে ভক্তির কথা অতি অল্প, নীতির কথাই অধিক। ইহা করিও না দণ্ড পাইবে, ইহা করিও পুরস্কার পাইবে, এই খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মের প্রধান শিক্ষা। মহাম্মদীয় ধর্ম্মে ভক্তির কথা বেশ আছে, কিন্তু মহাম্মদ শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য পূজার বিধি দিয়া গিয়াছেন। শ্রীভগবানের মাধুর্য্য পূজা কেবল বৈষ্ণবধর্ম্মে আছে, আর কোন ধর্ম্মে নাই।

কথা এই, আমরা শুনিয়া থাকি যে, শ্রীভগবানকে জ্ঞানে পাওয়া যায়, আবার ইহাও শুনি যে, তিনি জ্ঞানাতীত ও মায়াতীত। তাহা যদি হইল তবে শ্রীভগবানকে আর পাওয়া গেল না। প্রকৃতই তিনি এত বড় যে জ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে পরিমাণ করা যায় না, তবে মনুষ্যের উপায় কি? তাঁহাকে কিরূপে পাইবে? তাই বৈষ্ণবগণ বলেন যে, যদিও তিনি জ্ঞানময়, তবু তিনি প্রেমময়ও বটেন। প্রেমময় কেন?

আমরা দেখি তাঁহার সৃষ্ট যে মনুষ্য তাহাতে প্রেম আছে। যাহা হার সৃষ্ট বস্তুতে আছে তাহা তাঁহাতে নাই ইহা হইতে পারে না। অতএব তাঁহার যদি প্রেম না থাকিবে তবে তিনি মনুষ্যকে প্রেম কিরূপে দলেন?

অতএব তাঁহার প্রেম আছে। কতখানি? অবশ্য অপরিমেয়, অর্থাৎ তিনি প্রেমময়। তাহা যদি হইল তবে তুমি যদি তাঁহাকে ভালবাস তবে

সূচীপত্র।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ষোড়শ অধ্যায়।

সপ্তদশ অধ্যায়।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

আমাদের নিবেদন।

শ্রীঅমিয়-নিমাই চরিতের ষষ্ঠ খণ্ড প্রকাশিত হইল। শৈশবাবধি যাঁহাকে হৃদয়ের দেবতা বলিয়া জানিয়াছি, যাঁহার সামান্য সেবা করিতে পারিয়া কৃতার্থ হইয়াছি, আজ যদি সেই পরমারাধ্য শ্রীল শিশির বাবু এই মরজগতে থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহার শ্রীকরে, তাঁহার এই শেষ গ্রন্থখানি দিয়া, তাঁহার আনন্দে আনন্দ উপভোগ করিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা হইল না, বিগত ২৩শে পৌষ মঙ্গলবার অপরাহ্ন ১টা ৩৫ মিনিটের সময় তিনি তাঁহার কার্য্য শেষ করিয়া, নিত্যধামে চলিয়া গিয়াছেন। এই ক্ষোভ চিরদিনই আমাদের মনে থাকিবে।

যে দিন তিনি আমাদিগকে ছাড়িয়া গোলকে গমন করেন, সেই দিন যথাসময়ে স্নানাহার করিয়া, এই গ্রন্থের শেষ ফর্ম্মার প্রুফটি লইয়া ভ্রম সংশোধন করিতে বসিলেন। প্রুফ দেখা শেষ হইলে, উহা আমাদের হস্তে দিয়া বলিলেন, "আজ আমার কার্য্য শেষ হইল।" ইহার দুই ঘণ্টা পরে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে, পরিবারস্থ সকলের আহারাদি হইয়াছে কি না? যখন শুনিলেন সকলেরই আহারাদি হইয়াছে, তখন তাঁহার বদন প্রফুল্ল হইল। ইহার কিয়ৎক্ষণ পরে, উপবেশন অবস্থাতেই, একবার "নিতাই গৌর" বলিয়া তর্জ্জনী অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ কন্যা নিকটে ছিলেন, তিনি পিতার ঐরূপ ভাব দেখিয়া কিছু ভীত হইয়া সকলকে ডাকিলেন। আমরা যাইয়া দেখিলাম তিনি নয়ন মুদিত করিয়া বালিশ ঠেস দিয়া

যেন ঘুমাইতেছেন। এইরূপ ভাবে বসিয়া অনেক সময় তিনি ঘুমাইতেন। তখনও আমরা বুঝিতে পারি নাই যে, তিনি তখনই আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতেছেন। ইহার কয়েক মিনিট পরেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল।

সে সময় তাঁহার বদনের অপরূপ ভাব দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। ইহার কয়েক ঘণ্টা পরে, সেই উপবেশন অবস্থাতেই, তাঁহার একখানি ফটোগ্রাফ লওয়া হইয়াছিল। তখনও কে বলিবে যে এ দেহে প্রাণ নাই, বোধ হইতেছিল যেন তিনি অতি আরামে ঘুমাইতেছেন। যিনি ফটো লইয়াছিলেন, তিনি বলিলেন "মৃত দেহের অনেক ফটো আমি তুলিয়াছি, কিন্তু প্রাণত্যাগের পর মুখের এরূপ সুন্দর ভাব আমি কখনও দেখি নাই।" প্রকৃতই তিনি যেন "নিতাই গৌর" বলিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। এরূপ মৃত্যু মুনি ঋষিরাও বাঞ্ছা করেন।

এই খণ্ডের উপক্রমণিকায় তিনি লিখিয়াছেন যে, "পাঁচ খণ্ড শ্রীঅমিয় নিমাই-চরিত বাহির হইবার পর ৬ষ্ঠ খণ্ড লিখিবার জন্য অনেকে আমাকে অনুরোধ করেন। কিন্তু শ্রীঅমিয়-নিমাই চরিত লিখিবার পূর্ব্বে কেহ যেন প্রভুর লীলা আমার দ্বারা লিখাইবার নিমিত্ত আমার পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিতে লাগিলেন। কাজেই আমার লিখিতে হইয়াছিল, আর এক নিশ্বাসে প্রথম হইতে পঞ্চম খণ্ড পর্য্যন্ত লিখিয়া শেষ করিয়াছি। আমার আর লিখিবার শক্তি নাই, আর লিখিবার নিমিত্ত মহাপ্রভুর অনুজ্ঞাও অনুভব করিতেছি না।"

এই যে "এক নিশ্বাসে" লিখিবার কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা অত্যুক্তি নহে। যাঁহারা তাঁহার নিজজন, যাঁহারা সর্ব্বদা তাঁহার নিকট থাকিতেন, তাঁহারা জানেন তিনি কিরূপে,—কেবল শ্রীঅমিয়-নিমাই চরিতের

পাঁচ খণ্ড নহে, তাঁহার ধর্ম্মগ্রন্থ গুলি সমস্তই,—"এক নিশ্বাসে" লিখিয়াছেন। তিনি অতি প্রত্যূষে ভজনে বসিতেন। ভজন শেষ করিয়া সেই আবেশ অবস্থায় তিনি অনর্গল বলিয়া যাইতেন, আর তাঁহার নিজজন কেহ, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া লইতেন।

তিনি লিখিয়াছেন যে, পঞ্চম খণ্ড পর্য্যন্ত লেখা শেষ হইবার পর, ষষ্ঠ খণ্ড লিখিবার জন্য মহাপ্রভুর কোন অনুজ্ঞা অনুভব করেন নাই বলিয়া, তিনি ঐ খণ্ড লেখেন নাই। কিন্তু শেষে বোধহয় এই অনুজ্ঞা তিনি অনুভব করিয়াছিলেন, কারণ গত বৎসর একদিন তিনি আমাদিগকে বলিলেন, "ষষ্ঠ খণ্ড লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি।"

তখন তাঁহার দেহের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল। তাঁহার প্রধান ক্লেশ অনিদ্রা, তাহাতে জীর্ণশক্তি ক্রমে কমিয়া আসিয়াছিল, কাজেই তাঁহার দেহ কঙ্কালসার হইয়া পড়িয়াছিল। এই কৃশ দেহে ও ব্যাধির তাড়নার মধ্যে, এক পদ ইহ জগতে এবং অপর পদ অন্য জগতে রাখিয়া, তিনি ষষ্ঠ খণ্ড লিখিতে আরম্ভ করেন। এই অবস্থায় গ্রন্থের কতকাংশ লেখা হইলে, তাঁহার দেহের অবস্থা আরও খারাপ হইয়া পড়িল। তখন প্রতিদিন রাত্রিতে, শয়ন করিবার সময়, ষষ্ঠ খণ্ডের পাণ্ডুলিপি গুলি আমাদিগের হস্তে দিয়া বলিতেন, "এগুলি সাবধানে রাখিও। যদি অদ্যকার রাত্রি কাটাইয়া উঠিতে পারি তবে অবশিষ্ট অংশ লিখিব।" রাত্রিতে নিদ্রা নাই, ক্লেশে রাত্রি কাটিয়াছে, কিন্তু শেষ রাত্রিতে উঠিয়া গ্রন্থ লিখিতেছেন। এইরূপ প্রায় প্রত্যহই করিয়াছেন।

নানা কারণে গ্রন্থখানির ছাপা দেরী হইতেছিল। ইহাতে তিনি বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়েন, এবং প্রায় আমাদিগকে বলিতেন "গ্রন্থখানি ছাপিতে বড়ই দেরী হইতেছে, একটু চেষ্টা করিয়া, আমি জীবিত থাকিতে থাকিতে, যাহাতে ইহার ছাপা শেষ হয় তাহা করিবে।" কিন্তু

গ্রন্থখানি লইয়া তিনি যেরূপ ব্যস্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাকে লইয়াও আমরা সেইরূপ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়া ছিলাম। কাজেই গ্রন্থ ছাপা সম্বন্ধে আমাদের কিছু শিথিলতা হইয়াছিল, আর সেই কারণেই ইহাতে ভুল ভ্রান্তি থাকিবার সম্ভাবনা, তজ্জন্য সহৃদয় পাঠকগণ কৃপা করিয়া আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন।

এখন গ্রন্থখানি সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। এ পর্য্যন্ত প্রভুর লীলাগ্রন্থ যাঁহারা লিখিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই তাঁহার গম্ভীরা লীলা বিষদরূপে বর্ণন করেন নাই। প্রভু শেষ দ্বাদশ বৎসর যে লীলা করেন, ইহা এত নিগূঢ় যে, মাত্র কয়েক জন "মহাপাত্র" এই লীলারস তাঁহার সহিত আস্বাদন করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন। এই গম্ভীরা লীলা বর্ণন ও প্রভুর লীলা-রহস্যের বিচার শিশির বাবু এই খণ্ডে করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে। শিশির বাবু ভূমিকায় লিখিয়াছেন "জগতের যে দুইটি সর্ব্বপ্রধান সমস্যা, অদ্যাপি তাহার মীমাংসা হয় নাই। সে দুইটী এই—(১) শ্রীভগবান্ যে আছেন তাহার প্রমাণ কি? এবং (২) যদি তিনি থাকেন তবে তিনি কিরূপ বস্তু? এই দুইটী সমস্যার মীমাংসা করিবার যে বিষম ভার তাহা আমি হস্তে লইলাম।"

এখন পাঠক একটু চিন্তা করুন ও কথাটা তলাইয়া বুঝিয়া দেখুন। এই যে এত বড় একটা কথা তিনি বলিলেন, ইহা কি দম্ভ করিয়া, না নিজের মর্য্যাদা বাড়াইবার জন্য? কি[illegible] যিনি শ্রীভগবৎ প্রেমে তন্ময় হইয়া জীবের মঙ্গল সাধনার্থ চিরজীবন [illegible]ইয়াছেন, যিনি শ্রীঅমিয়-নিমাই চরিত ও শ্রীকালাচাঁদ গীতা প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া শ্রীভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ যে কতদূর মধুর তাহা প্রকাশ করিয়াছেন, পরকাল সম্বন্ধে যাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস, তিনি ৭০ বৎসর

বয়সে, জরাজীর্ণ দেহ লইয়া, মহাপ্রস্থানের পথে দাঁড়াইয়া, দম্ভ করিয়া যে কিছু বলিবেন ইহা হইতেই পারে না।

তিনি যে দুইটী বিষম সমস্যার অবতারণা করিয়াছেন তাহার ঠিক মীমাংসা হইয়াছে কি না, পাঠক তাহা বিচার করিয়া দেখিবেন। তবে শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই এক বাক্যে বলিতেছেন যে, সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা তাঁহার স্থান অনেক উচ্চে। আর তিনি একজন বিশেষ শক্তিশালী মহাপুরুষ ছিলেন। এ কথাও অনেকে বলিতেছেন, শ্রীভগবান তাঁহার নিজ কার্য্য সাধনের জন্য শিশির বাবুকে এই মরজগতে পাঠাইয়া ছিলেন, সেই কার্য্য সমাধা হইবা মাত্র আবার তাঁহাকে নিজের নিকট লইয়া গিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস শ্রীল শিশির বাবুর এই ষষ্ঠ বা শেষ খণ্ড জগতের এক অমূল্য গ্রন্থ।

উৎসর্গ পত্র।

শ্রীমান্ পয়স্কান্তি!

এই গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ড আমি তোমার হস্তে দিলাম। আমার বয়ঃক্রম সত্তর, তোমার পঁচিশ, এইরূপ সময়ে তুমি আমাকে হঠাৎ একদিনের পীড়ায় ছাড়িয়া গেলে। আমি তোমার বিরহ সহ্য করিতে পারিব ইহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই, কিন্তু তবু সহ্য করিতেছি। ইহা কিরূপে করিলাম?

তুমি আমার নিত্য সঙ্গী ছিলে। অতি বৃদ্ধ জীর্ণ রুগ্ন, আমার দ্বারা ভজন সাধন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু তুমি আমার সে অভাব পূরণ করিতে, তুমি বিখ্যাত সঙ্গীতাচার্য্য ছিলে, তোমার কণ্ঠে মধু বর্ষণ হইত। তুমি আমাদের কীর্ত্তন, কি শ্রীতানসেনের ভজন, যখন গাহিতে, তখন পশু পক্ষী পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইত। তুমি আমার সঙ্গে থাকিয়া আমাকে অনুক্ষণ ভগবৎ গুণসুধা পিয়াইতে। সুতরাং তুমি যখন আমাকে ছাড়িয়া গেলে তখন বিরহের সঙ্গে সঙ্গে আর এক বিপদ্ উপস্থিত হইল। আমার ভজন এক প্রকার বন্ধ হইয়া গেল। তবু, তুমি যখন আমায় ত্যাগ করিয়া গেলে, তখন আমি শ্রীভগবানকে মনের সহিত ধন্যবাদ দিয়াছি। ইহা যদিও শুনিলে বিশ্বাস হয় না, কিন্তু তিনি (শ্রীভগবান) জানেন ইহা সত্য কিনা। তানসেনের ন্যায় সঙ্গীতজ্ঞ জগতে কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি যে পদ প্রস্তুত করেন তাহা ভাবে ও তাল লয়ে অদ্বিতীয়। তাহা লোপ হইয়া যাইতেছিল। যাহা কিছু এখন আছে তাহা রঙ্গপুরের শ্রীমান্ রামলাল মৈত্রের কণ্ঠে ছিল, তুমি তাহার নিকট এই তানসেনের পদগুলি অভ্যাস করিয়াছিলে। তুমি সর্ব্বদা বলিতে কবে আমি তানসেনের নিকট যাইব, যাইয়া তাঁহার সমুদায় পদ শিখিব। এখন তোমার সেই সুযোগ হইয়াছে।

তুমি প্রভুর কৃপায় ভক্তি ধন পাইয়াছিলে, এখন মনানন্দে শ্রীভগবানের ভজন করিতেছ, সুতরাং তোমার এ ভাবের নিমিত্ত আমি স্বার্থপর হইয়া কেন দুঃখ করিব। বিশেষতঃ সংসারে তোমার কোন বন্ধন ছিল না, তুমি চিরদিন মুক্ত ছিলে।

তুমি আমাকে ছাড়িয়া গেলে, আমার, তোমার একখানি ছবি আনিবার ইচ্ছা ছিল। মার্কিন দেশের এক বিখ্যাত মিডিয়ম, আমার সে মনস্কাম পূর্ণ করিয়াছেন। চিত্রখানি ২০ মিনিটে দিবাভাগে লোকের সাক্ষাতে অদৃশ্য হস্তে চিত্রিত হয়। সে এত চমৎকার যে এ জড়জগতে বোধ হয় এরূপ সূক্ষ্ম কারিকরী হইতে পারে না, অন্ততঃ কোন কারিকর এক মাসের কমে ওরূপ সম্পূর্ণ ছবি আঁকিতে পারেন না। সেই ছবিখানি সর্ব্বদা আমার সম্মুখে থাকে।

আমি সেই ছবি দেখি, আর আমার মনে উদয় হয় যে, আমাদের জীবনদাতা আমাদিগকে জীবন দিয়া একেবারে ভুলিয়া যান নাই, আমাদের কথা তাঁহার মনে থাকে। কারণ তিনি ভালবাসার আকর, তিনি জীবন দিয়া এজগতে কিছুকাল রাখিয়া, পরে মৃত্যু অন্তে আমাদিগকে আর এক জগতে লইয়া যান।

সেখানে শোক তাপ মৃত্যু রোগ কি অন্ধকার নাই, সেখানে আমরা আমাদের প্রীতির বস্তু লইয়া চিরদিন বাস করিব। যখন ইহা মনে উদয় হয়, তখন সেই যে ভগবান আমাদের জীবনের জীবন, তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভজনা করিতে পারি না, ইহাতে মাথা কুটিয়া মরিতে ইচ্ছা হয়। তুমি সুস্বরে গীত গাইয়া তাঁহাকে অর্চ্চনা কর, আর আমি যাহাতে শীঘ্র মোচন হই, সে নিমিত্ত তাঁহার শ্রীচরণে নিবেদন করিও।

বাগবাজার
৪২৫।২৬ পৌষ।

শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ।

ভূমিকা।

পাঠকগণ দেখিবেন যে এই খণ্ডে অনেক লীলা কথা লেখা আছে যাহা পূর্ব্বে একবার বলা হইয়াছে। ইহাতে তাঁহারা কৃপা করিয়া আমার উপর বিরক্ত হইবেন না। প্রভুর নিষ্ফল লীলা একটীও নাই, সকল লীলারই মহৎ তাৎপর্য্য আছে! তাহা বুঝিতে অনেক পরিশ্রম, সাধন, জ্ঞান ও গুরু-উপদেশের প্রয়োজন। কেবল পড়িয়া গেলে সকল লীলার উদ্দেশ্য বুঝা না গেলেও পারে। পূর্ব্বে আমি প্রভুর লীলা বর্ণনা করিয়াছি, এখন তাহার মধ্যে কয়েকটী প্রধান লীলার তাৎপর্য্য বিচার করিব ইচ্ছা করিতেছি। সুতরাং পূর্ব্বে যে উদ্দেশ্যে লীলা লেখা হইয়াছে, এবার অন্য উদ্দেশ্যে লিখিতেছি। কোন একটী লীলার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিতে হইলে, বলিতে হয় অমুক খণ্ডে যে লীলার কথা লেখা হইয়াছে, পাঠক, আমি এখন তাহার তাৎপর্য্য বিচার করিতেছি। ইহাতে পাঠকের কথায় কথায় সেই সমুদায় লীলা তল্লাস করিতে অন্যান্য খণ্ড খুলিতে হইবে। আমি তাহা না করিয়া, পাঠকের সুবিধার নিমিত্ত ইহাই করিয়াছি যে, যে লীলাটীর তাৎপর্য্য বিচার করিতে আরম্ভ করিয়াছি, তাহা সংক্ষেপে মাত্র বর্ণনা করিয়া, পরে তাহার যে উদ্দেশ্য তাহাই বলিয়াছি। কোন কোন লীলা দুইবার বর্ণনা করিবার কারণ উপরে বলিলাম।

অপর, আমি যে বৃহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি ইহা মনে করিলে ভয়ে হতজ্ঞান হইতে হয়। এই পৃথিবী বহু সহস্র কি লক্ষ বৎসর সৃষ্টি হইয়াছে, কত জাতি হইয়াছে ও নষ্ট হইয়াছে, কত বড় বড় সাধু সৃষ্টি হইয়াছেন ও তাঁহারা অন্তর্ধান করিয়াছেন। কিন্তু দু'একটি তত্ত্বের বিষয় এপর্য্যন্ত

প্রয়োজনীয়। ইহার একটী তত্ত্ব এই যে, শ্রীভগবান আছেন অনেকে বিশ্বাস করেন, কিন্তু তাহার কি কোন প্রমাণ আছে ?

ইহার উত্তর এই যে, ইহার কিছু মাত্র প্রমাণ নাই। অনেকে বিশ্বাস করেন যে তিনি আছেন এইমাত্র ; কিন্তু কেন বিশ্বাস করেন, তাহার কোন প্রমাণ আছে কিনা তাহা কেহ বলিতে পারিবেন না। কেহ কেহ নাকি শ্রীভগবানের দর্শন পাইয়াছেন, কিন্তু তাহাকে প্রমাণ বলে না। যিনি দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার নিকট এ প্রমাণ বলবৎ হইতে পারে, কিন্তু অন্যের নিকট নহে। অতএব ইহা নিশ্চিত, শ্রীভগবান যে আছেন তাহার প্রমাণ যাহাকে প্রমাণ বলে, তাহা নাই।

দ্বিতীয় বিচারের তত্ত্ব এই যে, যদি শ্রীভগবান থাকেন তবে তিনি কিরূপ বস্তু ? যেখানে শ্রীভগবান আছেন তাহার কোন প্রমাণ নাই সেখানে এ দ্বিতীয় তত্ত্বটী জানিবার কোন সুযোগ নাই।

অতএব জগতের যে দুইটী সর্ব্বপ্রধান সমস্যা, অদ্যাপি তাহার মীমাংসা হয় নাই। সে দুটী এই যে—

(১) শ্রীভগবান যে আছেন তাহার প্রমাণ কি ?

(২) যদি তিনি থাকেন তবে তিনি কিরূপ ?

আমি এই দুইটী সমস্যার মীমাংসা করিবার যে বিষম ভার, তাহা হস্তে লইলাম। পাঠকগণ আমাকে দাম্ভিক ভাবিবেন না। পড়িলে দেখিবেন যে আমার দম্ভ করিবার কিছু নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর কৃপার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আমি লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যদি কিছুমাত্র কৃতকার্য্য হইতে পারি তবে জগতের মঙ্গল হইবে। না পারি আমার লজ্জার কি ক্ষোভের বিষয় কিছু থাকিবে না। যাহা কেহ পারেন নাই, আমি তাহাই পারিলাম না।

উপক্রমণিকা।

যখন এই গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ড শেষ হইল তখন ভাবিলাম যে আর লিখিব না, কি লিখিতে পারিব না। আপনার অবস্থা ভাবিয়া এই পদটি প্রস্তুত করিয়াছিলাম। যথা—

গোরা জানা নাহি ছিল, তখন আছিনু ভাল,
কাল কাটাইতাম আমি সুখে।
গৌরনাম কাণে গেল, কেবা সেই মন্ত্র দিল,
হুতাসে পিয়াসে মরি দুঃখে॥
যারা গুণের সঙ্গী ছিল, তারা ফেলে পলাইল,
কাহাকে কহিব মনের ব্যথা।
কেবা দুঃখ ভাগ নিবে, সঙ্গে সঙ্গে কে কান্দিবে,
কে শুনাবে মনোমত কথা॥
হৃদয়ে গৌরাঙ্গ ছিল, এবে কোথা পলাইল,
আগে মোর চিত্ত করি চুরি।
আপনি মোরে ডাকিল, মন আমার ভুলি গেল,
এবে করে মো সনে চাতুরী॥

এই লীলার সহায়তা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ (১) স্বরূপ, (২) রাম-রায়, (৩) শিখি মাহিতী, (অর্দ্ধজন) মাধবী দাসী। মাধবী দাসী শিখি মাহিতীর ভগিনী। ইঁহারা সাড়ে তিন জন মহাপাত্র বলিয়া বিখ্যাত। সাড়ে তিনজন কেন না, মাধবী দাসী স্ত্রীলোক বলিয়া অর্দ্ধজন।

অধিকার সকলের সমান হয় না। কারণ সকল হৃদয় একরূপ প্রশস্ত নহে। যেমন জলপাত্রের মধ্যে ছোট বড় আছে, কোন পাত্রে অধিক, এবং কোন পাত্রে অল্প জল ধরিতে পারে, সেইরূপ সেই গোলকের সুধা কাহারও হৃদয়ে অল্প, আবার কাহারও হৃদয়ে অধিক পরিমাণে ধরিতে পারে।

গম্ভীরা লীলা দ্বারা প্রভু যে নিগূঢ় রস জীবের আয়ত্বাধীন করিয়াছিলেন, তাহা এই সব পাত্র লইয়া প্রভু নিভৃতে আস্বাদন করেন। এই নিগূঢ় রস বিস্তার করিতে প্রভুর দ্বাদশ বৎসর লাগে। এই যে মহাধিকারী কয়জন পাত্র, ইহাদিগকে এই রস বুঝাইবার নিমিত্ত প্রভুকে অনেক কষ্ট করিতে হইয়াছিল। প্রভু এই দ্বাদশ বর্ষ আবিষ্ট অর্থাৎ অচেতন অবস্থায় ছিলেন। এই অবস্থায় তিনি অহোরাত্র রোদন করিয়া, ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাইয়া, ধুলায় গড়াগড়ি দিয়া, তবে এই নিগূঢ় রস বুঝাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন। শুধু উপদেশ দিয়া সম্যক্‌রূপে উহা বুঝাইতে পারিতেন না কেন পারিতেন না বলিতেছি। মনে ভাবুন দুইজন ভক্ত শ্রীভগবানের রূপ আস্বাদন করিতেছেন। একজন ইহা বর্ণনা করিতে কাব্যের সহায়তা লইয়া, বাছিয়া বাছিয়া শব্দ ও উপমা প্রয়োগ করিয়া, অসীম ক্ষমতা দেখাইলেন। আর একজন সামান্য কথায় বর্ণনা করিলেন, কি করিতে গেলেন কিন্তু পারিলেন না, কথা জড়াইয়া আসিল,·· তাই পারিলেন

না, কি "কথা কইতে কইতে মুরছিল," তাই পারিলেন না। ইহার মধ্যে কাহার বর্ণনা অধিক হৃদয়গ্রাহি হইবে? অবশ্য শেষোক্ত জনের।

এই গম্ভীরা লীলা শ্রীরাধাকৃষ্ণের সহিত যে সম্বন্ধ তাহা লইয়া। এই লীলাদ্বারা প্রভু সেই সম্বন্ধ পরিস্ফুটিত করেন। শ্রীমতী রাধা কে? না যিনি ঐশ্বর্য্যবিবর্জ্জিত মাধুর্য্যময় ভগবান্ যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার প্রধান প্রেয়সী। ইহার অর্থ এই যে, শ্রীমতী রাধার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের অনুগত আর কেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই রাধার কি ভাব, প্রভু গম্ভীরা লীলায় তাহাই বর্ণনা করিয়াছিলেন। শ্রীভগবানের মনের ভাব কি তাহা জীবে অতি অল্প মাত্র জানিতে পারে। কিন্তু শ্রীভগবানের যিনি প্রেয়সী, কি শ্রীভগবান যাহার প্রাণ, তাহার মনের ভাব, জীব সাধন করিলে, অনেকটা কি প্রায় সবই জানিতে পারে। এই গম্ভীরা লীলায় শ্রীপ্রভু, সেই রাধার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কিরূপ ভাব, তাহাই বর্ণনা করিয়াছিলেন। কেন না, জীবকে শিখাইবার নিমিত্ত। জীব উহা হৃদয়স্থ করিয়া শ্রীভগবানের সর্ব্বোচ্চ ভজন শিখিবে। যেহেতু রাধার ভজন সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। যাহার উচ্চাধিকারী হইবার বাসনা থাকে, তাহার গোপীর অনুগত কি গোপীর প্রধানা যে রাধা, তাহার অনুগত হইয়া, কি অনুকরণ করিয়া, ভজন করিতে হয়।

এই রাধার ভাব জানে কে? বুঝে কে? জানিলেও কাহার সাধ্য উহা প্রকাশ বা আস্বাদন করে? তাহাই প্রভু বাছিয়া এইরূপ কয়েক জন পাত্র লইলেন, যাঁহারা ইহা বুঝিতে বা ধারণা করিতে পারিবেন। ইহাদের বুঝাইলেন কিরূপে? প্রভু কি প্রস্তাব লিখিয়া পরে উহা পাঠ করিয়া, কি বক্তৃতা করিয়া, কি কবিতা লিখিয়া ইহা শিখাইলেন? ইহার কিছুই নয়। কিরূপে এই সমুদায় অতি নিগূঢ়, অতি গুহ্য

অতি পবিত্র, অতি দুর্ব্বোধ্য (অনর্পিত) ভজন প্রকাশ করিলেন, তাহা এখন সংক্ষেপে বলিতেছি।

প্রথমে প্রভু শ্রীরাধা হইলেন। সে কিরূপে তাহা পরে বিবরিয়া বলিব। তখন সে দেহে প্রকাশ্যে আর শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীপ্রভু থাকিলেন না, কি অতি গুপ্তভাবে অভ্যন্তরে রহিলেন। তখন সেই দেহ সম্পূর্ণরূপে শ্রীমতী রাধার হইল। * অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতী রাধার কিরূপ ভাব, উহা উপযুক্ত অধিকারী দ্বারা জগতকে বুঝাইবার নিমিত্ত, স্বয়ং শ্রীমতী আইলেন, আসিয়া বুঝাইতে লাগিলেন।

প্রভু এই রাধাভাবে এক একটি মনের কথা বলেন, আর বিচলিত হয়েন। যথা শ্রীমতী রাধা বলিতেছেন, "আমার যে প্রাণের প্রাণ কৃষ্ণ" ইহাই বলিতে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নাম করিতেই তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকাবৃত হইল। তুমি আমি হইলে, সুধু কথাদ্বারা কৃষ্ণ কত প্রিয় তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিতাম। কিন্তু প্রভু রাধা হইয়া কথা দ্বারা বেশী বুঝাইলেন না, তিনি প্রায় ভাবের দ্বারায় বুঝাইলেন। যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার কিরূপ ভাব তাহা "আমি তাহাকে বড় ভালবাসি" ইহা বলিয়া না বুঝাইয়া, শ্রীমতী দেখাইলেন যে সেই শ্রীকৃষ্ণের নাম করিবামাত্র তিনি পুলকাবৃত হয়েন। শ্রীমতী কৃষ্ণকথা বলিতে যেরূপ বিভাবিত হইতেন, রাধা স্বয়ং আসিয়া এই গম্ভীরা লীলায় দর্শককে তাহা দেখাইতেছেন। কাজেই যাঁহারা দর্শক কি শ্রোতা, তাঁহাদের হৃদয়ে সে ভাবটী একবারে বিধিয়া যাইতেছে। কথায় বলিলে এইরূপ হইত না।

কথা বলিতেছেন "সখী অদ্য শ্রীকৃষ্ণ আসিবেন।" বলিতে বলিতে আর বলিতে পারিলেন না, আবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন, কি আনন্দে গলিয়া পড়িতে লাগিলেন। যখন এইরূপে কোন সুখের কথা বলিতেছেন

* এই আবেশ তত্ত্ব পরে বিবরিয়া লিখিত হইয়াছে, পাঠক দেখিবেন।

তখন নানা প্রকারে তাঁহার আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। আবার যখন কৃষ্ণবিরহ প্রভৃতি দুঃখের কথা বলিতেছেন, তখন সেইরূপে নানা প্রকারে দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন, অর্থাৎ ক্রন্দন করিতেছেন, ধুলায় গড়াগড়ি দিতেছেন, হৃদয়ে করাঘাত করিতেছেন, কি ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাইতেছেন। কেহ শ্রীমতী রাধা সাজিয়া অভিনয় করিতে পারেন, কিন্তু স্বয়ং শ্রীমতী রাধা আসিয়া দেখাইলে, যেরূপ পরিশুদ্ধ হয়, অভিনয় দ্বারা তাহা হয় না।

ইহাকেই গম্ভীরা লীলা বলে। এই গম্ভীরা লীলা যাহা বুঝাইতে প্রভুর দ্বাদশ বৎসর লাগিয়াছিল, শত শত কলসী নয়নের জল ফেলিতে হইয়াছিল, ধুলায় গড়াগড়ি দিতে, কি মুহুর্মুহু মূর্চ্ছা যাইতে হইয়াছিল, যাহা জীবকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত উপযুক্ত পাত্র, তাহার লক্ষ লক্ষ ভক্তের মধ্যে, মোটে সাড়ে তিনজন পাইয়াছিলেন, এরূপ যে নিগূঢ় লীলা তাহা আমার ন্যায় কোন ক্ষুদ্র জীবে কি শুধু বাক্যের দ্বারা বর্ণনা করিতে পারে? যদি কেহ পারেন তবে তিনিই শ্রীমতী রাধা। অতএব এ লীলা প্রকাশ করা আমার সাধ্যাতীত।

সেই লীলা আমি এখন লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম! কেন হইলাম তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। তবে আশা করি প্রভু কৃপা করিয়া আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন। যদি তিনি শক্তি দেন পারিব, নতুবা নয়।

গম্ভীরা লীলা লিখিতে হইবে মনে করিয়া যেরূপ ভয় হইত, আবার অন্যান্য কয়েকটী বিষয় লিখিবার নিমিত্ত আমার ইচ্ছা সেইরূপ বলবতী হইত। এই সকল বিষয় আমি পূর্ব্বে লিখিতে পারি নাই। পূর্ব্বে কেবল লীলা লিখিয়াছি মাত্র, কিন্তু কোন লীলার কি উদ্দেশ্য তাহা পরিস্কার করিয়া লিখিবার অবসর পাই নাই। এই শ্রীগৌরাঙ্গের লীলায়, অর্থাৎ তাঁহার কার্য্যে ও বাক্যে, এত নিগূঢ় ও গুরুতর তত্ত্ব সকল নিহিত আছে, যাহা পূর্ব্বে জগতে কেহ জানিতে পারেন নাই; আর উহা জানিলে

জীবের মহৎ উপকারের সম্ভাবনা। শুধু লীলা পড়িয়া গেলে অনেকের মনে নিগূঢ় তত্ত্ব উদয় হয় না। লীলা মনোযোগের সহিত চিন্তা করিতে হয়, করিতে করিতে মনের মধ্যে সমস্যার মীমাংসা আইসে।

বিবেচনা করুন প্রভুর সচরাচর দুই ভাব ছিল। এক সহজ ভাব, আর এক আবেশিত ভাব। সহজ ভাবে তিনি যেরূপ থাকিতেন, আবেশিত ভাবে অন্য প্রকার হইতেন। অনেক সময় এমনও দেখা যাইত যে, সহজ সময়ের ভাব আবেশিত সময়ের ভাবের ঠিক বিপরীত। বৃন্দাবন দাস এক স্থানে বলিতেছেন যে, প্রভু এই একজনের নিকট দীন হইতে দীন হইয়া ভক্তি প্রার্থনা করিতেছেন, আবার একটু পরেই তাহার মস্তকে শ্রীপাদ দিতেছেন। ইহার মানে কি? প্রভু কৃষ্ণপ্রেমে জর্জ্জরীভূত, মুহুর্মুহু প্রলাপ কহিতেছেন। তিনি কি বিচার করিয়া সমুদয় কার্য্য করিতেন, না বিকল অবস্থায় লোকে যেরূপ করে, অর্থাৎ যাহা মনে উদয় হইল, তাহাই করিতেন?

একদিন প্রভু শ্রীবাসকে বলিতেছেন যে, "আমি কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখাইব? ইহা কি মনুষ্যে পারে?" শ্রীবাস বলিলেন, "প্রভু ওকথা আমরা শুনিব না। আপনি শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর নিকট স্বীকার করেন তাঁহাকে শ্যামসুন্দর রূপ দেখাইবেন, এখন এ প্রকার কথা বলিতেছেন কেন?" প্রভু উত্তরে বলিলেন "আমি কি বলিয়াছিলাম যে শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখাইব? যদি বলিয়া থাকি সে উন্মাদ অবস্থায়। পণ্ডিত, তুমিত জান অনেক সময় আমাতে আমি থাকি না। ইহাও আমি শুনিয়াছি যে সে অবস্থায় আমি নানাবিধ প্রলাপ করিয়া থাকি, এমন কি অনেক অসম্ভব কথাও বলি। কিন্তু আপনারা আমার বন্ধু, আপনাদের কি উচিত যে, উন্মাদ অবস্থায় আমি কি বলিয়াছিলাম তাহার নিমিত্ত সহজ অবস্থায় আমাকে পেষণ করা?"

শ্রীবাস বলিলেন "প্রভু, তুমি যাহাকে উন্মাদ অবস্থা বলিতেছ, সেই অবস্থায় তুমি যাহা বল, সেই তোমার মনোগত কথা, আর তুমি যাহা সহজ অবস্থায় বল সে সমুদায় তোমার বাহ্য।" অতএব প্রভুর এই দুইটী অবস্থা, আবেশিত ও সহজ, সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাহা যদি হইল, তবে এই আবেশিত অবস্থাই বা কি, আর সহজ অবস্থাই বা কি? আবার, ইহার কোন অবস্থার কথা কি কার্য্য আমাদের কতদূর মান্য করিতে হইবে? আমরা প্রভুর লীলায় দেখিতেছি যে অনেক স্থানে এরূপ লেখা আছে, যথা—"প্রভুর তখন আবেশিত চিত্ত"; কি প্রভু "ক্ষণে বাহ্য পাইয়া"; কি প্রভু বলিতেছেন "বন্ধুগণ, এইমাত্র কি প্রলাপ করিলাম"। আবার প্রভুর কাণ্ড দেখুন! প্রভু করিতেছেন কি, না আপনার শ্রীপদ ভক্তিপূর্ব্বক দর্শন করিতেছেন ও উহাতে ঘন ঘন চুম্বন দিতেছেন, আবার করিতেছেন কি, না আপনার কেশ দ্বারা আপনার শ্রীপদ বন্ধন করিতেছেন। প্রভু কিছুকাল এত বিহ্বল অবস্থায় ছিলেন যে তাঁহাকে পাগল ভাবিয়া তাঁহার নিজজন বন্ধন করিতে গিয়াছিলেন। ইহা প্রভুর কিরূপ লীলা? "প্রভুর রাধাভাবে গড়া তনু" এই যে ভক্তগণ গাহিয়া থাকেন, ইহার অর্থ কি?

প্রভুর "প্রকাশ," প্রভুর "মহাপ্রকাশ", ইহার রহস্য কি? প্রভুর সেই সময় বালকের ন্যায় ব্যবহার করার মানে কি?

আবার দেখিতেছি প্রভুর দেহে নানা লক্ষণ দেখা যাইত। কখন তিনি তাঁহার দেহ দ্বারা চক্র হইয়া আঙ্গিনায় ঘুরিতেন, কখন আর্দ্র দেহ কখন শুস্ক দেহ হইত ইত্যাদি। এ সকল বিষয়ের তাৎপর্য্য কি? প্রভু কৃষ্ণের নিকটে অতি কাতরে পাপ মার্জ্জনার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছেন ভাল, এ বেশ কথা, ভক্তেরা ইহা করিয়া থাকেন, ও প্রভু অনেক সময় ভক্ত ভাবে থাকিতেন। কিন্তু প্রভু আবার একটু পরে বলিতেছেন

যে তিনিই কৃষ্ণ, ইহাই বলিয়া অন্যের পাপ মার্জ্জনা করিতেছেন। অতএব তিনি ভক্ত না কৃষ্ণ? প্রভু রাধাভাবে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া রোদন করিতেছেন। বলিতেছেন, "আমার কৃষ্ণকে কুমতি কুবজা ভুলাইয়া রাখিয়াছে", কি "তিনি কত কাল হইল মথুরায় গিয়াছেন আর তো আইলেন না।" তখন সকলে বুঝিলেন ইনি রাধা। আবার একটু পরে তিনি রাধা রাধা বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "কোথা আমার প্রাণ-প্রণয়ী রাধা, তোমার বিরহে আমার মথুরার রাজ্য ভাল লাগিতেছে না।" তখন বোধ হইল তিনি কৃষ্ণ। অতএব তিনি ভক্ত, না রাধা, না কৃষ্ণ? প্রভুর কাণ্ড দেখিয়া ভক্তগণ প্রথমে বড় ধান্দায় পড়েন। প্রভু এরূপ করেন কেন? পরিশেষে স্বরূপ গোসাই ইহার একটী সিদ্ধান্ত করেন, তাহা এই দুই শ্লোকে ব্যক্ত, যথা—শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর কড়চায়াম্—

রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকট মধুনা তাদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতি সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥ ৫ ॥
শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈ বা—
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥ ৬ ॥

প্রথম শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, রাধাকৃষ্ণ পূর্ব্বে পৃথক ভাবে বিরাজ করিতেন, এখন তাঁহারা এক দেহ লইয়াছেন। অর্থাৎ গৌরাঙ্গ বস্তুত রাধা ও কৃষ্ণ মিলিত, তাই কখনও রাধা প্রকাশ হইয়া কৃষ্ণের নিমিত্ত রোদন, আবার কখনও কৃষ্ণ প্রকাশ হইয়া রাধার নিমিত্ত রোদন করেন। এই মীমাংসায় একটী অভাব রহিল। যদি গৌরাঙ্গ রাধা

কৃষ্ণ হইলেন, তবে ভক্ত-গৌরাঙ্গ, যিনি পাপ মার্জ্জনার নিমিত্ত প্রার্থনা করেন, তিনি কি ?

দ্বিতীয় শ্লোকের অর্থ বুঝিতে একটু কষ্ট। শ্রীকৃষ্ণ অনুভব করিলেন যে, তিনি রাধাপ্রেম আস্বাদ করিয়া যত আনন্দ লাভ করেন, শ্রীমতী রাধা তাঁহার কৃষ্ণপ্রেমাস্বাদন করিয়া তাহা অপেক্ষা অধিক আনন্দ অনুভব করেন। ইহাতে রাধার যে আনন্দ তাহা কিরূপ ইহা শ্রীকৃষ্ণের আস্বাদ করিতে ইচ্ছা হইল, সেই জন্য দুইজনে মিলিলেন। ইহাতে রাধার যে আনন্দ শ্রীকৃষ্ণ তাহার অংশী হইলেন।

মনে ভাবুন, এরূপ মীমাংসা ভক্তগণের নিকট বড় মধুর। কিন্তু ভক্ত ব্যতীত আর এক জাতীয় মনুষ্য আছেন, যাহারা আদৌ ভক্ত নহেন, একবারে নাস্তিক। প্রধানতঃ শেষোক্ত ব্যক্তিগণের জন্যই এই গ্রন্থ লিখিত হইতেছে, ভক্তগণের নিমিত্ত নয়। আমি এই তত্ত্ব লইয়া বিচার করিব ও ইহার সর্ব্ববাদীসম্মত কোন মীমাংসা আছে কিনা দেখিব।

এইরূপে প্রভুর লীলার মধ্যে নানাবিধ সমস্যা আছে, ইহা লইয়া বিচার করা আবশ্যক, আর আমি তাহাই করিব এই নিমিত্ত শেষ খণ্ড লিখিতে পারিলাম না বলিয়া আপনাকে হতভাগ্য ও অপরাধী ভাবিতাম।

যেমন গম্ভীরা লিখিতে ভয় হইত, তেমনি লীলার রহস্য বিচার করিতে বড় ইচ্ছা হইত। কিন্তু এ লীলা বিচার অপেক্ষা আর একটী বলবৎ কার্য্য হস্তে লইতে আমার বরাবর অতি গাঢ় ইচ্ছা ছিল, এই সুযোগে তাহাই করিব। বিশ্বাস ও জ্ঞান দুটী পৃথক বস্তু। শ্রীভগবান বলিয়া যে এক বস্তু আছেন, তিনি বিশ্বাসের বস্তু, জ্ঞানের বস্তু নহেন। অর্থাৎ ভগবান যে আছেন এ পর্য্যন্ত ইহা কেহ প্রমাণ করিতে পারেন নাই, কেবল অনেকে ইহা মনে মনে বিশ্বাস করেন। সুতরাং তিনি কিরূপ বস্তু, ভাল কি মন্দ, তাহার প্রকৃত মীমাংসা এ পর্য্যন্ত হয়

নাই। আমাদের হৃদয় বলে যে তিনি ভাল এই মাত্র। কিন্তু একজন নাস্তিক যদি বলে যে, তিনি যে ভাল তাহার প্রমাণ কি? তখন ইহার অকাট্য প্রমাণ দিতে পারিব না। শুনিতে পাই ভগবদ্দর্শন কোন কোন সাধুর ভাগ্যে ঘটিয়াছে, কিন্তু সে কোন প্রমাণ নয়। যেমন শাস্ত্রে দেখি যে শ্রীল নারদ শ্রীকৃষ্ণের সহিত কথা কহিতেন। কিন্তু যে অবিশ্বাসী সে তাহা মানিবে কেন? নারদ বলিয়া যে কোন মুনি ছিলেন তাহা সে স্বীকার করিবে না। শ্রীভগবান আছেন ইহা যদি প্রত্যক্ষরূপে প্রমাণিত হয়, আর ইহাও যদি প্রমাণিত হয় যে তিনি মনুষ্যকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করেন, এবং তিনি মরণের পরে মনুষ্যকে চিরজীবন দিয়া থাকেন, তবে আমাদের আনন্দের আর সীমা থাকিবে না। এ জগতে জীবের যে দুঃখ তাহার প্রধান কারণ তাহাদের মধুময় ভগবানে ও পরকালে বিশ্বাস নাই। যদি প্রমাণ হয় শ্রীভগবান আছেন, তিনি অনন্ত গুণময় বস্তু, মনুষ্যকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করেন, আর মৃত্যুর পরে তাহাদিগকে অনন্ত জগতে লইয়া পরম সুখে রাখেন, তবে সমস্ত পৃথিবী আনন্দে নৃত্য করিতে থাকিবে। শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণ দিবানিশি নৃত্য করিতেন, নৃত্যই তাহাদের প্রধান ভজন হইয়াছিল। কারণ প্রভুর সহবাসে তাহারা জানিয়াছিলেন যে, অতি স্নেহশীল ভগবান আছেন, ও পরকাল আছে। তাই তাহারা নৃত্য করিতেন।*

---

* অনন্ত জীবন কাহাকে বলি? কেহ বলেন মনুষ্য মরিয়া আবার এই জগতে আর একজন হইয়া আসিবে। ইহাকে অনন্ত জীবন বলিতে পারি না, কারণ যে মরিল, সেত আর জন্মিল না, জন্মিল আর একজন। "লয় কি নির্ব্বাণ" ইহাও অনন্ত জীবন নয়। অনন্ত জীবন কাহাকে বলে তাহা বেদে বর্ণিত আছে। আমাদের দেশে পুনর্জন্মের তত্ত্ব

যদি আমরা ঐ কয়টি বিষয়ে জীবের জ্ঞান জন্মাইয়া দিতে পারি, অর্থাৎ আমরা যদি প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করিতে পারি যে প্রেমময় ভগবান আছেন ও মনুষ্যের অনন্ত জীবন আছে, তবে জগতের দুঃখ প্রায় থাকিবে না। ইহাই আমরা প্রমাণ করিতে চেষ্টিত হইলাম। ইহা যে আমরা প্রভুর লীলা দ্বারা প্রমাণ করিতে পারিব তাহা আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস।

এই এক কারণ ছিল যাহার নিমিত্ত ষষ্ঠ খণ্ড লিখিতে পারিলাম না বলিয়া ব্যাকুল হইতাম। ভগবান যে আছেন, তাহা কেহ এ পর্য্যন্ত প্রমাণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু আমার বিশ্বাস এই প্রমাণ শ্রীগৌরাঙ্গের লীলায় পাওয়া যায়। ভগবান যে আছেন শুধু তাহা নয়, তিনি মনুষ্যের সহিত কথা বলিয়াছেন। শুধু কথা বলিয়াছেন, তাহাও নহে, তিনি মনুষ্যের সহিত ইষ্টগোষ্ঠি করিয়াছেন, এক দিনের জন্যে নহে, বহু বৎসর ধরিয়া।

প্রবেশ করিয়াছে, ইহা যে কোথা হইতে আইল তাহা নির্দ্দেশ করা দুর্ঘট। বোধহয় বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে আসিয়াছে। কারণ পুনর্জ্জন্ম তাহাদের ধর্ম্মের জীবন। যাহারা হিন্দু তাহারা পুনর্জন্ম মানিতে পারেন না। কারণ শাস্ত্রে আছে যে শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণে মত ভেদ হইলে বেদই প্রমাণ। তাহা যদি হইল, তবে বেদের পরকাল তত্ব কি তাহা শ্রবণ করুন। বেদের মতে মনুষ্য মরিলে যেমন তেমনি থাকে, থাকিয়া তাহাদের মৃত আত্মীয়গণের সহিত মিলিত হয়, হইয়া প্রিয় জন লইয়া চিরজীবন যাপন করে। আমাদের গৌরবের বিষয় এই যে, বেদের এইরূপ সুন্দর পরকালতত্ত্ব আর কোন দেশে কোন ধর্ম্মে নাই। ইউরোপের অনেক মহাপণ্ডিত বেদের এই পরকালতত্ব দেখিয়া পুলোকিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন।

প্রভুর লীলার যতদূর প্রয়োজন, অর্থাৎ যথেষ্ট প্রমাণ আছে যে শ্রীভগবান চব্বিশ বৎসর ধরিয়া জীবের সহিত ইষ্টগোষ্ঠি করিয়াছেন, একজনের সঙ্গে নয়, সহস্র সহস্র লোকের সঙ্গে। মূর্খ ও নির্ব্বোধ লোকের সঙ্গে নয়, সমাজের দেশের শীর্ষস্থানীয় লোকের সহিত।

সুতরাং তিনি কিরূপ বস্তু তাহা আর এখন তর্কের বিষয় নয়, তিনি স্বয়ং তাহা বিবরিয়া বলিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ গৌরাঙ্গ-লীলার আর এক মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে, এই উপলক্ষে কৃপাময় শ্রীভগবান আপনার পরিচয় তাঁহার সন্তানগণকে দিয়া গিয়াছেন। অবশ্য কোন কোন পাঠক ভাবিতে পারেন যে, আমার এ সমুদায় কথা অতিরঞ্জিত। তাঁহাদের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আমি এই সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ দিব, তাহা যেন তাঁহারা করুণ চক্ষে না দেখেন। তাঁহারা আমার এই প্রমাণ সমুদায় অতি নির্দ্দয়তার সহিত পেষণ করুন, তাহাতে আমি বাধিত ভিন্ন বিরক্ত হইব না। কারণ মিথ্যা কথা পেষণে নষ্ট হয়, সত্য কথা পেষণে বর্দ্ধিত হয়। তবে আমার এই নিবেদন, যেন তাঁহারা আমার এই অকাট্য প্রমাণ গুলিকে অন্যায় করিয়া ছেদন করিতে চেষ্টা না করেন। আর যে প্রমাণ গুলি দুর্ব্বল তাহাও একবারে উঠাইয়া না দেন। কারণ দুর্ব্বল প্রমাণ গুলি ক্রমে একত্রিত করিলে তাহাও অকাট্য কি অচ্ছেদ্য হয়। যখন আমার মনে এরূপ বিশ্বাস রহিয়াছে, তখন বুঝিতে পারেন যে এই লীলা লিখিবার নিমিত্ত আমার প্রাণ কতদূর ব্যাকুল হইয়াছিল। এই সমস্ত কথা আমি পূর্ব্বে লিখিবার অবকাশ পাই নাই, যেহেতু তখন লীলা বর্ণনা করিতে বিব্রত ছিলাম। তাহার পরে ক্রমে রুগ্ন ও বৃদ্ধ হইতে লাগিলাম, পুস্তকের শেষ করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ গম্ভীরা লীলা লিখিতে হইবে মনে করিলে হৃদয় কম্পিত হইত।

পাঠকগণ এখন বিবেচনা করুন যে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা জীবের বহু মূল্যের ধন কি না। এ ধনের সহিত অন্য কোন ধনের তুলনা হয় না। কারণ এই ধর্ম্মের যেরূপ দৃঢ় ভিত্তিভূমি আছে, এরূপ আর কোন ধর্ম্মের নাই।

শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত

অর্থাৎ

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর লীলা বর্ণনা।

শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ দাস কর্ত্তৃক

প্রণীত।

(ষষ্ঠ খণ্ড)।

কলিকাতা।

বাগবাজার, ১৯।২ নং আনন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গলি

পত্রিকা-প্রেসে,

শ্রীতড়িৎকান্তি বিশ্বাস দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

গৌরাব্দ ৪২৫। সন ১৩১৭।